প্রেতচক্র

অনীশ দাস অপু



সূচিপত্র

অতৃপ্ত প্রেতাত্মা

আমি ডুবে যাচ্ছি! আমি ডুবে যাচ্ছি!

পানিতে ছিটকে পড়ার সাথে সাথে আতঙ্কিত হয়ে উঠল চেলসি এমারসন। মনে মনে আকুতি করে উঠল, আমি মরতে চাই না।

কিছুক্ষণ আগে, ন বছরের মেয়েটি তার বাবা-মার চল্লিশ ফুট লম্বা সেইল বোট সী ইয়ার ডেকে শুয়ে সূর্যস্নান করছিল। বোট নোঙর করা ছিল ওয়াকার্স বে তে, এটা বাহামার ছোট একটা দ্বীপ থেকে সিকি মাইল দূরে। চেলসি সাঁতার প্রায় জানেই না, ওর লাইফ জ্যাকেট পরে থাকার কথা ছিল। কিন্তু ডেকে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল চেলসি। ঘুম ঘুম চোখে জেগে ওঠে ও, ভেস্ট গায়ে চাপানোর বদলে হাতে ধরে রেখেছিল।

ইয়টের পেছনে, ডেকের ওপর হাঁটতে হাঁটতে কতগুলো পেলিক্যান পাখির উড়ে যাওয়া দেখছিল চেলসি। লক্ষ্য করেনি কোনদিকে যাচ্ছে। ডেকে গুটিয়ে রাখা রশিতে পা বেঁধে হোঁচট খায় ও, মাথাটা দারুণভাবে ঠুকে যায় ডেক ঘিরে রাখা রেইলিং-এ, প্রায় জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা হয় চেলসির। হাত থেকে খসে পড়ে লাইফ জ্যাকেট, টলতে

টলতে কয়েক পা এগিয়েছিল চেলসি, তারপর রেইলিং থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যায় ক্যারিবিয়ানের নীল-সবুজ পানিতে।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গিয়েছিল চেলসি। বুঝতেই পারেনি কী ঘটছে। নাকে পানি ঢুকতে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল ও, বাঁচার তাগিদে পানিতে দ্রুত হাত চালাতে লাগল ওপরে ভেসে ওঠার জন্যে। পানির ওপরে ওঠো, নিজেকে নির্দেশ দিল চেলসি। বাতাস দরকার তোমায়। না হলে মরে যাবে। পা চালাও চেলসি, পানিতে লাথি মারো! ভুস করে ভেসে উঠল ও, মুখ হাঁ করে বাতাস টানতে লাগল হাঁপাতে হাঁপাতে। কিন্তু সাহায্যের জন্যে চিৎকার করার আগে আবার পানির নিচে ডুবে গেল চেলসি।

ভেসে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করল মেয়েটা, আতঙ্কে তালগোল পাকিয়ে গেল মাথা। পানিতে পড়লে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে সে কথা একদম ভুলে গেল। শান্ত থাকতে পারছে না ও... চিৎ হয়ে শ্বাস বন্ধ করে থাকলে আপনা আপনি ভেসে উঠবে সারফেসে, এ কথা মনেই নেই। চেলসি শুধু বুঝতে পারছে ও পানির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে এবং মৃত্যু অবধারিত।

হঠাৎ করেই কোত্থেকে যেন শরীরে শক্তি ফিরে পেল চেলসি। জানে হাতে সময় কম। সাগরের সাথে যুদ্ধে হেরে যাবার আশংকাই বেশি। শেষ চেষ্টা করল ও। ওপরে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিল বাঁচাও! বাঁচাও! বলে। কিন্তু সে চিৎকারে জোর নেই। ইয়টে ঘুমিয়ে থাকা চেলসির বাবা-মার কানে পৌঁছুল না মেয়ের মরণ আর্তনাদ।

কেউ সাহায্য না করলে বাঁচতে পারবে না এতক্ষণে বুঝে গেছে চেলসি। আবার পানির নিচে তলিয়ে গেল ও, দম বন্ধ করে রইল। কিন্তু কতক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে থাকা যায়? ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেল। আর পারব না আমি। সব শেষ। এবার সত্যি মারা যাচ্ছি আমি। লড়াই করে টিকে থাকার চেষ্টা বাদ দিল হতাশ চেলসি।

হঠাৎ, ভোজবাজির মতো কে যেন চেলসির টি-শার্ট ধরে টানতে লাগল, ওকে উপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পানিতে ভেসে ওঠার পরে বেদম কাশতে লাগল চেলসি। মুখ হাঁ করে বাতাস টানছে। ফুসফুসের আগুন নিভে গেল নিশ্বাস নিতে পেরে। ওহ্, থ্যাঙ্ক গুডনেস, কেউ আমাকে বাঁচিয়েছে। বিদ্বস্ত এবং প্রচণ্ড রকম দুর্বল চেলসি শুধু কোনোমতে বলতে পারল আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না, তারপর ঘুরল ও। দেখবে কে তার রক্ষাকর্তা। যাকে দেখল তাকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না চেলসির।

কোনো মানুষ নয়- ওটা একটা তামাটে রঙের জার্মান শেফার্ড কুকুর। টি শার্ট কামড়ে ধরেছিল কুকুরটা। ছেড়ে দিল। চেলসি পাগলের মতো ওটার পেছনের একটা পা চেপে ধরল। জোরে জোরে পা দিয়ে স্ট্রোক মেরে মেরে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটতে শুরু করল কুকুর, চেলসিকে নিয়ে এগোল তীরের দিকে।

অগভীর পানিতে পৌঁছে কুকুরটাকে ছেড়ে দিল চেলসি, হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল তীরে, একটা পাথরের স্তূপের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জ্ঞান হারিয়েছে। জ্ঞান ফিরল জার্মান শেফার্ডের জিভের স্পর্শে। ওর মুখ জিভ দিয়ে চাটছে কুকুরটা।

চেলসি জড়িয়ে ধরল কুকুরটার গলা। বারবার বলতে লাগল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। প্রত্যুত্তরে লেজ নেড়ে সরে গেল কুকুর। তাকাল সী ইয়ার দিকে। উঁচু গলায় ডাকতে লাগল। চেলসি এখনো হাঁপাচ্ছে। বালুতে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকল ও। কুকুরটার ঘেউ ঘেউ থামার পরে উঠে বসল। দেখল চলে গেছে শেফার্ড। চারদিকে চোখ বুলাল ও। কোথাও চিহ্ন নেই ওর রক্ষাকর্তা কুকুরের।

এদিকে, সেইলবোটে, চেলসির বাবা-মা কেন এবং অ্যালেন ঘুম ভেঙে দেখলেন তাদের কন্যা লাপাত্তা। ডেকের ওপরে, নিচে মেয়েকে কোথাও না পেয়ে– তারা উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন, চেলসি! চেলসি! কোথায় তুমি?

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন কেন। স্টার্নে চেলসির জ্যাকেট আছে শুধু। ও নেই।

মেয়ে আমার পানিতে পড়ে যায়নি তো! আঁতকে উঠলেন এলেন। তাঁরা এবার উন্মাদের মতো ডাকাডাকি শুরু করলেন মেয়ের নাম ধরে।

সাগর তীর বসে চেলসি শুনতে পেল ওদের ডাক। হাত উঁচু করে সে চেষ্টাতে শুরু করল, এই যে আমি এখানে!

ওই তো চেলসি! আনন্দে অ্যালেনের কেঁদে ফেলার জোগাড়। সাগর তীরে। ও গড। ও বেঁচে আছে!

লাফ মেরে নিজেদের ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে বসলেন কেন ও অ্যালেন, দ্রুত বৈঠা মেরে এগোলেন তীরের দিকে। ভীত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা, তীরে পৌঁছেই।

চেলসি, কী হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন বাবা। তুমি ঠিক আছ তো?

কেঁদে ফেলল চেলসি। আমি ইয়ট থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাই ... ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে চলল ও।...ডুবে যাচ্ছিলাম... মনে হচ্ছিল মরে যাব... এমন সময় বিশালদেহী একটা কুকুর এসে আমাকে উদ্ধার করে। বলে হুহু করে কাঁদতে লাগল ও। অনেকক্ষণ কান্নার পরে বুকটা হালকা হলো চেলসির, কিভাবে রক্ষা পেয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

ঘটনাটা অদ্ভুত, সোনা, বললেন অ্যালেন। চেলসি লক্ষ্য করল বাবা-মা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন। বোঝাই যায় চেলসির গল্প বিশ্বাস করেন নি তারা।

আমার কথা বিশ্বাস হয়নি তোমাদের, না? জিজ্ঞেস করল চেলসি।

তুমি সুস্থ আছ সেটাই যথেষ্ট, বললেন কেন।

কুকুরটাকে দেখেছ তোমরা? জানতে চাইল ছোট্ট মেয়েটি। ওর ডাক শুনেছ?

না সোনা, শুনিনি, জবাব দিলেন অ্যালেন।

ওটা বড় একটা জার্মান শেফার্ড, বলল চেলসি। কালো, গায়ে গাঢ় বাদামী দাগ। কই যে গেল কুকুরটা!

বোটে চলল, বললেন মা।

সেদিন দুপুরে চেলসি নিচের ডেকে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, শুনল বাবা-মা ওর সাগরে পড়ে যাবার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছেন।

আসলে কী ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়, কেন?

কোনো কুকুর যে ওকে উদ্ধার করেনি তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, বললেন কেন। এদিকের উপকূলে অন্য কোনো বোট চোখে পড়েনি আমার। সাগর তীর খা খা করছে। যদিও দ্বীপের ওদিকটাতে একটা গ্রাম আছে। কিন্তু বালুতে আমি কোনো কুকুরের পায়ের ছাপ দেখতে পাইনি।

ঢেউয়ের কারণে পায়ের ছাপ মুছে যেতে পারে।

যদি সত্যি কুকুরটা পানির ধারে গিয়ে থাকে, তাহলে। সাগর সৈকত খুবই দীর্ঘ এবং খালি। কুকুরটাকে আমাদের চোখে পড়া উচিত ছিল-যদি না ওটা পানিতে সাঁতরে যায়। আর কোনো কুকুরই অমন কাজ করবে না।

কুকুরই যদি না ছিল তাহলে চেলসিকে রক্ষা করল কে?

আমার ধারণা চেলসি আতঙ্কিত হয়ে কুকুরের কথা ভেবেছে। ভেবেছে একটা কুকুর তাকে উদ্ধার করেছে। আসলে সে নিজের চেষ্টায় তীরে এসে পৌঁছেছে।

আর সহ্য হলো না চেলসির। সে দৌড়ে উঠে এল ওপরের ডেকে। গলা ফাটিয়ে বলল, তোমরা কে কী ভাবছ তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি জানি আসলে কী ঘটেছে। একটা জার্মান শেফার্ড রক্ষা করেছে আমার জীবন!

.

প্রায় আধা মাইল দূরে, ওয়াকার্স বের অপর প্রান্তে, ১২ বছরের র‍্যাচেল কাজ সাঁতার কাটার জন্যে বেরিয়ে পড়ল ওদের ভাড়া করা বীচ হাউজ থেকে। ওর পায়ে ফ্লিপার মাস্ক আর স্নরকেল। ছুটি শেষ হবার আর মাত্র একদিন বাকি। তারপর ওরা ফিরে যাবে নিজেদের বাড়িতে। র‍্যাচেল ছুটির শেষ সময়টুকু যতটা সম্ভব সাগরে সাঁতার কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নাস্তা খেতে ব্যস্ত, র‍্যাচেল নেমে পড়ল সাগরে। ও খুব ভালো সাঁতার জানে। তীর থেকে পঁচাত্তর গজের মতো দূরে, একটা কোরাল রীফের দিকে এগিয়ে চলল ও। উপুড় হয়ে সাঁতার কাটছে র‍্যাচেল। চোখে পড়ল একটা ষ্টার ফিশ। ছয় ইঞ্চি লম্বা বাহু দিয়ে একটা চিংড়ি মাছ ধরে আছে ওটা। ষ্টার ফিশটাকে ভালো করে দেখার জন্যে গভীর দম নিয়ে পানির নিচে ডুব দিল র‍্যাচেল। ষ্টার ফিশের কাছে এসেছে, একটা ছায়া দেখতে পেল ও সাগর তলে। আতঁকে উঠল র‍্যাচেল। মাই গড! ওটা নির্ঘাৎ হাঙর। কিন্তু পরক্ষণে ভুল ভেঙে গেল ওর। ভালো করে তাকাতে দেখল হাঙর নয়, ওটা একটা কুকুর।

পানির ওপরে উঠে এল র‍্যাচেল, খুলে ফেলল মাস্ক। দেখল ওর কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরে তামাটে রঙের, গায়ে গাঢ় বাদামী ফুটকিঅলা একটা জার্মান শেফার্ড দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটছে।

কুকুরটার পিছু পিছু সাঁতরাতে শুরু করল র‍্যাচেল। মনে পড়ে গেল বাবা-মাকে কথা দিয়েছে রীফ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না ও। তাই পানিতে মাথা তুলে থাকা একখণ্ড পাথরের ওপরে উঠে বসল র‍্যাচেল।

কুকুরটা যাচ্ছে কোথায়? অবাক হয়ে ভাবল ও। উজ্জ্বল সূর্যালোকে চোখ ঝলসে যায়। র‍্যাচেল কপালের ওপর হাত রেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল দিগন্তরেখার দিকে। আর কোনো ডাইভার বা সাঁতারু চোখে পড়ল না। আধখানা চাঁদের মতো বে-র ওধারে একটা ইয়ট ছাড়া অন্যকিছু দেখতে পাচ্ছে না র‍্যাচেল। লক্ষ্য করল একজন নারী আর একজন পুরুষ ইয়ট থেকে লাফিয়ে নামল একটা ডিঙিতে, তীরের দিকে এগোতে লাগল। ওখানে ছোট একটা মেয়ে ওদের দিকে হাত তুলে নাড়ছে। র‍্যাচেল অনুমান করল কুকুর এবং ওই মানুষগুলোর মধ্যে সম্ভবত কোনো সম্পর্ক নেই।

শিস দিল র‍্যাচেল। অ্যাই, কুকুর, এদিকে এসো। আবার শিস দিল ও, কিন্তু গতিপথ বদলাল না জার্মান শেফার্ড। একমনে সাঁতার কেটেই চলেছে।

হঠাৎ কুকুরটা ডেকে উঠল। পরপর তিনবার। খুশি খুশি গলা। যেন প্রভুকে বাড়ি ফিরে আসতে দেখেছে তার পোষা জানোয়ার। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে।

কুকুরটা কই গেল? ওর কিছু হয়নি তো? কুকুরটার আবার দেখা মিলবে সে আশায় রইল র‍্যাচেল। কিন্তু এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট গেল, তবু দেখা নেই ওটার।

ওহ্, মাই গড! চিৎকার করে উঠল র‍্যাচেল। কুকুরটা নির্ঘাৎ ডুবে মরেছে!

পাথরখণ্ড থেকে লাফিয়ে পানিতে নেমে পড়ল ও, ফিরে এল তীরে। তারপর এক ছুটে বাড়িতে। মা! বাবা! আমি বিরাট একটা কুকুর দেখেছি-জার্মান শেফার্ড-সাগরে সাঁতার কাটছিল। তারপর হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ওটাকে আর ভেসে উঠতে দেখলাম না। কুকুরটা ডুবেই গেল কি না! খোঁজ নিয়ে দেখব একবার?

দেখো। বললেন ওর বাবা। তবে জেট স্কি ব্যবহার কোরো।

কিছুক্ষণ পরে র‍্যাচেলের সঙ্গে বাবাও বেরিয়ে পড়লাম। যেখানে কুকুরটাকে শেষ মুহূর্তে দেখা গেছে, সে জায়গায় খোঁজাখুঁজি চালালেন। কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই জার্মান শেফার্ডের। তীরে ফিরে এলেন ওরা। র‍্যাচেল অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কুকুর সাগরে সাঁতার কাটতে যাবে কেন?

.

সেদিন সন্ধ্যায় দ্বীপের ওধারের শহুরেবাসীরা তাদের গ্রামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি বীচ পার্টির আয়োজন করল। খোলা আকাশের নিচে তৈরি করা হলো উনুন, আগুনে ঝলসাতে লাগল শামুক আর মাছের কাবাব। একটি ব্যাণ্ড দল বাজাচ্ছে রেগে সঙ্গীত, আর সব বয়সের মানুষ বাজনার তালে তালে নাচছে।

ওই পার্টিতে চেলসির সাথে পরিচয় হলো র‍্যাচেলের। এক বাহামিয়ান মহিলা র‍্যাচেলের কালো চুলে চমৎকার বিনুনি করে দিয়েছিল। ওটা দেখে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল চেলসি।

তোমার চুলের বিনুনি খুব সুন্দর হয়েছে, চেলসি বলল র‍্যাচেলকে। বিশেষ করে রঙিন পুঁতির কারণে আরো বেশি ভালো লাগছে।

ধন্যবাদ, বলল র‍্যাচেল। বাহামায় আজকেই আমার শেষ রাত। তাই অন্যরকম একটু সাজলাম আর কি। এরপর মেয়ে দুটি গল্পে মেতে উঠল। কে কিভাবে ছুটি কাটিয়েছে, কী রকম মজা করেছে এসব আর কি।

চেলসি তার নতুন বন্ধুর কাছে গল্প করছে দ্বীপের কোন্ কোন্ জায়গায় সে ঘুরেছে, র‍্যাচেলের চোখ আটকে গেল একটা জার্মান শেফার্ডের ওপর-তামাটে রঙের, গায়ে বেগুনি দাগ-ভিড়ের মাঝখানে দ্রুত পায়ে হাঁটছে।

সাগরে যে কুকুরটাকে আজ দেখেছি ওটা কি সেটা? ভাবছে র‍্যাচেল। চেহারা তো সেরকমই মনে হচ্ছে। যাক, ওটা সুস্থ আছে জেনে ভালো লাগছে। যাই, ভালো করে দেখে আসি কুকুরটার কী অবস্থা।

একটু উঠব, চেলসি, বলল র‍্যাচেল, ওই কুকুরটাকে দেখে আসি।

র‍্যাচেলের চোখ অনুসরণ করে চেলসিও দেখতে পেল জার্মান শেফার্ডকে। আরে ওই তো সে-ই! সেই কুকুরটা!

কুকুরটাকে দেখেছ আগে?

হ্যাঁ। সে এক লম্বা গল্প। আজ সকালে ও-ই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। চলো তো যাই।

ছুটল ওরা। কুকুরটার পিছু নিল। ওটা একটা গলিতে বাঁক নিল। দাঁড়াল ঝকঝকে সবুজ রঙের একটা বাড়ির সামনে। বাড়িটির জানালাগুলো নীল। কুকুরটা এক লাফে সামনের বারান্দায় উঠল, শুয়ে পড়ল ওখানে।

সাবধানে কুকুরটার দিকে পা বাড়াল ওরা। লেজ নাড়ছে কুকুর। ওরা হাত বুলিয়ে দিল গায়ে। কিছু বলল না জার্মান শেফার্ড। চুপচাপ আদর খেতে লাগল। এটাই সেই কুকুর কি না ঠিক বুঝতে পারছি না, বলল চেলসি।

মানে?

চেলসি তখন গল্পটা খুলে বলল র‍্যাচেলকে। জানাল কীভাবে সেইল বোট থেকে পড়ে গিয়েছিল ও। ডুবে মারা যাচ্ছিল, একটা জার্মান শেফার্ড কুকুর ওকে জামা ধরে টেনে তীরে পৌঁছে দেয়। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় ওটা।

আশ্চর্য তো! চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাচেল। আমি ওই একই রকম তামাটে বর্ণের, গায়ে বাদামী ফুটকিঅলা একটা কুকুরকে দেখেছি। সাগরে সাঁতার কাটছিল। তারপর ঘেউ ঘেউ করতে করতে ওটা পানির নিচে চলে যায়। আর দেখিনি ওটাকে। জার্মান শেফার্ডকে ভালো করে দেখল র‍্যাচেল। তবে এটা সেই কুকুরটা নাও হতে পারে। এটাকে ওটার চেয়ে আকারে ছোট লাগছে দেখতে। আর গায়ের রঙও বেশি গাঢ়।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে লাফিয়ে উঠল দুই কিশোরী। লাফ মেরে সিধে হলো কুকুর, শুরু করে দিল ঘেউ ঘেউ। বিশাল শরীরের এক বাহামিয়ান মহিলা, মাথায় গোলাপ রঙের স্ট্র হ্যাট এবং একই রঙা ফুলতোলা কাপড় পরা, পা রাখল বারান্দায়।

হ্যালো, মেয়েরা, কুকুরটার দিকে ফিরল মহিলা, মিস মলি, তুমি কি এই সুন্দর মেয়েদুটিকে এখানে নিয়ে এসেছ?

একরকম তাই, বলল চেলসি ওর পিছু নিয়ে এসেছি আমরা। আজ সকালে পানিতে ডুবে মরার হাত থেকে একটা কুকুর প্রাণ বাঁচিয়েছে আমার। অনেকটা এটার মতো দেখতে।

র‍্যাচেল বলল, সকাল বেলায় সাগরে সাঁতার কাটার সময় আমিও এরকম একটা কুকুর দেখতে পাই। হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় সে। ভেবেছিলাম ডুবে গেছে। আপনার কুকুরটাকেই বোধহয় দেখেছিলাম।

আচ্ছা! অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল মহিলার চোখ। ভারী অদ্ভুত তো! বারান্দায় বসতে বলল সে ওদেরকে। তোমাদের রহস্যের একটা সমাধান হয়তো দিতে পারব। তবে বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছে।

কাঠের রকিং চেয়ারে বসল মহিলা। তার প্রকাণ্ড শরীরের ওজনে কাঁচক্যাচ করে আর্তনাদ ছাড়ল চেয়ার। আগে পরিচয় পর্বটা সেরে নিই। আমি জ্যানেল। তোমরা?

চেলসি ইমারসন।

র‍্যাচেল কাৎজ।

তাহলে, চেলসি, আজ সকালে তোমাকে একটা জার্মান শেফার্ড প্রাণ বাঁচিয়েছে আর র‍্যাচেল তুমি একই কুকুরকে দেখেছ সাগরে সাঁতার কাটতে? চেয়ারে দুলতে দুলতে প্রশ্ন

করল মহিলা। তারপর আপন মনে বলল, সেদিন হয়তো এসে হাজির হয়েছে। হ্যাঁ, এতদিন পরে অবশেষে মুক্তি ঘটতে পারে তার।

আপনি কী বলছেন? জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

মেয়েরা, তোমাদেরকে আমি হতাশ করতে চাই না। তবে আজ সকালে তোমরা যে কুকুরটাকে দেখেছ সে মিস মলি নয়। মিস মলি বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জার্মান শেফার্ড যে পানিকে ডরায়। অথচ সে এই ছোট্ট দ্বীপে বাস করছে যার চারদিকে সমুদ্র।

দোল খাওয়া বন্ধ করল জ্যানেল, চেয়ারটা টেনে নিয়ে এল মেয়েদের কাছে। ফিসফিস করে বলল, তোমরা যাকে দেখেছ, আমি নিশ্চিত, সে সেবা-ভূত সেবা।

ভূত? আঁতকে উঠল ওরা একসঙ্গে।

মিথ্যা বললে আমার কালো চুল সোনালি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দ্বীপের দূর প্রান্তে, সেবাকে সাগরে দেখা গেছে, দেখা গেছে সাগর-সৈকতেও। আর সেটা ১৮৮০ সালের শেষ দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে। শুনবে সেই ঘটনা?

একসাথে মাথা ঝাঁকাল ওরা।

রিচমণ্ড নামে একটা জাহাজ কিউবা থেকে বারমুডা যাচ্ছিল। জনা কুড়ি ছিল তার যাত্রী, উইনচেষ্টার পরিবারসহ। এ পরিবারে ন্যান্সি আর পলি নামে স্কুলছাত্রী দুই বোন ছিল। বাবা-মার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিল। আর ওদের সঙ্গী ছিল একটি জার্মান শেফার্ড। নাম সেবা। ওদের বাবা রপ্তানীর ব্যবসা করতেন। পরিবার নিয়ে বারমুডা যাচ্ছিলেন।

সুন্দর একটি দিনে যাত্রা শুরু হয় ওদের। দখিনা বাতাসের সাথে অনুকূল স্রোত পেয়ে তরতর করে এগিয়ে চলছিল জাহাজ। কিন্তু জাহাজের ক্রু কিংবা যাত্রীদের কেউই জানত না প্রায় ৫০০ মাইল দূর থেকে ভয়ঙ্কর গতিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়। বাহামা চ্যানেল ধরে দ্রুত এগোচ্ছিল ঝড়টা। কিউবা থেকে রওনা হবার দিন দুই পরে অশান্ত হয়ে উঠল সাগর, আকাশের রঙ বদলে গেল হঠাৎ। এক বুড়ো নাবিক সুর করে বলতে লাগল, সকালে যদি থাকে আকাশ লাল, কপালে আছে অশেষ আকাল। রাতে যদি লাল হয় আকাশ, নাবিক পায় নিশ্চিত আশ্বাস। তো সে সকালে আকাশের রঙ লাল বর্ণই ছিল।

রিচমণ্ডের যাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হামলা করে বসল হারিকেন। সে কী প্রচণ্ড ঝড়! ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো গর্জাচ্ছিল বাতাস। রাগী দানবের হাত হয়ে উঠেছিল যেন সাগরের ঢেউ, ভীষণ বেগে আছড়ে পড়ছিল জাহাজের গায়ে, ওটাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছিল ইচ্ছে মতো।

উইনচেষ্টার পরিবার তাদের কুকুরকে নিয়ে নিচের ডেকে আশ্রয় নিল। শুনতে পেল মাথার ওপর মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ছে মাস্তল। পাল-টাল কোথায় উড়ে গেল বাতাসের তোড়ে। জাহাজটার বাঁচা-মরা পুরোপুরি নির্ভর করছিল ঝড় থেমে যাবার ওপর।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভয়ঙ্কর ঝড় ইচ্ছেমতো খেলল রিচমকে নিয়ে। দ্বীপের অগভীর পানিতে মাথা উঁচিয়ে থাকা পাথরখণ্ডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে জাহাজের মারাত্মক ক্ষতি হলো। মি: উইনচেষ্টার কাঠের টুকরোর সঙ্গে রশি দিয়ে মেয়েদেরকে বেঁধে ফেলতে লাগলেন। সাগরে পড়ে গেলেও যাতে ওরা ডুবে না। যায়। কিন্তু কাজটা শেষ করার আগেই প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে রীফের গায়ে। আছড়ে পড়ল জাহাজ, নারকেলের ভাঙা খোলের মতো দুটুকরো হয়ে গেল। কাঠের জাহাজ-এর কার্গো আর যাত্রীরা ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়ে গেল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে।

ন্যান্সি আর পলি আঁকড়ে ধরে রইল সেবাকে। কিন্তু পাহাড় সমান ঢেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেল কুকুরটাকে ওদের কাছ থেকে। সেবা কাঠের ভাঙা টুকরোগুলো খুঁজছিল। দেখল একটা টুকরো ধরে তারস্বরে কাঁদছে ন্যান্সি। সাহায্য চাইছে আর্তস্বরে। টুকরোটা বারবার পিছলে যাচ্ছে হাত থেকে। শেষে হাল ছেড়ে দিল ও।

সেবা প্রাণপণে সাঁতরে পৌঁছে গেল ন্যান্সির কাছে। ন্যান্সি কুকুরটার পেছনের পা ধরে ফেলল। সেবা সাঁতার কেটে চলে এল তীরে, ওখানে পৌঁছে পরিশ্রমে আর ভয়ে নেতিয়ে পড়ল ন্যান্সি।

ঠিক এভাবেই কুকুরটা আমাকে বাঁচিয়েছে আজ সকালে, বলল চেলসি।

তো কী বলছিলাম? ওহ্, হ্যাঁ সেবার কথা। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সেবা। তবে কান খাড়া ছিল ওর। শুনতে পেল আরেকটা মেয়ের ক্ষীণ আর্তনাদ।

পলি? জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

হ্যাঁ। ছোট্ট পলি ভাঙা মাস্তুল আঁকড়ে ধরে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু তীব্র স্রোত ওকে মাঝ সাগরে টেনে নিয়ে। যাচ্ছিল। সেবা প্রবল ক্লান্তি সত্ত্বেও আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। পলিকে উদ্ধার করতে ছুটল।

এদিকে ন্যান্সি অপেক্ষা করছিল তার বোনের জন্যে। সেবাকে পানিতে লাফিয়ে পড়তে দেখেছে সে। যেন জানত পলিকে উদ্ধার করে আনবেই সেবা কিন্তু হায় তা আর হলো না। সেবা বা পলি কেউই আর ফিরে এল না।

মাথা নাড়ল র‍্যাচেল। ইস, কী দুঃখজনক ঘটনা!

হ্যাঁ। সত্যি দুঃখজনক ঘটনা ছিল ওটা। ন্যান্সি বেচারীর কী দশা দেখো। বেচারী তার বাবা-মা, বোন এবং কুকুরটাকে হারিয়েছে। অন্যান্য যাত্রীদের লাশ ভেসে এসেছিল তীরে। তবে পলিকা সেবার লাশ খুঁজে পায়নি কেউ।

এর সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? জানতে চাইল চেলসি।

সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। ওই ভয়ংকর ঝড়ের পরে, ওয়াকার্স বে তে প্রতি বছর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেতে লাগল। জেলে, ট্যুরিষ্ট বা এরকম অনেকেই দেখল তামাটে রঙের, বাদামী ফুটকিঅলা একটা জার্মান শেফার্ড সাগরে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

সেবার ভূত? জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

হা, সেবার ভূত। আমাদের দ্বীপের অনেকের বিশ্বাস সেবা একটি অতৃপ্ত প্রেতাত্মা। ছোট্ট পলির খোঁজে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেবে দেখ, একটা কুকুর তার মনিবের মেয়েকে এতই ভালোবাসত যে মৃত্যুর পরেও তাকে ভুলতে পারেনি।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও প্রশ্নটা করি- আপনার কি ধারণা সেবাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে? প্রশ্ন করল চেলসি।

ধারণা? আমি নিশ্চিত ওটা সেবা ছিল।

আপনি বলেছিলেন সেদিন হয়তো এসে হাজির হয়েছে। হ্যাঁ, এতদিন পরে অবশেষে মুক্তি ঘটতে পারে। মানে কী এ কথার? জানতে চাইল র‍্যাচেল।

আমার ধারণা অতৃপ্ত প্রেতাত্মাদের অসম্পূর্ণ কিছু কাজ থাকে, ব্যাখ্যা করল জ্যানেল। সে কাজ শেষ না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না তাদের আত্মা। সেবার আত্মাও অতৃপ্ত ছিল সে পলিকে রক্ষা করতে পারেনি বলে। একশ বছর ধরে তার আত্মা ঘুরে মরেছে অসমাপ্ত কাজটা সমাপ্ত করার জন্যে। তারপর চেলসির ঘটনাটা ঘটল। সে বোট থেকে পড়ে গেল। ডুবে মরতে যাচ্ছিল। সেবা এসে তাকে বাঁচাল। রক্ষা করল একটি বাচ্চা মেয়ের জীবন। আর পানিতে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন রইল না সেবার। তার আত্মা মুক্তি পেল এতদিন পরে।

কিন্তু কুকুরটাকে আমিও দেখেছি, বলল র‍্যাচেল। আর সেটা চেলসি উদ্ধার পাবার পরে।

আমার ধারণা তুমি যে সেবাকে দেখেছ সে ছিল ১০০ বছরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সেবা। একটা কথা জিজ্ঞেস করি? অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে কি ঘেউ ঘেউ করেছিল কুকুরটা?

জ্বি, জবাব দিল র‍্যাচেল।

তার মানে পৃথিবীর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েছে সে, বলল জ্যানেল। আর কেউ কোনোদিন দেখতে পাবে না তাকে। তার আত্মা এখন বাস করছে শান্তিতে।

আতঙ্ক

সারা হপ্তা ধরে উত্তুরে হাওয়া বইবার কথা বলছিল ওরা। বিষুদবার হামলে পড়ল ঝড়। বিকেল চারটার মধ্যে আট ইঞ্চি তুষার জমে উঠল রাস্তায়, থামার কোনও লক্ষণ নেই। আমরা অভ্যাসমত বিকেল পাঁচটা/ছটার দিকে হাজির হয়ে গেলাম হেনরির নাইট আউল-এ। ব্যাঙ্গোরের এই একটাই মাত্র দোকান যা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় খোলে।

হেনরি কেউকেটা কোনও ব্যবসায়ী নয়, কলেজ ছাত্রদের কাছে বিয়ার আর মদ বিক্রি করে। আমাদের মত অকর্মার ধাড়িদের আড্ডার চমৎকার জায়গা হেনরির বার।

আজ বিকেলে হেনরি বসেছে কাউন্টারে। আমি, বিল পেলহ্যাম, বার্টি কনরস আর কার্ল লিটলফিল্ড ঘিরে বসেছি চুল্লি। বাইরে, ওহায়ো স্ট্রীটে কোনও গাড়ি চলছে না। বৈদ্যুতিক লাঙল দিয়েও জমাটবাধা তুষার কাটতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। শো শো শব্দে বইছে প্রবল হাওয়া। ডাইনোসরের মেরুদণ্ডের মত উঁচু আর স্কুপ হয়ে আছে তুষার বাড়িঘরের ছাদে।

হেনরির দোকানে আজ বিকেলে খদ্দের বলতে মোটে তিনজন-অবশ্য কানা এডিকে যদি এর কাতারে ফেলা যায়। এডির বয়স সত্তরের কাছাকাছি, পুরোপুরি অন্ধ নয় সে। হপ্তায় দুতিনদিন আসে সে এখানে। কোটের নিচে ব্রেড লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়,

তোমাদেরকে আবার কেমন বোকা বানালাম এমন ভাব নিয়ে। হেনরি এডিকে পছন্দ করে বলে তার কাছ থেকে কখনোই রুটির দাম রাখে না।

আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাঁপটা নিয়ে। টলতে টলতে ভিতরে ঢুকল এক কিশোর। মেঝেতে পা ঠুকে জুতো থেকে বরফ ঝাড়ছে। ওকে দেখেই চিনে ফেললাম। রিচি গ্রেনাডাইনের ছেলে। চেহারায় তীব্র উৎকণ্ঠা। মুখ ফ্যাকাসে। কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে, ঘন ঘন ঢোক গিলছে বলে।

মি, পার্মালি, হেনরির উদ্দেশে বলল সে, চোখের মণি ঘুরছে সকেটের মধ্যে। আপনাকে এখুনি একবার আসতে হবে। ওঁর জন্য বিয়ার নিয়ে যাব। আমি ও বাড়িতে আর ফিরতে চাই না। আমার ভয় লাগছে।

একটু সুস্থির হয়ে বসো, কসাইর সাদা অ্যাপ্রনটা খুলে রেখে কাউন্টার ঘুরে এল হেনরি। কী হয়েছে? তোমার বাবা মাতাল হয়ে গেছে?

হেনরির কথায় বুঝলাম রিচি বেশ কয়েকদিন ধরে ওর দোকানে আসছে না। প্রতিদিনই ওর একটা বিয়ার চাই, সবচেয়ে সস্তাটা কিনবে সে। বিশালদেহী, নোটকু রিচি বিয়ার খেতেও পারে। ক্লিফটনের করাতকলে কাজ করত সে। কিন্তু কী একটা ভুলের অপরাধে চাকরিটা চলে যায়। করাত-কল কোম্পানি অবশ্য ওকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। চাকরি

ছাড়ার পর থেকে সারাদিন বিয়ার খেতে খেতে আরও ফুলেছে রিচি। এখন ছেলেকে পাঠায় বিয়ার কিনতে।

বাবা মাতাল হয়েছে, শুনতে পেলাম ছেলেটা বলছে। কিন্তু সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা...সমস্যা...ওহ্ ঈশ্বর, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর!

হেনরি কার্লকে বলল, কার্ল, তুমি এদিকে দুমিনিট খেয়াল রাখতে পারবে?

অবশ্যই।

বেশ। টিমি স্টকরুমে চলো। শুনি কী হয়েছে।

ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল হেনরি। কার্ল কাউন্টারে এসে বসল হেনরির টুলে। কেউ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। আমরা হেনরির গভীর, ধীর গলা শুনতে পেলাম। টিমি উত্তেজিত ও দ্রুত কণ্ঠে কথা বলছে। তারপর ফুঁপিয়ে উঠল সে।

বিল পেলহ্যাম গলা খাঁকারি দিয়ে পাইপে তামাক ভরতে লাগল।

রিচিকে অনেকদিন দেখি না। বললাম আমি।

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বিল, তাতে কিছু আসে যায় না।

অক্টোবরের শেষে একবার এসেছিল, জানাল কার্ল। হ্যালোউইনের সময়। এক কেস বিয়ার কিনল। দিনদিন ফুলে যাচ্ছিল ও।

তারপর আর কিছু বলার মত পেলাম না। ছেলেটা এখনও কাঁদছে। তবে কাঁদতে কাঁদতে কথাও বলছে। বাইরে গর্জন ছাড়ছে বাতাস, দরজা-জানালায় চাবুক কষাচ্ছে। রেডিওতে বলল সকালের মধ্যে আরও ছয় ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ পড়বে। এখন জানুয়ারির মাঝামাঝি। ভাবছিলাম অক্টোবরের পর থেকে রিচির চেহারা আদৌ কেউ দেখেছি কিনা।

আরও কিছুক্ষণ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলল হেনরি। তারপর ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ছেলেটা কোট খুলে ফেলেছে তবে হেনরি তার কোট গায়ে চাপিয়েছে। ছেলেটার বুক হাপরের মত ওঠা-নামা করছে, চোখ লাল।

হেনরিকে উদ্বিগ্ন দেখাল টিমিকে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ওর খিদে পেয়েছে। আমার বউ ওকে খাইয়ে দেবে। আমি রিচির বাসায় যাব।

তোমরা কেউ আমার সঙ্গে চলো। টিমি বলল ওর বাপের বিয়ার লাগবে। টাকাও দিয়েছে। হাসার চেষ্টা করল হেনরি, কিন্তু হাসি ফুটল না মুখে।

কী বিয়ার? জানতে চাইল বার্টি। আমি নিয়ে আসি।

হ্যারোস সুপ্রিম, বলল হেনরি। কয়েকটা প্যাকেট আছে ওখানে।

আমি উঠে পড়লাম। হেনরির সঙ্গে বার্টি যাবে, আমাকেও যেতে হবে। ঠাণ্ডায় কার্লের বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। আর বিলি পেলহাম এখানেই থাকছে।

বার্টি হ্যারোস-এর চারটা প্যাকেট নিয়ে এল। ওগুলো বাক্সে ভরলাম আমি। হেনরি দোতলায়, ওর বাসায় নিয়ে গেল ছেলেটাকে। টিমিকে বউয়ের কাছে রেখে নেমে এল নিচে। মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ আছে কিনা। বিলি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, হয়েছেটা কী? রিচি মেরেছে ছেলেটাকে?

না, বলল হেনরি। আমি এখনই কিছু বলতে চাই না। শুনলে পাগলের প্রলাপ মনে হবে। তবে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। টিমি বিয়ারের দাম দেয়ার জন্য যে টাকাটা এনেছে ওটা দেখো। পকেট থেকে চারটে ডলার বের করল হেনরি, রাখল কাউন্টারের কিনারে। টাকাগুলোর গায়ে ধূসর, পিচ্ছিল, ঘিনঘিনে কী একটা জিনিস লেগে আছে। কার্লকে বলল, এ টাকা কেউ যেন না ছোয়। ছেলেটা যা বলেছে তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয় এ টাকায় হাত দেয়া যাবে না।

মাংসের কাউন্টারে গিয়ে সিঙ্কে হাত ধুয়ে নিল হেনরি।

আমি গায়ে কোট চাপালাম, গলায় মাফলার বেঁধে নিলাম। গাড়ি নিয়ে লাভ হবে না, তুষার ঠেলে যেতে পারব না। রিচি কার্ভ স্ট্রিটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ থাকে। এখানে থেকে হাঁটা পথের দূরত্ব।

আমরা বেরুচ্ছি, বিল পেলহ্যাম বলল, সাবধানে যেয়ো। হেনরি শুধু মাথা ঝাঁকাল। হ্যারোস-এর বিয়ারের কেস ছোট একটি হ্যান্ডকার্টে রেখেছে, দরজার ধারে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

করাতের ব্লেডের মত বাতাস যেন পোচ দিল গায়ে। মাফলারটা দিয়ে মাথা ঢেকেঢুকে নিলাম আমি। বাটি দ্রুত মোজা পরে নিল।

আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাতে চাই না, বলল হেনরি, মুখে অদ্ভুত হাসি। তবে যেতে যেতে বলব ছেলেটার গল্প... কারণ ঘটনাটা তোমাদের জানা দরকার।

কোটের পকেট থেকে ৪৫ ক্যালিবারের একটা পিস্তল বের করল হেনরি। ১৯৫৮ সাল থেকে দিন-রাত চব্বিশঘন্টা গুলি ভরা পিস্তলটা প্রস্তত থাকে কাউন্টারের নিচে। একবার এক লোক মাস্তানি করতে এসেছিল হেনরীর সঙ্গে। লোকটাকে পিস্তল তুলে দেখানো মাত্র কেটে পড়েছিল সুড়সুড় করে। আরেকবার এক কলেজে পড়া ছোকরা চাদা চাইতে এসেছিল। তারপর এমনভাবে সে ছুটে পালায়, যেন ভূতে তাড়া করেছে।

প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি তিনজন। কার্ট ঠেলতে ঠেলতে ছেলেটার গল্প বলল হেনরি। ছেলেটা বলেছে ঘটনার সূত্রপাত নিশ্চয় কোন বিয়ারের ক্যান থেকে। কিছু কিছু বিয়ার খুব বাজে স্বাদের হয়। একবার এক লোক আমাকে বলেছিল বিয়ারের কৌটায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকলেও তা দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে দ্রুত সব কাণ্ড ঘটাতে পারে। এসব ব্যাকটেরিয়া বিয়ার খেয়ে বেঁচে থাকে।

যা হোক, ছেলেটা বলল অক্টোবরের এক রাতে রিচি গোল্ডেন লাইট-এর এক কেস বিয়ার কিনে বাসায় ফেরে। সে বিয়ার খাচ্ছিল আর টিমি ব্যস্ত ছিল স্কুলে হোমওয়াক নিয়ে।

টিমি ঘুমাতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেল তার বাপ বলছে, ক্রাইস্ট জেসাস, জিনিসটা ভালো না।

টিমি জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, বাবা?

ওই বিয়ার। বলল রিচি। ঈশ্বর, এরকম বাজে স্বাদের বিয়ার জীবনেও খাইনি আমি।

রিচির মত বিয়ারখেকো মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি। একবার বিকেলে ওয়ালি স্পাতে ওকে দেখেছি বাজি ধরে বিয়ার খেতে। সে এক লোকের সঙ্গে বাজি ধরেছিল এক মিনিটে

বাইশ গ্লাস বিয়ার সাবাড় করবে। স্থানীয় কেউ ওর সঙ্গে বাজি ধরার সাহস পায় না। কিন্তু এ লোকটা এসেছিল মন্টপেলিয়েরের থেকে। সে কুড়ি ডলার বাজি ধরে। রিচি তিপ্পান্ন সেকেন্ডে কুড়িটি বিয়ার সাবড়ে দেয়। তারপরও বার ছেড়ে যাওয়ার সময় ওকে বিন্দুমাত্র টলতে দেখিনি।

আমার বমি আসছে, বলল রিচি। সাবধান!

টিমি বলল সে বিয়ারের ক্যানের গন্ধ শুঁকেছে। মনে হয়েছে ভিতরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। তারপর আর ওটার কোনও সাড়াশব্দ নেই। ক্যানের মাথায় ধূসর রঙের একটা বুদ্বুদ দেখেছে টিমি।

দিন দুই পরে ছেলেটা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে রিচি টিভি দেখছে। অবাক হলো সে। কারণ তার বাপ নটার আগে কখনও বাড়ি ফেরে না।

কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল টিমি।

ব্যাপার কিছু না। টিভি দেখছি, জবাব দিল রিচি। আজ আর বেরুতে ইচ্ছে করল না।

সিনেকর বাতি জ্বালিয়েছে টিমি, খেঁকিয়ে উঠল রিচি। বাতি নেভা!

টিমি বাতি নেভালো, জানতে চাইল না বাতি ছাড়া অন্ধকারে সে হোমওয়াক করবে কীভাবে। রিচির মেজাজ খারাপ হলে তার সঙ্গে কথা বলা যায় না।

দোকান থেকে আমার জন্য একটা বিয়ার কিনে নিয়ে আয়, হুকুম করল রিচি। টাকা টেবিলের উপর রাখা আছে।

ছেলেটা বিয়ার নিয়ে ফিরে এসে দেখে বাপ তখনও বসে রয়েছে অন্ধকারে। টিভি অফ করা। গা ছমছম করে ওঠে ছেলেটার। অবশ্য অন্ধকারে ফ্ল্যাটে বড়সড় একটা পিণ্ডের মত বাপকে ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখলে কে না ভয় পাবে?

টিমি টেবিলের উপর বিয়ারের ক্যান রাখল। বাপের সামনে আসা মাত্র ভক্ করে পচা একটা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল তার। পচা চিজের বিটকেলে গন্ধ। কিন্তু বাপকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না টিমি। দরজা বন্ধ করে হোমওয়ার্ক নিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর শুনল চালু হয়েছে টিভি, সেই সাথে বিয়ারের ক্যান খুলছে রিচি।

হপ্তা দুই এরকমই চলল। ছেলেটা সকালে উঠে স্কুলে যায়। স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে তার বাপ টিভির সামনে বসে বসে আছে, টেবিলের উপর বিয়ার কেনার টাকা।

একদিন বিকেল চারটা নাগাদ বাসায় ফিরেছে টিমি-ততক্ষণে বাইরেটা কালো হয়ে এসেছে-রিচি হুকুম করল, আলো জ্বেলে দে সিঙ্কের বাতি জ্বালল টিমি। দেখল বাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে বসা।

দেখ, বলে কম্বলের নিচে থেকে একটা হাত বের করে আনল রিচি। তবে ওটা হাত নয়। ধূসর রঙের একটা মাংসপিণ্ড। আঁতকে উঠল টিমি। জিজ্ঞেস করল, বাবা, তোমার কী হয়েছে?

রিচি জবাব দিল, জানি না। তবে ব্যথা লাগছে না বরং...ভালোই লাগছে।

টিমি বলল, আমি ডাক্তার ওয়েস্টফেলকে ডেকে আনি। তখন কম্বলটা ভয়ানক কাঁপতে শুরু করল, যেন ওটার নিচে প্রবলবেগে কিছু ঝকি খাচ্ছে। রিচি বলল, খবরদার, ডাক্তারের কাছে যাবি না। সে চেষ্টা করলে তোকে আমি ধরে ফেলব। তারপর তোর দশা হবে এরকম। বলে মুখের উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলল রিচি।

আমরা এতক্ষণে হার্লো ও কার্ডোস্ট্রিটের মোড়ে চলে এসেছি। শুধু ঠাণ্ডা নয়, ভয়েও গা-টা কেমন হিম হয়ে আছে আমার। এরকম গল্প হজম করা মুশকিল। তবে কিনা পৃথিবীতে অনেক আজব ঘটনাই ঘটে। জর্জকেলসো নামে এক লোককে চিনতাম আমি। ব্যাঙ্গর পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। পনেরো বছর সে কাটিয়েছে মাটির নিচে পানির পাইপ আর বৈদ্যুতিক তার মেরামতের কাজে। অবসর নেয়ার তখন মাত্র

দুবছর বাকি। একদিন সে চাকরিটা ছেড়ে দিল। ফ্রাঙ্কি হ্যান্ডম্যান ওকে চিনতো। সে বলেছে জর্জ একদিন এসেক্সের একটি ড্রেনের পাইপ সারাতে হাসি মুখে, স্বভাবসুলভ ঠাট্টা মশকরা করতে করতে মাটির নিচে গিয়েছিল। পনেরো মিনিট পর যখন সে উপরে উঠে এল, তার সমস্ত চুল বরফের মত সাদা, চাউনি দেখে মনে হচ্ছিল নরক দর্শন করে এসেছে। সে সোজা ওয়ালির স্পাতে ঢুকে আকণ্ঠ মদপান শুরু করে। মদ খেয়ে খেয়ে দুবছরের মাথায় মারা যায় জর্জ। ফ্রাঙ্কি ওর সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছিল সিউয়ার পাইপে কী দেখে ভয় পেয়েছে জর্জ। জর্জ ফ্রাঙ্কিকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কোনদিন কুকুর সাইজের মাকড়সা দেখেছে কিনা। ঘটনা কতটা সত্য আর কতটা অতিরঞ্জিত আমি জানি না, তবে পৃথিবীতে নিশ্চয় এমন ঘটনা ঘটে যা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকেও পাগল বানিয়ে ছাড়ে।

আমরা রাস্তার মোড়ে মিনিট খানেকের জন্য দাঁড়ালাম। যদিও তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসের চাবুক আছড়ে পড়ছে গায়ের উপর।

টিমি কী দেখল? জিজ্ঞেস করল বার্টিং।

টিমি বলেছে ও ওর বাপকেই দেখেছে, জবাব দিল হেনরি। তবে সারা গায়ে ধূসর জেলি মাখা। পরনের জামাকাপড় যেন গলে গিয়ে লেগে ছিল শরীরের সঙ্গে।

ঈশ্বর! বলল বার্টি।

রিচি আবার কম্বল দিয়ে মুড়ে নেয় নিজেকে এবং বাতি নিভিয়ে দেয়ার জন্য চেঁচাতে থাকে বাচ্চাটার উদ্দেশে।

ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের মত দেখাচ্ছিল বোধহয় ওকে, মন্তব্য করলাম আমি।

হ্যাঁ, সায় দিল হেনরি। অনেকটা সেরকমই।

পিস্তলটা রেডি রেখো, বলল বার্টি।

রেডি আছে, বলল হেনরি। আমরা আবার হাঁটা দিলাম।

রিচি গ্রেনাডাইনের অ্যাপর্টমেন্ট হাউজটি পাহাড়ের প্রায় চূড়াতে, ভিক্টোরিয়ান আদলে গড়া। এগুলোকে এখন অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে। বার্টি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রিচি তিনতলায় থাকে। আমি সুযোগ বুঝে হেনরির কাছে জানতে চাইলাম এরপরে বাচ্চাটার কী হলো।

নভেম্বরের তৃতীয় হপ্তায়, এক বিকেলে বাচ্চাটা বাসায় এসে দেখে তার বাপ প্রতিটি জানালা চাদর দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। ঘর থেকে বদ গন্ধটার তীব্রতা বেড়েছে। আরও, কেমন ফল পচা গন্ধ।

সপ্তাহখানেক ধরে রিচি তার ছেলেকে দিয়ে চুল্লিতে বিয়ার গরম করাল। ভাবা যায়? বেচারা দিনের পর দিন ওই বাড়িতে বসে চুল্লিতে বিয়ার গরম করছে আর শুনছে চুক চুক করে তা পান করছে তার বাপ।

এরকম চলল আজতক পর্যন্ত। আজ বাচ্চাটা ঝড়ো হাওয়ার কারণে ছুটি পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল বাসায়।

ছেলেটি বলেছে সে সোজা ঘরে ঢুকে পড়ে, আমাদেরকে বলল হেনরি। উপরতলায় হলঘরে একটি বাতিও জ্বলছিল না-টিমির ধারণা ওর বাপ সবগুলো বাল্ব ভেঙে রেখেছে। তাই প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দরজার সামনে আসতে হলো ওকে।

এমন সময় শুনতে পেল কিছু একটা নড়াচড়া করছে ওখানে, হঠাৎ টিমির মনে পড়ল তার বাপ সারাদিন কী করে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। বাপকে সে গত একমাসে বলতে গেলে চেয়ার ছেড়ে নড়তেই দেখেনি। তার কি বাথরুমে যাওয়ারও প্রয়োজন হয় না!

দরজার মাঝখানে একটা ফুটো ছিল। ফুটোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে কৌশলে ছিটকিনি খুলে ফেলল টিমি। তারপর একটা চোখ রাখল ফুটোতে।

আমরা রিচির বাড়ির সামনে চলে এসেছি। আমাদের সামনে উঁচু, নোংরা একটা মুখের মত ঝুলে আছে বাড়িটি। তিনতলার জানালা বন্ধ। অন্ধকার। যেন কেউ কালো রঙ মেখে দিয়েছে জানালায়, যাতে বাইরে থেকে ভিতরে কী হচ্ছে বোঝা না যায়।

অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল টিমির। তারপর প্রকাণ্ড ধূসর একটা পিণ্ড দেখতে পেল সে, মানুষের আকৃতির মত নয় মোটেই, মেঝের উপর গড়িয়ে চলছে, পিছনে রেখে আসছে ধূসর, পিচ্ছিল একটা চিহ্ন। সাপের মত একটা হাত বাড়িয়ে দিল ওটা-দেয়াল থেকে টান মেরে খুলে নিল একটা তক্তা। দেয়ালের গর্ত থেকে টেনে আনল একটা বেড়াল। এক মুহূর্ত বিরতি দিল হেনরি। তারপর বলল, একটা মরা বেড়াল। পচা। গায়ে কিলবিল করছিল সাদা সাদা পোকা... থামো, কাতরে উঠল বার্টি।

ঈশ্বরের দোহাই লাগে বেড়ালটা খেয়ে ফেলে রিচি।

ঢোক গেলার চেষ্টা করলাম, দলা দলা কী যেন ঠেকল গলায়। তখন টিমি এক ছুটে পালিয়ে আসে ওখান থেকে, সমাপ্তি টানল হেনরী।

ওখানে আর যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না, বলল বার্টি। হেনরি কোনও মন্তব্য করল না। বার্টি আর আমার উপর চোখ বুলাল শুধু।

যাব, বললাম আমি। রিচির জন্য বিয়ার নিয়ে এসেছি না! বার্টি আর কিছু বলল না। আমরা সিঁড়ি বেয়ে সামনের হলরুমের দরজায় চলে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে নাকে ধাক্কা দিল গন্ধটা।

কী যে বিশ্রী, ভয়ঙ্কর বোটকা গন্ধ! বমি ঠেলে এল গলায়।

হলঘরের নিচে একটা মাত্র হলুদ বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। সিঁড়িগুলো উঠে গেছে উপরে, মিশেছে অন্ধকারে।

হেনরি তার কার্ট থামাল। ও বিয়ারের কেস তুলছে, আমি নিচের সিঁড়ির বোতামটা চেপে ধরলাম। দোতলার ল্যান্ডিং বাল্ব জ্বলে উঠবে। কিন্তু জ্বলল না। টিমি ঠিকই বলেছে সবগুলো বাল্ব ভেঙে রেখেছে ওর বাপ।

বার্টি কাঁপা গলায় বলল, আমি বিয়ার নিয়ে যাই। তুমি পিস্তল রেডি রাখো।

আপত্তি করল না হেনরি। পিস্তল বাগিয়ে আগে আগে চলল। আমি ওর পিছনে, আমার পিছনে বিয়ার হাতে বার্টি। দোতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে এলাম, গন্ধের

তীব্রতা বাড়ল আরও। পচা আপেলের গন্ধ।

প্রতিবেশীরা এই লোকটাকে লাথি মেরে দূর করে দিচ্ছে না কেন? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কীসের প্রতিবেশী? পাল্টা প্রশ্ন করল হেনরি। এ গন্ধে ভূত পালাবে। কে যাবে ওকে লাথি মেরে দূর করে দিতে?

তিনতলায় উঠছি আমরা। এ তলার সিঁড়িগুলো আগেরগুলোর চেয়ে সরু এবং খাড়া। গন্ধে নাড়িভূঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। উপরতলায় ছোট একটি হল, একটা দরজা দেখতে পেলাম, দরজার মাঝখানে ছোট একটি ফুটো। বাটি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল,দেখো, কীসের মধ্যে এসেছি।

হলঘরের মেঝেতে থকথকে পিচ্ছিল একটা জিনিস, ছড়িয়ে আছে সমস্ত জায়গায়। ছোট ছোট গর্ত এখানে-সেখানে। মনে হলো মেঝেতে এক সময় কার্পেট পাতা ছিল, কিন্তু ধূসর জিনিসটা ওটা খেয়ে ফেলেছে।

হেনরি দরজার সামনে গেল, আমরা ওর পিছু নিলাম। বার্টির কথা জানি না, তবে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কাঁপুনি উঠে গেছে আমার। হেনরি পিস্তলের কুঁদো দিয়ে বাড়ি মারল দরজার। রিচি? ডাকল সে, কণ্ঠ শুনে মনে হলো না একচুলও ভয় পেয়েছে। যদিও মুখ কাগজের মত সাদা। আমি নাইট আউল-এ হেনরি পার্মালি। তোমার বিয়ার নিয়ে এসেছি।

পুরো এক মিনিট কোনও সাড়া নেই, তারপর বলে উঠল একটা কণ্ঠ, টিমি কোথায়? আমার ছেলে কই? ভয়ের চোটে প্রায় দৌড় দিতে যাচ্ছিলাম। ওটা মোটেই মানুষের কণ্ঠ নয়। ঘরঘরে, অপার্থিব, ভৌতিক একটা আওয়াজ।

ও আমার দোকানে আছে, বলল হেনরি। খানা খাচ্ছে। ও না খেতে পাওয়া বেড়ালের মতই হাড্ডিসার হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত কিছুই শোনা গেল না, তারপর ভয়ঙ্কর একটা ঘরঘরে শব্দ ভেসে এল। আত্মা কাঁপিয়ে দেয়া গলাটা দরজার ওপাশ থেকে বলল,দরজা খুলে বিয়ারটা ভিতরে ঠেলে দাও। আমি খুলতে পারব না।

এক মিনিট, বলল হেনরি। এ মুহূর্তে তোমার কী অবস্থা, রিচি?

তা দিয়ে তোমার দরজার নেই, বলল কণ্ঠটা, বিয়ার দিয়ে চলে যাও।

মরা বেড়ালে আর তাই চলছে না, তাই না? বলল হেনরি। হাতে বাগিয়ে ধরল পিস্তল।

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল হেনরির কথাটা শুনে। গত তিন হপ্তায় দুটি তরুণী আর এক বুড়ো সৈনিক নিখোঁজ হয়েছে-সকলেই সন্ধ্যার পরে।

হয় বিয়ার দাও, নয়তো আমি নিজেই বেরিয়ে আসব, বলল ভয়ঙ্কর কণ্ঠ।

হেনরি আমাদেরকে ইশারা করল পিছু হঠতে। আমরা তাই করলাম। ইচ্ছে। হলে আসতে পারো, রিচি, পিস্তল ক করল হেনরি।

ঠিক তখন প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল রিচি। তারপর এক সেকেন্ড, মাত্র এক সেকেন্ড দৃশ্যটা দেখলাম, তারপর তিন তলা থেকে লাফাতে লাফাতে নিচে চলে এলাম আমি আর বার্টি একেকবারে চার/পাঁচটা সিঁড়ি টপকে। বরফের উপর ডিগবাজি খেয়ে পড়লাম। হাচড়ে পাঁচড়ে উঠে দিলাম ছুট।

ছুটতে ছুটতে শুনলাম হেনরির পিস্তলের আওয়াজ। পরপর তিনবার। আমি এক বা দুই সেকেন্ডের জন্য যে দৃশ্য দেখেছি তা জীবনেও ভুলব না। জেলির প্রকাণ্ড একটা ঢেউ, অনেকটা মানুষের আকারের: থকথকে, পিচ্ছিল একটা জিনিস পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছিল।

তবে ওর চেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল। ওটার চোখ হলুদ, বুনো, আর সমতল, তাতে মানুষের আত্মার চিহ্ন নেই। তবে চোখ দুটো নয়। চারটে। জিনিসটা মাঝখানে, দুজোড়া চোখের মধ্যে সাদা, আঁশের মত গোলাপি মাংসখণ্ড কিলবিল করছিল।

ওটা ভাগ হয়ে যাচ্ছিল একটা থেকে দুটো। আমি বার্টি দোকানে ফিরে এলাম একটিও বাক্য বিনিময় না করে। জানি না ও কী ভাবছে, তবে আমার দুই ঘরের নামতা মনে পড়ে যাচ্ছিল। দুদুগুণে চার, চার দুগুণে আট, দুগুণে ষোলো, ষোলো দুগুণে...

আমাদেরকে দেখে লাফিয়ে উঠল কার্ল আর বিল পেলহ্যাম। ঝড়ের বেগে প্রশ্ন করতে লাগল। তবে দুজনের দুজনের কেউ কিছু বললাম না। অপেক্ষা করছি। হেনরির জন্য। ও ফিরে আসে নাকি ওটা, দেখব। আশা করি হেনরিই ফিরে আসবে।

ঘাতক

খুন হয়ে যাচ্ছে, এই ভয়টা যেদিন থেকে পেয়ে বসল ওকে, সাহস করে কথাটা কাউকে বলতে পারেনি। আশঙ্কাটা একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল, গত কয়েকমাস ধরে, ধীরে ধীরে প্রবল হচ্ছিল সন্দেহ, ছোট্ট কয়েকটা ঘটনা সেটাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। গভীর এবং তীব্র এক স্রোতের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে সে এই মুহূর্তে, নিচের দিকে প্রচণ্ড জোরে কে যেন টানছে ওকে, কালো এবং বিশাল এক গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে। অষ্টগুড়, টেনিস বল সাইজের ড্যাবডেবে চোখওয়ালা বিকট চেহারার কী ওটা? গোল গোল, চাকা চাকা দাগ শুড়লোর, এক সঙ্গে প্রসারিত হলো সবকটা একটা ঝিলিক দেখল সে শুধু, পরক্ষণে টের পেল হিলহিলে শুঁড়গুলো তাকে বেঁধে ফেলেছে ঠাণ্ডা, কঠিন নিষ্পেষণে। মুখ হাঁ হয়ে গেল তার, চিৎকার দিতে যাচ্ছে গলা ফাটিয়ে..

ঘরটাকে তার মনে হলো বিশাল এক সমুদ্র, ভেসে আছে সে। কিন্তু চারপাশে ওরা কারা? সাদা মুখোশ পরা, হাতে ধারাল যন্ত্রপাতি, কথা বলছে নিচু স্বরে। কে আমি, ভাবার চেষ্টা করল সে; কি নাম আমার?

শায়লা হক। বিদ্যুৎচমকের মত নিজের নামটা মনে পড়ল তার। মাহবুবুল হকের স্ত্রী। কিন্তু তারপরও অস্বস্তিবোধটা দূর হলো না। নিজেকে তার ভীষণ একা এবং অসহায়

মনে হচ্ছে মুখোশধারী লোকগুলোর মাঝে। প্রচণ্ড ব্যথা তার শরীরে, বমি উগরে আসতে চাইছে, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে মৃত্যুভয়।

আমি ওঁদের চোখের সামনে খুন হয়ে যাচ্ছি, ভাবল শায়লা। এই ডাক্তার কিংবা নার্সরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছেন না আমার শরীরে কি ভয়ঙ্কর একটা জিনিস ঘাপটি মেরে আছে। জানে না মাহবুবও। শুধু আমি জানি। আর জানে ওই খুনেটা-খুদে গুপ্তঘাতক।

মারা যাচ্ছি আমি। কিন্তু কাউকে কথাটা বলতে পারছি না। আমার সন্দেহের কথা শুনলে ওঁরা হাসবেন, বিদ্রূপ করে বলবেন প্রলাপ বকছি। কিন্তু খুনেটাকে ওরা ঠিকই কোলে তুলে নেবেন, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবেন না আমার মৃত্যুর জন্যে ওটাই দায়ি। শুধু সবাই শোক প্রকাশ করবে আর আমার খুনীর জন্যে সবার দরদ উথলে পড়বে।

মাহবুব কোথায়? অবাক হলো শায়লা। নিশ্চয়ই ওয়েটিং রূমে। একটার পর একটা সিগারেট ফুকছে আর ঘড়ির দিকে একঠায় তাকিয়ে অপেক্ষা করছে কখন শুনবে সংবাদটা। শায়লার শরীর হঠাৎ ঘেমে গোসল হয়ে গেল, প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল ও। এবার! আসছে ওটা! আমাকে খুন করতে আসছে! চিৎকার শুরু করল সে। কিন্তু আমি মরব না! কিছুতেই মরব না!

বিশাল এক শূন্যতা গ্রাস করল শায়লাকে। খালি খালি লাগল পেট। ব্যথাটা হঠাই চলে গেছে। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগল নিজেকে। অন্ধকারের একটা পর্দা দ্রুত নেমে আসছে চোখের

ওপর। হে খোদা, আঁধারের রাজ্যে হারিয়ে যেতে যেতে ভাবল শায়লা, শেষ পর্যন্ত ঘটেছে তাহলে ব্যাপারটা...।

পায়ের শব্দ শুনতে পেল শায়লা। আস্তে আস্তে কে যেন হেঁটে আসছে। দূরে, একটা কণ্ঠ বলে উঠল, ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। ওকে এখন ডিস্টার্ব কোরো না।

পরিচিত শেভিং লোশনের সুঘ্রাণ স্বর্গের শান্তি বইয়ে দিল শায়লার শরীরে। মাহবুব। ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর কণ্ঠটা ডা. মোখলেসুর রহমানের।

চোখ খুলল না শায়লা। নরম গলায় বলল, আমি জেগে আছি। অবাক কাণ্ড। কথা বলছে সে। তার মানে মারা যায়নি তো!

শায়লা! অনুভব করল ওর হাতদুটো উষ্ণ আবেগে চেপে ধরেছে মাহবুব।

তুমি খুনেটার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ, মাহবুব, ভাবল শায়লা। আমি শুনতে পাচ্ছি তুমি ওটাকে দেখতে চাইছ, তাহলে আমার আর কিছুই বলার নেই। চোখ খুলল শায়লা। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাহবুব। দুর্বল হাতটা বাড়াল শায়লা, শুজনিটা সরাল একপাশে।

ঘাতক তাকাল মাহবুবের দিকে। তার ছোট্ট মুখটা লাল, কালো গভীর চোখ জোড়া শান্ত। ঝিকমিক করছে।

ইসসিরে! হেসে উটল মাহবুব। কি সুন্দর আমার সোনাটা! চুমু খাওয়ার জন্য ঝুঁকল সে, আস্তিন ধরে টান দিলেন ডা. মোখলেসুর রহমান।

না, না, এখন নয়, পরে, বললেন তিনি। নবজাতক শিশুকে এভাবে চুমু খেতে নেই। তুমি আমার চেম্বারে এসো। কথা আছে।

যাওয়ার আগে শায়লার হাতে চাপ দিল মাহবুব। কৃতজ্ঞ গলায় বলল, ধন্যবাদ, শায়লা। অসংখ্য ধন্যবাদ।

ক্লিষ্ট হাসল শায়লা। কিছু বলল না।

ডাক্তারের রূমে ঢুকল মাহবুব। হাত ইশারায় ওকে বসতে বললেন মোখলেসুর রহমান। একটা সিগারেট ধরালেন। গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ চুপচাপ টানলেন ওটা। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। সোজা তাকালেন মাহবুবের চোখে।

বাচ্চাটাকে তোমার স্ত্রী মেনে নিতে পারছে না, মাহবুব।

কি!

ওর জন্য খুব কঠিন সময় গেছে। তোমাকে তখন বলিনি তোমার টেনশন বাড়বে বলে। ডেলিভারী রুমে শায়লা হিস্টিরিয়া রোগীর মত চিৎকার করে অদ্ভুত সব কথা বলছিল- আমি ওগুলো রিপিট করতে চাইছি না। তবে বুঝতে পারছি বাচ্চাটাকে সে নিজের বলে ভাবতে পারছে না। তবে এর কারণটা আমি তোমাকে দুএকটা প্রশ্ন করে জানতে চাই। সিগারেটে বড় একটা টান দিলেন ডাক্তার, একমুখ ধোয়া ছেড়ে বললেন, বাচ্চাটা কি ওয়ান্টেড চাইল্ড মাহবুব?

একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

জানাটা খুব জরুরি।

অবশ্যই সে ওয়ান্টেড চাইল্ড, আমরা একসঙ্গে এ নিয়ে প্ল্যান করেছি। শায়লা তখন কত খুশি–।

হুমম-সমস্যা তো হয়েছে ওখানেই। যদি বাচ্চাটা আনপ্ল্যানড হত তাহলে ব্যাপারটাকে সাধারণ একটা কেস বলে ধরে নিতাম। অপ্রত্যাশিত শিশুকে বেশিরভাগ মা-ই ঘৃণা করে। কিন্তু শায়লার ক্ষেত্রে এটা ঠিক মিলছে না।

মোখলেসুর রহমান সিগারেটটা ঠোঁট থেকে আঙুলের ফাঁকে ধরলেন, অন্য হাত দিয়ে চোয়াল ঘষতে ঘষতে বললেন, তাহলে ব্যাপারটা অন্যকিছু হবে। হয়তো শৈশবের কোন ভীতিকর স্মৃতি ওর তখন মনে পড়েছে। কিংবা আর সব মায়ের মতই সন্তান জন্ম দেবার সময় মৃত্যুভয় ওকে কাবু করে ফেলেছিল। যদি এরকম কিছু হয় তাহলে দিন কয়েকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে, মাহবুব একটা কথা-শায়লা যদি তোমাকে বাচ্চাটার ব্যাপারে কিছু বলে... মানে... ইয়ে, সে চেয়েছিল বাচ্চাটা মৃত জন্ম নিক, তাহলে কিন্তু শ হয়ো না। আশা করছি সব ঠিক থাকবে। আর যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে ওদেরকে নিয়ে এই ব্যাচেলর বুড়ো ডাক্তার চাচার চেম্বারে চলে এসো কেমন? তোমাদেরকে এমনিতেও দেখতে পেলে খুবই খুশি হব।

ঠিক আছে, চাচা। শায়লা একটু সুস্থ হলেই সপরিবারে আপনার বাসায় আবার যাব।

.

চমৎকার একটি দিন। মৃদু গুঞ্জন তুলে টয়োটা স্কারলেট ছুটে চলেছে লালমাটিয়ার দিকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মাহবুব। আহা, কি সুন্দর নীল আকাশটার রঙ! কাঁচ নামিয়ে দিল ও। রাস্তার পাশের একটা ফুলের দোকান থেকে রজনীগন্ধার সুবাস ঝাঁপটা মারল নাকে। প্রাণভরে গন্ধটা টানল মাহবুব। বেনসনের আনকোরা প্যাকেটটার সেলোফেন ছিঁড়ে একটা সিগারেট জল ঠোঁটে। টুকটাক কথা বলছে। শায়লার সঙ্গে। শায়লা হালকাভাবে জবাব দিচ্ছে। বাচ্চাটা ওর কোলে। মাহবুব খেয়াল করল আলগোছে

ধরে আছে সে ছোট্ট মানুষটাকে। মাতৃসুলভ কোন উষ্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে না শায়লার আচরণে। যেন কোলে শুয়ে আছে চীনে মাটির একটা পুতুল। ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করল মাহবুব।

আচ্ছা! শিস দিয়ে উঠল ও।খোকন সোনার কি নাম রাখব আমরা?

শায়লা বাইরের সবুজ গাছগাছালি দেখতে দেখতে উদাসীন গলায় বলল, এখনও ঠিক করিনি। তবে একদম ভিন্নরকম কোন নাম রাখতে চাই আমি। এখনই এ নিয়ে গবেষণায় বসতে হবে না। আর দয়া করে বাচ্চার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ো না তো। বলল বটে, কিন্তু এ যেন নিছক বলার জন্যই বলা।

শায়লার গা ছাড়া ভাব আহত করল মাহবুবকে। সিগারেটটা ফেলে দিল জানালা দিয়ে। দুঃখিত, বলল ও।

বাচ্চাটা চুপচাপ শুয়ে আছে তার মায়ের কোলে। দ্রুত অপসৃয়মান গাছের ছায়ারা খেলা করছে তার মুখে। কালো চোখ দুটো খোলা। ছোট্ট, গোলাপি, রবারের মত মুখ হাঁ করে ভেজা শ্বাস ফেলছে।

শায়লা একপলক তাকাল তার বাচ্চার দিকে। শিউরে উঠল।

ঠাণ্ডা লাগছে? জানতে চাইল মাহবুব।

অল্প। কাঁচটা উঠিয়ে দাও, মাহবুব, ঠাণ্ডা গলায় বলল শায়লা।

মাহবুব ধীরে জানালার কাঁচ ওঠাল।

.

দুপুর বেলা।

মাহবুব খোকন সোনাকে নার্সারী রূম থেকে নিয়ে এসেছে, উঁচু একটা চেয়ারের চারপাশে অনেকগুলো বালিশ রেখে তার মধ্যে শোয়াল ওকে।

শায়লা প্লেটে ভাত বাড়তে বাড়তে বলল, ওকে অত উঁচু চেয়ারে শুইয়ো না। পড়েটড়ে যাবে।

আরে না, পড়বে না। দেখো টুটুবাবু এখানেও দিব্যি আরামে ঘুমাবে। হাসছে মাহবুব। খুব ভালো লাগছে ওর। দেখো, দেখো, বাবু সোনার মুখ দিয়ে লালা পড়ে কেমন চিবুক ভিজিয়ে দিয়েছে! তোয়ালে দিয়ে বাচ্চার মুখ মুছে দিল মাহবুব। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল এদিকে তাকিয়ে নেই শায়লা।

বুঝলাম সন্তান জন্ম নেবার সময়টা খুব সুখকর কিছু নয়, চেয়ারে বসতে বসতে বলল মাহবুব। কিন্তু সব মায়েরই তার বাচ্চার প্রতি কিছু না কিছু মায়া থাকে।

ঝট করে মুখ তুলল শায়লা। ওভাবে বলছ কেন? ওর সামনে এসব কথা কক্ষনো বলবে না। পরে বোলো। যদি তোমার বলার এত ইচ্ছে থাকে।

কিসের পরে! সংযম হারাল মাহবুব। ওর সামনে বললেই বা কি আর পেছনে বললেই বা কি? হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল ও। ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেছে। শায়লার মানসিক অবস্থা এখন ভালো নয়। ওর সঙ্গে রাগারাগি করা চলবে না। ঢোক গিলল মাহবুব। নিচু গলায় বলল, দুঃখিত, শায়লা।

কোন কথা বলল না শায়লা। প্রায় নিঃশব্দে শেষ হলো ওদের মধ্যাহ্ন ভোজন।

রাতে, ডিনারের পর, মাহবুব বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেল ওপরে। শায়লা ওকে কিছু বলেনি। কিন্তু ওর নীরব অভিব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিল কাজটা মাহবুবকেই করতে হবে।

নার্সারীতে খোকন সোনাকে রেখে নিচে নেমে এল মাহবুব। ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্র সঙ্গীত চাপিয়েছে শায়লা, সম্ভবত-শুনছে না। ওর চোখ বন্ধ, আড়ষ্টভাবে শুয়ে আছে

বিছানায়। শব্দহীন পায়ে এগিয়ে এল মাহবুব। দাঁড়াল শায়লার পাশে। একটা হাত রাখল চূর্ণ কুন্তলে। চমকে চোখ মেলে চাইল শায়লা। স্বামীকে দেখে স্বস্তি ফুটে উঠল দুচোখের তারায়। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, জড়িয়ে ধরল সে মাহবুবকে। মাহবুব টের পেল ওর আড়ষ্ট শরীর ধীরে ধীরে নমনীয় হয়ে যাচ্ছে, যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল কোন কারণে, এখন পরম আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে স্বামীর বুকে। মাহবুব ওর ঠোঁট খুঁজল। অনেকক্ষণ এক হয়ে থাকল দুজোড়া অধর।

তুমি, তুমি খুব ভালো, মাহবুব! হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শায়লা। কত নিশ্চিন্তে তোমার ওপর ভরসা করতে পারি আমি! এত নির্ভরযোগ্য তুমি!

হাসল মাহবুব। বাবা বলতেন- পুত্র মনে রেখো, তোমার সংসারে তুমিই একমাত্র অবলম্বন।

কালো, উজ্জ্বল কেশরাজি ঘাড় থেকে সরাল শায়লা। তোমার বাবার যোগ্য পুত্রই হয়েছ বটে। তোমাকে পেয়ে এত সুখী আমি। জানো, প্রায়ই আমি ভাবি এখনও যেন আমরা নবদম্পতিই রয়ে গেছি। আমাদের নিজেদের ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে হচ্ছে না, কারও দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না, আমাদের কোন সন্তান নেই।

মাহবুবের হাত দুটো নিজের গালে ছোঁয়াল শায়লা। হঠাৎ অস্বাভাবিক সাদা হয়ে উঠেছে তার মুখ।

ওহ, মাহবুব, একটা সময় ছিল যখন ছিলাম শুধু তুমি আর আমি। আমরা পরস্পরকে নিরাপত্তা দিতাম। আর এখন এই বাচ্চাটাকে আমাদের নিরাপত্তা দিতে হবে, কিন্তু বদলে তার কাছ থেকে কোন নিরাপত্তা পাব না। আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছ। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আমি কত কিছু চিন্তা করেছি। দুনিয়াটা হচ্ছে একটা মন্দ জায়গা

তাই কি?

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আইন সকল মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করে। যখন আইন বলে কিছু থাকে না তখন ভালোবাসা নিরাপত্তার সন্ধান দেয়। আমি তোমাকে আঘাত করছি, কিন্তু আমার ভালোবাসা তোমাকে রক্ষা করছে। যদি ভালোবাসা না থাকত তাহলে পৃথিবীর সব মানুষই অসহায় হয়ে পড়ত। আমি তোমাকে ভয় পাই না। কারণ আমি জানি তুমি আমার ওপর যত রাগ করো, বকা দাও, খারাপ ব্যবহার করো, সবকিছুর ওপর ছাপিয়ে ওঠে আমার প্রতি তোমার গভীর প্রেম, নিবিড় ভালোবাসা। কিন্তু বাচ্চাটা? ও এত ছোট যে ভালোবাসা কিংবা অন্য কোন কিছুই সে বুঝবে না যতক্ষণ না আমরা তাকে ব্যাপারটা বোঝাই। যেমন ধরো, ও কি এখন বুঝবে কোনটা ডান আর কোনটা বাম?

এখন বুঝবে না। তবে সময় হলে শিখে নেবে।

কিন্তু...। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল শায়লা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মাহবুবের বাহুবন্ধন থেকে।

কিসের যেন শব্দ শুনলাম!

মাহবুব চারদিকে চাইল। কই, আমি তো কিছু শুনিনি...।

লাইব্রেরি ঘরের দরজার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে শায়লা। ওই ওখানে, ফিসফিস করে বলল সে।

ঘর থেকে বেরুল মাহবুব, খুলল লাইব্রেরি ঘরের দরজা। আলো জ্বেলে এদিক ওদিক চাইল। কিছু চোখে পড়ল না। আলো নিভিয়ে আবার ফিরে এল শায়লার কাছে। নাহ্, কিচ্ছু নেই, বলল ও। তুমি আসলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। নাও, এখন শুতে চলো দেখি।

নিচতলার সব আলো নিভিয়ে ওরা উঠে চললো ওপরে। সিঁড়ির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে শায়লা বলল, অনেক আজেবাজে কথা বলেছি, মাহবুব। কিছু মনে কোরো না। আসলেই আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই।

শায়লার কাঁধে হাত রাখল মাহবুব। মৃদু চাপ দিল। কিছু মনে করেনি সে।

নার্সারী রুমের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল শায়লা, ইতস্তত করছে। তারপর হাত বাড়াল পেতলের নবের দিকে, দরজা খুলে পা রাখল ভেতরে। খুব সাবধানে এগিয়ে চলল বাচ্চার দোলনার দিকে। ঝুঁকল শায়লা, সঙ্গে সঙ্গে কাঠ হয়ে গেল শরীর। মাহবুব! চিৎকার করল ও।

দৌড় দোলনার কাছে চলে এল মাহবুব।

.

বাচ্চাটার মুখ টকটকে লাল, সম্পূর্ণ ভেজা; ছোট্ট হাঁ-টা বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে; চোখদুটো যেন জ্বলছে রাগে। হাতজোড়া সে উঠিয়ে রেখেছে শূন্যে, যেন বাতাস খামচে ধরার চেষ্টা করছে।

আহারে, দরদ ঝরে পড়ল মাহবুবের গলায়, বাবু সোনাটা না জানি কতক্ষণ ধরে কেঁদেছে!

কেঁদেছে? শায়লা দোলনার একটা পাশ আঁকড়ে ধরল ভারসাম্য রক্ষার জন্য। কই, কান্নার আওয়াজ তো শুনলাম না।

দরজা বন্ধ, শুনবে কি করে?

এ জন্যই বোধহয় ওর মুখ এত লাল আর এত জোরে শ্বাস টানছে?

অবশ্যই। আহারে, আমার সোনা রে। অন্ধকারে একা কেঁদে কেঁদে না জানি কত কষ্ট পেয়েছে। আজ রাতে ওকে আমাদের ঘরে নিয়ে যাই, কি বলো? এখানে একা থাকলে আবার যদি কাঁদে।

আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই ওকে নষ্ট করবে, বলল শায়লা।

কোন কথা না বলে বাচ্চাটাকে দোলনা সহ নিজেদের শোবার ঘরে নিয়ে চলল মাহবুব। টের পেল শায়লার চোখ তাদেরকে অনুসরণ করছে।

.

নিঃশব্দে কাপড় ছাড়ল মাহবুব। বসল খাটের এক কোনায়। হঠাৎ কি মনে পড়তে হাতের তালুতে ঘুসি মারল ও।

ধুত্তুরি ছাই! তোমাকে তো বলতে ভুলেই গেছি। আমাকে সামনের শুক্রবার আবার হংকং যেতে হবে।

আবার হংকং কেন?

যাওয়ার কথা ছিল তো আরও দুমাস আগে। তোমার কথা ভেবে যাওয়াটাকে পিছিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওদিকের অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে না গেলেই নয়।

কিন্তু তুমি গেলে যে আমি একদম একা হয়ে পড়বে।

তোমার জন্য নতুন কাজের একটা বুয়া ঠিক করেছে আউয়াল। মহিলা শুক্রবার আসবে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া আমি তো মাত্র অল্প কটা দিন থাকব।

তবুও আমার ভয় করছে। কেন জানি না এত বড় বাড়িতে একা থাকার কথা ভাবলেই বুকটা গুড়গুড় করে ওঠে। আমি যদি তোমাকে সব কথা খুলে বলি তুমি নির্ঘাত আমাকে পাগল ঠাওরাবে। আমার মনে হচ্ছে আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব।

বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল মাহবুব। ঘরের বাতি নেভানো। অন্ধকারে বিছানার ধারে হেঁটে এল শায়লা, লেপটা তুলল, ঢুকল ভেতরে। ক্রিমের মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এল, রমণীর উষ্ণ শরীর উত্তেজিত করে তুলল মাহবুবকে, সে শায়লাকে জড়িয়ে ধরল। তুমি যদি আমাকে আরও কয়েকটি দিন পরে যেতে বলল তাহলে আমি–

না, শরীর থেকে মাহবুবের হাতটাকে আস্তে সরাল শায়লা। তুমি যাও। আমি জানি ব্যাপারটা জরুরী। আমি আসলে তোমাকে যে কথাগুলো তখন বললাম সেগুলো সম্পর্কে এখন ভাবছি। আইন, ভালোবাসা এবং নিরাপত্তা। আমার ভালোবাসা তোমাকে নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু বাচ্চাটা- শ্বাস টানল ও। তোমাকে সে কী নিরাপত্তা দেবে, মাহবুব?

কি বলা যায় ভাবছিল মাহবুব। বলবে কিনা যে সে যতসব আজগুবি ব্যাপার নিয়ে অহেতুক চিন্তা করে মরছে? এমন সময় খুট করে বেড সুইচ টিপল শায়লা। সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হলো বেডরূম।

দ্যাখো, আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল শায়লা।

বাচ্চাটা শুয়ে আছে দোলনায়। কালো চকচকে চোখ মেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

আবার বাতি নেভালো শায়লা। সরে এল মাহবুবের দিকে। থরথর করে কাঁপছে ওর শরীর।

যাকে আমি জন্ম দিয়েছি তাকে এত ভয় পাব কেন, সায়লার ফিসফিসে কণ্ঠ কর্কশ এবং দ্রুত হয়ে উঠল। কারণ ও আমাকে খুন করতে চেয়েছে। ও ওখানে। শুয়ে আছে, আমাদের সব কথা শুনছে, সব বুঝতে পারছে। অপেক্ষা করছে কবে। তুমি বাইরে যাবে

আর সে আবার আমাকে খুন করার চেষ্টা চালাবে। খোদার কসম বলছি! কান্নায় গলা বুজে এল শায়লার।

প্লীজ! ওকে থামাতে চেষ্টা করল মাহবুব। কেঁদো না প্লীজ!

অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল শায়লা অন্ধকারে। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে থাকল। আস্তে-আস্তে কাঁপুনিটা কমে এল, নিঃশ্বাস হয়ে উঠল স্বাভাবিক এবং নিয়মিত। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

চোখ লেগে এল মাহবুবেরও।

ঘুমের গভীরতর স্তরে যেতে যেতে একটা শব্দ শুনল সে।

ছোট্ট, ভেজা, রবারের ঠোঁট থেকে চটচটে শব্দ। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল মাহবুব।

.

সকালবেলা ঝরঝরে মন নিয়ে ঘুম থেকে জাগল ওরা। শায়লা মধুর হাসল স্বামীর দিকে চেয়ে। হাতঘড়িটা দোলনার ওপর দোলাল মাহবুব, সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল কাঁচ।

দেখো, বাবু, দেখো, কি চকচকে, কি সুন্দর! কি চকচকে, কি সুন্দর! সুর করে বলছে সে।

আবারও হাসল শায়লা স্বামীর ছেলেমানুষী দেখে। মনে এখন ওর আর কোন শঙ্কা নেই। মাহবুব নিশ্চিন্তে তার ব্যবসার কাজে হংকং যেতে পারে। ভয় পাবে না শায়লা। বাবুর যত্ন ঠিক নিতে পারবে সে।

শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ বিমানের ডিসি-১০-এ উড়াল দিল মাহবুব। নীল আকাশ, পেঁজা তুলো মেঘ আর সূর্যের ঝকঝকে সোনালি রশ্মি ছুঁয়ে গেল ওকে। ফ্রেশ মুড নিয়ে হংকং-এর এয়ারপোর্টে পা রাখল ও। শেরাটন হোটেলে আগেই রূম বুক করা ছিল। ওখানে উঠে প্রথমেই লং ডিসট্যান্স কলে শায়লাকে ফোন করে জানাল, সে ঠিকঠাক মত পৌঁছেছে। এক্সপেক্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা ওর। পরবর্তী ছটা দিন ঝড় বয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে একটা বিজনেস ডিল করতে গিয়ে। এর মধ্যে একদিন ঢাকায় ফোন করল ও। কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া পেল না। ফোন ডেড। তবে চিন্তিত হলো না মাহবুব। মাঝে মাঝে এভাবে ফোন ডেড হয়ে। পড়ে ওদের বাসায়। এক্সচেঞ্জে কমপ্লেন জানালে আবার ঠিক হয়ে যায়। এবারও ওরকম কিছু একটা হয়েছে ভেবে ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবল না সে। কাজের মধ্যে এমন বুঁদ হয়ে গেল যে বাড়ির কথা প্রায় মনেই পড়ল না। সপ্তম দিনে, ব্যাংকোয়েট হলে একটা কনফারেন্স সেরে রূমে ফিরেছে মাহবুব, জামা কাপড় ছাড়ছে বিশ্রাম নেয়ার জন্য, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন। অপারেটর জানালা

ঢাকা থেকে ট্রাঙ্ককল। খুশি হয়ে উঠল মাহবুব। নিশ্চয় শায়লা। যাক, তাহলে এবার ওদের বাসার ফোনটা তাড়াতাড়িই ঠিক হয়েছে।

শায়লা? আগ্রহ ভরে ডাকল মাহবুব।

না, মাহবুব। ডা. মোখলেসুর রহমান বলছি।

ডাক্তার চাচা!

একটা খবর দেব। কিন্তু ভেঙে পড়া চলবে না। শোনো, শায়লা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার ক্লিনিকে আছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো, ওর নিউমোনিয়া হয়েছে, তবে ভেব না, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব শায়লার জন্যে করব আমি। তবে ওর পাশে এখন তোমাকে খুব দরকার।

হাত থেকে ফোন খসে পড়ল। কোন মতে উঠে দাঁড়াল, পায়ের তলাটা ফাঁকা ঠেকল। মনে হলো অসীম এক ঘূর্ণির মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে ও। ঘরটা অস্পষ্ট হয়ে উঠল, দুলছে।

শায়লা, আর্তনাদ করে উঠল মাহবুব। অন্ধের মত এগোল সে দরজার দিকে।

.

তোমার স্ত্রী মা হিসেবে খুব চমৎকার, মাহবুব। নিজের কথা সে একটুও ভাবেনি। বাচ্চাটার জন্যে চিন্তায় চিন্তায়...।

ডা. মোখলেসুর রহমানের একটা কথাও শুনছে না মাহবুব। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে শায়লার পাণ্ডুর মুখের দিকে। শায়লার মুখের পেশী বার কয়েক কাপল, চোখ মেলে চাইল ও। অস্ফুট একটা হাসি ফুটল ঠোঁটে, তারপর কথা বলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে কথা বলছে শায়লা। মা হিসেবে বাচ্চার প্রতি একজন তরুণীর কি দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাই বর্ণনা দিচ্ছে সে। ধীরে ধীরে গলা চড়ল ওর, ভয় ফুটল কণ্ঠে, তীব্র বিতৃষ্ণা বিষোদগার হলো। ডাক্তারের মুখাবয়বে কোন পরিবর্তন হলো না, কিন্তু মাহবুব বারবার কেঁপে উঠল। থামাতে চাইল ও শায়লাকে, কিন্তু পারল না।

বাচ্চাটা ঘুমাতে চাইত না। আমি ভেবেছিলাম ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও দোলনায় শুয়ে থাকত আর শুধু চেয়ে থাকত। আর গভীররাতে উঠে কাঁদতে শুরু করত। প্রচণ্ড জোরে কাঁদত ও, সারারাত। একের পর এক রাত। আমি কত চেষ্টা করেছি থামাতে পারিনি। আর আমিও ওর কান্নার চোটে একটা রাতও ঘুমাইনি।

মাথা নাড়লেন ডা. মোখলেসুর রহমান। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু এখন ও দ্রুত আরোগ্যের পথে। কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে আশা করি।

অসুস্থবোধ করছে মাহবুব। বাচ্চা? আমার বাচ্চাটার কি অবস্থা?

ও ঠিকই আছে।

ধন্যবাদ, ডাক্তার চাচা। আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব...।

ওকে, ওকে সান। এমনিতেই খাটো মানুষ আমি। কৃতজ্ঞ করে আরও খাটো কোরো না। বরং ধন্যবাদ প্রাপ্য তোমাদের ওই কাজের বুয়ার, জামালের মা না কি যেন নাম, তার। শায়লা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বাথরুমে। এমনিতেই ক্লান্ত শরীর, তারপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ভাগ্যিস নিউমোনিয়াটা ওকে খুব বেশি কাবু করার আগেই আমি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তোমাদের ওই কাজের বুয়াটা যদি বাথরুমের দরজা ভেঙে শায়লাকে বের করতে আরও ঘণ্টাখানেক দেরি করত তাহলে ওকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে উঠত। এনি ওয়ে, শায়লাকে তুমি শিগগিরই বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে। কাজেই চিন্তার কিছু নেই।

ডাক্তার দরজাটা ভেজিয়ে চলে গেলেন। শায়লা দুর্বল গলায় ডাকল, মাহবুব!

ঘুরল মাহবুব। জড়িয়ে ধরল শায়লাকে। শায়লা ওর হাত দুটো শক্ত করে ধরে থাকল। ভীত গলায় বলতে শুরু করল, আমি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলাম। তোমাকে বুঝতে

দেইনি যে হাসপাতাল থেকে ফেরার পরেও আমি শরীরে পুরো। শক্তি ফিরে পাইনি। কিন্তু বাচ্চাটা আমার দুর্বলতা টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই প্রতি রাতে ওটা কাঁদত। কিন্তু যখন কাঁদত না তখন অস্বাভাবিক রকম নীরব থাকত। আমি রাতে ঘরের বাতি জ্বালাতে সাহস পেতাম না। জানতাম আলো জ্বাললেই দেখব ও আমার দিকে একঠায় তাকিয়ে আছে।

মাহবুব জড়িয়ে ধরে আছে শায়লাকে। শায়লার প্রতিটি কথা ও উপলব্ধি করতে পারছে অন্তরে অন্তরে। বাচ্চাটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও, টের পাচ্ছে ওর উপস্থিতি। এই বাচ্চা প্রতিদিন গভীররাতে ঘুম থেকে জাগে যখন আর সবার বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে ঘুমায়। এই বাচ্চা জেগে থাকে, যখন কাঁদে না তখন। চিন্তা করে। আর তার দোলনা থেকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকে। এসব কি হচ্ছে? নিজেকে ভর্ৎসনা করল মাহবুব। এত চমৎকার তুলতুলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসব কি ভাবছে সে। শায়লার দিকে মনোযোগ ফেরাল সে।

শায়লা বলে চলেছে, আমি বাচ্চাটাকে খুন করতে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তাই। তুমি যেদিন হংকং গেলে তার পরদিনই আমি ওর ঘরে ঢুকে ঘাড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু হাত ঢুকিয়েই থাকলাম। অনেকক্ষণ নড়তেই পারলাম না। ভীষণ ভয় লাগছিল আমার। তারপর বিছানার চাদর দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে, উল্টো অবস্থায় রেখে দৌড়ে পালালাম ঘর থেকে।

মাহবুব ওকে থামাতে চাইল।

না, আমাকে আগে শেষ করতে দাও। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ফোঁসফেঁসে গলায় বলল শায়লা। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলাম ঠিক কাজটাই করেছি আমি। বাচ্চারা দোলনায় কাপড় পেঁচিয়ে এভাবে শ্বাসরোধ হয়ে কতই তো মারা যায়। কেউ জানবেই না যে আমিই কাজটা করেছি। কিন্তু ওকে মৃত অবস্থায় দেখব বলে যেই ঘরে ঢুকেছি...মাহবুব, বিশ্বাস করো, দেখি কি ও মরেনি! হ্যাঁ, মরেনি। বেঁচে আছে। তোষকে পিঠ দিয়ে হাসছে ও আর বড় বড় শ্বাস ফেলছে। তারপর ওকে আর আমার ধরার সাহসই হলো না। আমি সেই যে ও ঘর থেকে চলে এলাম আর সেদিকে গেলাম না। আমি ওকে খাওয়াতেও যাইনি কিংবা একবার দেখতেও যাইনি। হয়তো বুয়া ওকে খাইয়েছে। ঠিক জানি না আমি, শুধু এটুকু জানি সারারাত সে চিৎকার করে কেঁদে আমাকে জাগিয়ে রাখত। আর মনে হত সমস্ত বাড়িতে ওটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় আমি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। হাঁফিয়ে উঠেছে শায়লা। দম নিতে একটু থামল। তারপর আবার শুরু করল, বাচ্চাটা ওখানে সারাদিন শুয়ে থাকে আর খালি আমাকে খুন করার পরিকল্পনা আঁটে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কারণ ও বুঝতে পেরেছে ওর সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। ওর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই; আমাদের মধ্যে কোন নিরাপত্তার বন্ধন নেই; কোনদিন হবে না।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ল শায়লা। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাহবুব অনেকক্ষণ বসে থাকল ওর শিয়রে, নড়তে ভুলে গেছে যেন। ওর রক্ত জমাট বেঁধে গেছে শরীরে। কোথাও একটা নার্ভও কাজ করছে না।

.

দিন তিনেক পর শায়লাকে বাড়িতে নিয়ে এল মাহবুব। তারপর সিদ্ধান্ত নিল পুরো ব্যাপারটা সে জানবে ডাক্তার চাচাকে। মোখলেসুর রহমান অখণ্ড মনোযোগে মাহবুবের সব কথা শুনলেন।

তারপর বললেন, দেখো, মাহবুব, তুমি ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করো। কখনও কখনও মায়েরা তাদের সন্তানদের ঘৃণা করেন, এটা এক ধরনের দ্বৈতসত্তা। ভালোবাসার মধ্যেই ঘৃণা, প্রেমিক প্রেমিকারা তো হরহামেশা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করছে। কয়েকদিন মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। বাচ্চারাও তাদের মায়েদের ঘৃণা করে...।

বাধা দিল মাহবুব, আমার মাকে আমি কখনও ঘৃণা করিনি।

করেছ। কিন্তু স্বীকার করবে না। এটাই স্বাভাবিক। মানুষ তার প্রিয়জনদের ঘৃণা করার কথা কখনও স্বীকার করতে চায় না।

কিন্তু শায়লা তার বাচ্চাকে ঘৃণা করার কথা স্পষ্ট করে বলছে!

বরং বলল সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। ঘৃণা এবং ভালোবাসার যে স্বাভাবিক দ্বৈতসত্তা রয়েছে, সে ওটা থেকে একটু এগিয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক ডেলিভারীর মাধ্যমে ওর বাচ্চার জন্ম। নরকযন্ত্রণা সহ্য করেছে সে সন্তান জন্ম দেয়ার সময়। এই প্রায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং নিউমোনিয়ার জন্যে শায়লা বাচ্চাটাকেই একমাত্র দায়ী মনে করছে। নিজের সমস্যা সে নিজেই সৃষ্টি করছে, কিন্তু দায়ভারটা তুলে দিচ্ছে হাতের কাছে যাকে সবচেয়ে সহজ টার্গেট হিসেবে পাচ্ছে, তার ওপর। আমরা সবাই এটা করি। চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেলে দোষ দেই ফার্নিচারটার। অথচ নিজেরা যে সাবধান নই সেদিকে খেয়াল রাখি না। ব্যবসায় ফেল করলে অভিসম্পাত করি খোদা, আবহাওয়া কিংবা আমাদের ভাগ্যকে। তোমাকে নতুন করে কিছু বলার নেই। আগেও যা বলেছি আজও তাই বলছি। লাভ হার। ওকে আরও বেশি বেশি ভালোবাসো। পৃথিবীর সেরা ওষুধ হলো এই ভালোবাসা। ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে ওর প্রতি তোমার স্নেহটাকে ফুটিয়ে তোলো, ওর মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তোলো। ওকে বোঝাও বাচ্চারা কত নিষ্পাপ আর মোটেও অনিষ্টকারী নয়। বাচ্চাটার মূল্য কারও চেয়ে কম নয় এই অনুভূতি ওর মধ্যে জাগিয়ে তোলে। দেখবে কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেছে। মৃত্যুভয় ভুলে যাবে শায়লা, ভালোবাসতে শুরু করবে তার বাচ্চাকে। যদি আগামী মাসের মধ্যে ওর কোন পরিবর্তন না দেখো, তাহলে আমাকে জানিও। আমি ওকে কোন ভালো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাব। এখন তুমি যেতে পারো। তবে দয়া করে চেহারা থেকে অসহায় ভাবটা মুছে ফেলো।

.

শীত ফুরিয়ে বসন্ত এল। বসন্তকে বিদায় জানাল গ্রীষ্ম। মাহবুবদের লালমাটিয়ার বাড়িতে সবকিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল মাহবুব তার কাজে ব্যস্ত থাকছে ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ সময় সে ব্যয় করছে স্ত্রীর জন্যে। শায়লা এখন অনেকটাই সুস্থ। বিকেলে দুজনে মিলে হাঁটতে যাচ্ছে ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে, কখনও সামনের লনে ব্যাডমিন্টনের নেট ঝুলিয়ে পয়েন্ট গুণে খেলছে, মাহবুবকে হারাতে পারলে হাততালি দিয়ে উঠছে বাচ্চাদের মত। আস্তে আস্তে শক্তি ফিরে পাচ্ছে শায়লা। মনে হচ্ছে ভয়টার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে ও।

তারপর একদিন রাতে প্রবল কালবৈশাখী ঝড় হলো ঢাকা শহরে। আকাশের বুক চিরে সাপের জিভের মত ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল কাছে কোথাও, হাওয়ার ক্রুদ্ধ গর্জন যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগল বাড়িটাকে। সেই সঙ্গে কেঁপে উঠল শায়লা। ঘুম ভেঙে জড়িয়ে ধরল সে স্বামীকে, ওকেও ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য করল। শায়লাকে আদর করতে করতে মাহবুব জানতে চাইল, কি হয়েছে।

ভয়ার্ত গলায় শায়লা বলল, কে যেন আমাদের ঘরে ঢুকেছে। লক্ষ করছে আমাদেরকে।

আলো জ্বালাল মাহবুব। আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ, সস্নেহে বলল সে। এতদিন তো ভালোই ছিলে। আবার কি হলো? আলো নেভালো সে।

অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শায়লা। তারপর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। ওকে বুকে চেপে ধরে থাকল মাহবুব, ভাবল তার এই মিষ্টি বউটা কি সামান্য কারণেই না ভয় পায়।

হঠাৎ ঘুম চটে যাওয়ায় আর ঘুম আসছিল না মাহবুবের। অনেকক্ষণ আগড়ম বাগডুম ভাবল সে। শব্দটা হঠাৎ কানে এল। খুলে যাচ্ছে বেডরূমের দরজা। ইঞ্চিকয়েক খুলে গেল পাল্লা দুটো।

কেউ নেই ওখানে। বাতাস থেমেছে বহুক্ষণ।

চুপচাপ শুয়ে থাকল মাহবুব। মনে হলো একঘণ্টারও বেশি সময় সে অন্ধকারে শুয়ে আছে।

তারপর, অকস্মাৎ গোঙানির মত কান্নার আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। কাঁদছে বাচ্চাটা।

গোঙানির শব্দটা অন্ধকারের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে এল, ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, যেন প্রতিধ্বনি তুলল দেয়ালে। এই সময় আবার শুরু হলো ঝড়।

মাহবুব খুব আস্তে আস্তে একশো পর্যন্ত গুণল। থামছে না বাচ্চা, একভাবে কেঁদেই চলেছে।

সাবধানে শায়লার বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল মাহবুব, নামল বিছানা থেকে। স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে এগোল দরজার দিকে।

ও এখন নিচে, রান্নাঘরে যাবে, ঠিক করল মাহবুব। খানিকটা দুধ গরম করে চলে আসবে ওপরে, অরপর...।

মিশমিশে অন্ধকারটা যেন মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সামনে থেকে, পা পিছলে গেছে মাহবুবের। নরম কি একটা জিনিসের ওপর পাটা পড়েছিল ওর, টের পেল অসীম শূন্যের এক কালো গহ্বরের মধ্যে ছিটকে যাচ্ছে সে।

উন্মাদের মত হাত বাড়াল মাহবুব, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো কব্জি জোড়া, ধরে ফেলেছে রেলিং। নিজেকে গাল দিল একটা।

কিসের ওপর পা দিয়ে পিছলে পড়েছিল মাহবুব? জিনিসটা কি বোঝার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল অন্ধকারে। মাথায় দ্রিম দ্রিম ঢাক বাজছে। হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে এসে ঠেকেছে, প্রচণ্ড ব্যথা করছে হাত।

নরম জিনিসটা খুঁজে পেল মাহবুব। ওটার গায়ে আঙুল বুলিয়েই বুঝতে পারল, একটা পুতুল। বিদঘুঁটে চেহারার বড়সড় এই পুতুলটা সে কিনেছিল তার বাবু সোনার জন্যে।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না মাহবুব। কে যে এভাবে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখে! নাহ্, কাজের বুয়াটা ছুটিতে দেশের বাড়ি গিয়ে মুশকিলই হলো দেখছি। আরেকটু হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হতে যাচ্ছিল মাহবুবের। অত উঁচু থেকে সরাসরি সিমেন্টের মেঝেতে আছড়ে পড়লে বাঁচত নাকি সে? ভাগ্যিস রেলিংটা ধরে ফেলেছিল।

.

পরদিন, নাস্তার টেবিলে কথাটা বলল শায়লা। আমি দিন কয়েকের জন্য একটু বরিশাল যেতে চাই। আব্বা-আম্মাকে দেখি না অনেকদিন। তুমি যদি সময় করতে না পারো, আমাকে একাই যেতে দাও, প্লীজ। জামালের মা বুধবার আসবে তার দেশের বাড়ি থেকে। সে একাই বাবুর যত্ন নিতে পারবে। আমি ওকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছি না। আসলে বলতে পারো আমি কয়েকদিনের জন্যে ওর কাছ থেকে পালাতে চাইছি। ভেবেছিলাম এই ব্যাপারটা-মানে ভয়টা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু তা আর পারলাম না। ওর সঙ্গে একরূমে আর থাকতে পারছি না আমি। ও এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যেন প্রচণ্ড ঘৃণা করে আমাকে। এভাবে আরও কিছুদিন চললে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব।

আমার মন বলছে খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সেটা ঘটার আগেই কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে চাই।

থমথমে মুখে চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখল মাহবুব। তোমার আসলে এখন দরকার একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট। তিনি যদি তোমাকে বাইরে যেতে বলেন তাহলে যেয়ো। কিন্তু এভাবে আর চলে না। তোমার টেনশনেই আমি মরলাম!

মুখ কালো হয়ে গেল শায়লার। অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকল। তারপর ওর দিকে না চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমিই বোধহয় ঠিক বলেছ। আমাকে একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার। ঠিক আছে, তুমি কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই আমি যেতে রাজি, মাহবুব।

মাহবুব ওর ঠোঁটে চুমু খেলো। ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়ে, ডার্লিং। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে কথাটা বলিনি। তুমি তো জানোই, তুমি আমার কাছে কতখানি! তোমার সামান্য কষ্ট হলেও আমি দিশেহারা হয়ে যাই।

মুখ তুলল শায়ালা। হাসল। জানি, মাহবুব। আমি কিছু মনে করিনি। যাকগে, তুমি আজ ফিরবে কখন?

অন্যান্য দিনের মতই। কেন, হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? এমনিই। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরলে আমি একটু স্বস্তি পাই। চারদিকে এত অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আর যে জোরে গাড়ি চালাও তুমি, আমার খুব ভয় হয়।

ওতো আমি সবসময়ই চালাই। অ্যাক্সিডেন্টে মরব না, একশোভাগ গ্যারান্টি দিলাম। শায়লার ফর্সা গাল টিপে দিল সে। হাসতে হাসতে বলল, চলি, দৃঢ় পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাহবুব ফ্রেশ মুড নিয়ে।

.

অফিসে পৌঁছেই ডাক্তার মোখলেসুর রহমানকে ফোন করল মাহবুব। জানতে চাইল তাঁর জানাশোনা ভালো কোন সাইকিয়াট্রিস্ট আছে কিনা। ডা, সানোয়ারা বেগমের কথা বললেন রহমান সাহেব। অত্যন্ত দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য একজন মনোবিজ্ঞানী। জানালেন ভদ্রমহিলার সঙ্গে তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখলেন, মাহবুবকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল মাহবুব। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর যখন ফ্রী হলো মাহবুব, অনুভব করল বাসায় যাওয়ার জন্যে কতটা ব্যগ্র হয়ে আছে মন। লিফটে নামার সময় গতরাতের ঘটনাটা মনে পড়ল ওর। শায়লাকে আছাড় খাওয়ার কথা বলেনি সে। পুতুলটার কথা বললে সে যদি অন্যভাবে রিঅ্যাক্ট করে! থাক, দরকার নেই বলার। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।

সূর্য ডুবে গেছে টয়োটা বিল্ডিং-এর আড়ালে। টকটকে লাল আভা ছড়িয়ে আছে ওদিকের আকাশে। সিঁদুর রঙা মেঘগুলো আশ্চর্য সব মূর্তি এঁকে রেখেছে আকাশের বুকে। অপূর্ব! একটা সিগারেট ধরিয়ে ফুরফুরে মেজাজে গাড়ি চালাচ্ছে মাহবুব।

গাড়ি-বারান্দায় টয়োটা রাখল মাহবুব। শায়লাকে নিয়ে এখনই আবার বেরুবে সে। ঠিক করেছে লং ড্রাইভে গাজীপুরের দিকে যাবে। ফেরার পথে রাতের খাবারটা সেরে নেবে কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে।

হাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল মাহবুব। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। পেছন থেকে মিষ্টি স্বরে ডেকে উঠল একটি পাখি। কলিংবেলে চাপ দিল। পিয়ানোর টুং টাং শব্দ বাজতে শুরু করল দোতলায়। দেড় মিনিট পার হওয়ার পরেও শায়লা আসছে না দেখে ভ্রু কুঁচকে উঠল ওর। ঘুমিয়ে পড়েনি তো শায়লা। কিন্তু এ সময় তো ওর ঘুমাবার কথা নয়। দরজার নবে হাত রাখল মাহবুব। মোচড় দিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। কপালে আরও একটা ভাঁজ পড়ল ওর। সদর দরজা কখনও ভোলা রাখে না শায়লা। দিনকাল ভালো নয় জানে। তাহলে হলো কি আজ মেয়েটার।

ঘরে ঢুকেই উঁচু গলায় ডাকল মাহবুব, শায়লা! কোন উত্তর নেই। আবারও ডাকতে গেল, কিন্তু হাঁ হয়েই থাকল মুখ। দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে সে, ভয়ের তীব্র একটা ঠাণ্ডা স্রোত জমিয়ে দিল ওকে।

কিম্ভূত পুতুলটা পড়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। কিন্তু পুতুল নয়, মাহবুব তাকিয়ে আছে শায়লার দিকে। শায়লার হালকাঁপাতলা দেহটা দুমড়ে মুচড়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। যেন একটা ভাঙা পুতুল, আর কোনদিন খেলা করা যাবে না। কোনদিন না।

মারা গেছে শায়লা।

বাড়িটি আশ্চর্যরকম নিঃশব্দ, শুধু মাহবুবের বুকে হাতুড়ির আঘাত পড়ছে দমাদম।

মারা গেছে শায়লা।

মাথাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরল মাহবুব, স্পর্শ করল চম্পক অঙ্গুলি। ভীষণ ঠাণ্ডা। বুকের সঙ্গে চেপে ধরে থাকল মাহবুব শায়লাকে। কিন্তু ও তো আর বেঁচে উঠবে না, আর কখনও জলতরঙ্গ কণ্ঠে ডাকবে না তার নাম ধরে। বাঁচতে চেয়েছিল শায়লা। তার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ মাহবুব বাঁচাতে পারেনি তার প্রিয়তমাকে, পারেনি নিরাপত্তা দিতে।

উঠে দাঁড়াল ও। ডাক্তার চাচাকে ফোন করতে হবে। কিন্তু নাম্বারটা মনে আসছে না। ভূতগ্রস্তের মত উঠে এল মাহবুব দোতলায়। সম্মোহিত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল নার্সারী

রূমের দিকে। খুলল দরজা। পা রাখল ভেতরে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল দোলনার দিকে। পেটের মধ্যেটা গুলিয়ে উঠছে। কোনকিছু ঠাহর করতে পারছে না। ভালো মত।

বাচ্চাটা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, কিন্তু মুখখানা লাল, ঘামে চকচক করছে, যেন অনেকক্ষণ একভাবে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ও মারা গেছে, ফিসফিস করে বলল মাহবুব। মারা গেছে শায়লা।

তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করল। নিচু গলায় হাসতেই থাকল। সংবিৎ ফিরে পেল গালে সজোরে চড় খেয়ে। চমকে উঠল ডাক্তার মোখলেসুর রহমানকে দেখে। তিনি একের পর এক চড় মারছেন ওকে আর চেঁচাচ্ছেন, শান্ত হও, মাহবুব। প্লীজ, কাম ডাউন!

শায়লা মারা গেছে, ডাক্তার চাচা, মোখলেসুর রহমানকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলল মাহবুব। পড়ে গেছে ও দোতলা থেকে পা পিছলে। গত রাতে আমিও পুতুলটার গায়ে পা পিছলে প্রায় মারা যাচ্ছিলাম। আর এখন

মোখলেসুর রহমান ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না।

উন্মাদের মত মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল মাহবুব। জানেন, ডাক্তার চাচা, আমি ওর সুন্দর একটা নাম দেব ভেবেছিলাম। এখন কি নাম দেব জানেন? আজরাইল!

রাত এগারোটা। শায়লাকে আজিমপুর গোরস্থানে কবর দিয়ে এসেছে মাহবুব। শুকনো মুখে বসে আছে লাইব্রেরি ঘরে। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে বলল, ভেবেছিলাম শায়লাকে ভালো একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাব। ভেবেছিলাম ও মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু এখন বুঝছি বাচ্চাটাকে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা অমূলক ছিল না।

ডাক্তার সশব্দে শ্বাস ফেললেন। শায়লার মত তুমিও দেখি ছেলেমানুষী শুরু করলে। অসুস্থতার জন্য শায়লা বাচ্চাটাকে দোষ দিত আর এখন তুমি ওর মৃত্যুর জন্যে তাকে দায়ী করছ। খেলনাটার ওপর পা পিছলে দোতলা থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙেছে শায়লার। এজন্যে তুমি কোনভাবেই বাচ্চাটাকে অভিযুক্ত পারো না।

ওটা আজরাইল।

চুপ করো! ওই শব্দটা আর কখনও মুখে আনবে না।

মাথা নাড়ল মাহবুব। শায়লা রাতে অদ্ভুত সব শব্দ শুনত, কে যেন হাঁটছে ঘরে। আপনি জানেন, ডাক্তার চাচা, কে ওই শব্দ করত? বাচ্চাটা। ছয়মাসের একটা বাচ্চা, অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত, আমাদের সবকথা শুনত! চেয়ারের হাতল চেপে ধরল মাহবুব। আর আমি যখন আলো জ্বালাতাম, কিছু চোখে পড়ত না। বাচ্চাটা এত ছোট যে কোন ফার্নিচারের আড়ালে লুকিয়ে পড়াটা ওর জন্য কোন সমস্যা ছিল না।

থামবে তুমি! বললেন ডাক্তার।

না চাচা, আমাকে বলতে দিন। সব বলতে না পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি গতবার ব্যবসার কাজে হংকং গেলাম। তখন কে শায়লাকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল, কে তার নিউমোনিয়া বাধিয়েছিল? ওই বাচ্চা। কিন্তু এত চেষ্টার পরেও যখন শায়লা মরল না, তখন সে আমাকে খুন করতে চাইল। ব্যাপারটা ছিল স্বাভাবিক; সিঁড়িতে একটা খেলনা ফেলে রাখো, বাপ তোমার জন্যে দুধ না নিয়ে আসা পর্যন্ত কাঁদতে থাকো, তারপর সে অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে ঘাড় ভাঙুক। সাধারণ একটা কৌশল, কিন্তু কাজের। আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি। কিন্তু ফাঁদটা শায়লাকে শেষ করেছে।

একটু থামল মাহবুব। হাঁপিয়ে গেছে। খানিকপর বলল, বহু রাতে আমি আলো জ্বেলে দেখেছি ঘুমায়নি ওটা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বেশিরভাগ শিশু ওই সময় ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু ও জেগে থাকত, চিন্তা করত।

বাচ্চারা চিন্তা করতে পারে না।

ও পারে। আমরা বাচ্চাদের মন সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি? শায়লাকে ওর ঘৃণা করার কারণও ছিল। শায়লা ওকে মোটেও স্বাভাবিক কোন শিশু ভাবত না। ভাবত অস্বাভাবিক

কিছু। ডাক্তার চাচা, আপনি তো জানেনই জন্মের সময় কত বাচ্চা তাদের মায়েদের খুন করে। এই নোংরা পৃথিবীতে জোর করে টেনে আনার ব্যাপারটা কি ওদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে? মাহবুব ক্লান্তভাবে ডাক্তারের দিকে ঝুঁকল। পুরো ব্যাপারটা এক সুতোয় বাঁধা। মনে করুন, কয়েক লাখ বাচ্চার মধ্যে কয়েকটা জন্মাল অস্বাভাবিক বোধ শক্তি নিয়ে। তারা শুনতে পায়, দেখতে পায়, চিন্তা করতে পারে, পারে হাঁটাচলা করতে। এ যেন পতঙ্গদের মত। পতঙ্গরা জন্মায় স্ব-নির্ভরভাবে। জন্মাবার কয়েক হপ্তার মধ্যে বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু সাধারণ বাচ্চাদের কয়েকবছর লেগে যায় হাঁটতে, চলতে কথা বলা শিখতে।

কিংবা ধরুন, কোটিতে যদি একটি বাচ্চা অস্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করে? জন্মাল একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মেধা এবং শক্তি নিয়ে। কিন্তু যে ভান করল আর দশটা বাচ্চার মতই। নিজেকে দুর্বল হিসেবে প্রমাণ করতে চাইল, খিদের সময় তারস্বরে কাঁদল। কিন্তু অন্য সময় অন্ধকার একটা বাড়ির সব জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে সে, শুনছে বাড়ির লোকজনের কথাবার্তা। আর তার পক্ষে সিঁড়ির মাথায় ফাঁদ পেতে রাখা কত সোজা! কত সহজ সারারাত কেঁদে তার মাকে জাগিয়ে রেখে অসুস্থ করে তোেলা।

ফর গডস শেক! দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার, উত্তেজিত। এসব কি উদ্ভট কথা বলছ তুমি!

উদ্ভট শোনালেও ব্যাপারটা সত্যি, ডাক্তার চাচা, মানুষটা ছোট বলেই আমরা ওকে সন্দেহ করতে পারছি না। কিন্তু এই খুদে সৃষ্টিগুলো ভীষণ রকম আত্মকেন্দ্রিক। কেউ ওদের ভালো না বাসলে ঠিকই টের পায়। তখন তাদের প্রতি ওদের ঘৃণা উথলে ওঠে। আপনি কি জানেন ডাক্তার চাচা, পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বার্থপর হচ্ছে শিশুরা?

মোখলেসুর রহমান জাকুটি করে অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন।

মাহবুব বলল, আমি বলছি না বাচ্চাটার ওপর কোন অস্বাভাবিক শক্তি ভর করেছে। কিন্তু সময়ের আগেই ও যেন দ্রুত বেড়ে উঠেছে। আর এই ব্যাপারটাই আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে।

ঠাট্টা করতে চাইলন ডাক্তার। ধরো, বাচ্চাটা শায়লাকে খুনই করেছে। কিন্তু খুনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। বাচ্চাটার উদ্দেশ্য কি ছিল?

জবাবটা তৈরিই ছিল। ত্বরিতগতিতে বলল মাহবুব, যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেনি তার সবচেয়ে শান্তির জগৎ কোথায়? তার মায়ের জরায়ু। ওখানে সময় বলে কিছু নেই, আছে শুধু শান্তির অপার সমুদ্র, একমনে গা ভাসিয়ে থাকো। কোন কোলাহল নেই, নেই দুশ্চিন্তা। কিন্তু তাকে যখন জোর করে টেনে আনা হলো এই মাটির পৃথিবীতে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জগৎ থেকে মুহূর্তে সে পতিত হলো এক নরকে। স্বার্থপর এই পৃথিবীতে তাকে বেঁচে থাকতে হলে মানুষের ভালোবাসা আদায় করতে হবে। অথচ যার সঙ্গে তার কোন

পরিচয় নেই। পরিচিত জগৎ থেকে হঠাৎ এই অপরিচিত দুনিয়ায় এসে নিজেকে সে প্রচণ্ড অসহায় ভাবতে থাকে, তখন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার ছোট্ট মগজে তখন শুধু স্বার্থপরতা আর ঘৃণা ছাড়া অন্যকিছু থাকে না। মোহময় জগৎ থেকে কে তাকে এই নিষ্ঠুর পরিবেশে নিয়ে এল, ভাবতে থাকে সে! এ জন্য দায়ী কে? অবশ্যই মা। তার অপরিণত মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে তখন মায়ের প্রতি ছড়িয়ে পড়ে প্রবল ঘৃণা। বাপও মায়ের চেয়ে ভালো কিছু নয়। সুতরাং তাকেও ঘৃণা করো। খুন করো দুজনকেই।

বাধা দিলেন ডাক্তার। তুমি যা বললে এই ব্যাখ্যা যদি সত্যি হত তাহলে পৃথিবীর সব মহিলাই তাদের বাচ্চাদের ভয়াবহ কিছু একটা ভাবত।

কেন ভাববে না? আমাদের বাচ্চাটা কি তার জলজ্যান্ত উদাহরণ নয়? হাজার বছরের ডাক্তারী শাস্ত্রের বিশ্বাস তাকে প্রটেক্ট করছে। প্রকৃতিগতভাবে সবার ধারণা

সে খুব অসহায়, কোন কিছুর জন্য দায়ী নয়। কিন্তু এই বাচ্চাটা জন্মেইছে বিপুল ঘৃণা নিয়ে। যত দিন যাচ্ছে ততই প্রবল হয়ে উঠছে তার ঘৃণা। সে রাতে শুয়ে থাকে দোলনায়, ফর্সা টুকটুকে মুখখানা ভেজা, শ্বাস ফেলতে পারছে না। অনেকক্ষণ কেঁদেছে বলে এই অবস্থা? অবশ্যই নয়। সে দোলনা থেকে নেমেছে, মাগুড়ি দিয়ে বেড়িয়েছে সারা ঘরে। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও আমার শায়লাকে খুন করেছে। আমিও ওকে খুন করব।

ডাক্তার মাহবুবের দিকে একগ্লাস জল আর কয়েকটা সাদা বড়ি এগিয়ে দিলেন। তুমি কাউকে খুন করবে না। তুমি এখন আগামী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘুমাবে। নাও, এগুলো গিলে ফেলল। একটা ভালো ঘুম হলেই এসব উদ্ভট চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়ে যাবে।

মাহবুব পানি দিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলল ঘুমের বড়িগুলো। ওপরে উঠল ও। কাঁদছে। শুয়ে পড়ল বিছানায়। মোখলেসুর রহমান ওর ঘুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর চলে গেলেন।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে মাহবুবের, এই সময় শব্দটা শুনল।

কে? অস্পষ্ট গলায় বলল সে।

কে যেন হলঘরে ঢুকেছে।

ঘুমিয়ে পড়ল মাহবুব।

.

পরদিন খুব ভোরে মাহবুবের বাসায় হাজির হলেন ডাক্তার মোখলেসুর রহমান। মাহবুবকে নিয়ে খুব টেনশনে আছেন তিনি। ছোটবেলা থেকে ওকে চেনেন।

আবেগপ্রবণ, অস্থির। ভাগ্যিস গতরাতে তিনি ওদের বাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ড্রপ করেছিলেন। নইলে ছেলেটা শায়লার শোকে ওভাবে হাসতে হাসতে পাগল হয়ে যেত। শায়লার কথা মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল তার। এত লক্ষ্মী একটা মেয়ে! কি চমৎকার সুখের জীবন ছিল ওদের। সব গেল ছারখার হয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। মাহবুবকে তিনি কিছুদিনের জন্যে দূরে কোথাও ঘুরে আসতে বলবেন। এভাবে একা থাকলে মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটতে পারে ছেলেটার।

কলিংবেল বাজালেন ডাক্তার। কোন উত্তর নেই। তার মনে পড়ল মাহবুব বলেছিল কাজের মহিলা দেশের বাড়িতে গেছে। নব ঘোরালেন তিনি। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন। ডাক্তারি ব্যাগটা রাখলেন কাছের একটা চেয়ারে।

সাদামত কি একটা সরে গেল দোতলার সিঁড়ি থেকে। মোখলেসুর রহমান প্রায় খেয়ালই করলেন না। তার নাক কুঁচকে উঠেছে। কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছেন।

গন্ধটা গ্যাসের!

বিদ্যুৎ খেলে গেল ডাক্তারের শরীরে, ঝড়ের বেগে সিঁড়ি টপকালেন তিনি, ছুটলেন মাহবুবদের বেডরুমে লক্ষ্য করে।

বিছানায় নিশ্চল পড়ে আছে মাহবুব, সারা রুম ভরে আছে গ্যাসে। দরজার পাশে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো অগ্নিনির্বাপক গ্যাস সিলিণ্ডারের মুখ ভোলা। হিসহিস শব্দে বেরিয়ে আসছে সাদা পদার্থটা। মোখলেসুর রহমানের চকিতে মনে পড়ল মাহবুব একবার বলেছিল সে তার বেডরুমে অগ্নিনির্বাপক গ্যাস সিলিণ্ডার লাগিয়েছে। কারণ তার কোন এক বন্ধু নাকি বিছানায় শুয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে নেটের মশারিতে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরার জোগাড় হয়েছিল। মাহবুবেরও শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। শায়লার তাগিদেই নাকি সে নিরাপত্তার জন্যে ওই সিলিণ্ডার লাগিয়েছে দেয়ালে।

মোখলেসুর রহমান দ্রুত সিলিণ্ডারের মুখ বন্ধ করলেন। বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিলেন। তারপর দৌড়ে এলেন মাহবুবের কাছে।

ঠাণ্ডা হয়ে আছে শরীর। অনেক আগেই মারা গেছে মাহবুব।

কাশতে কাশতে ঘর থেকে বেরোলেন ডাক্তার। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায়। পানি ঝরছে। মাহবুব কিছুতেই ওই সিলিণ্ডারের মুখ খোলেনি। ঘুমের মধ্যে ওর হাঁটার অভ্যাস আছে, বলেছিল শায়লা। কিন্তু যে পরিমাণ ঘুমের ওষুধ ডাক্তার ওকে খাইয়েছেন তাতে দুপুর পর্যন্ত মাহবুবের অঘোরে ঘুমাবার কথা। সুতরাং এটা আত্মহত্যাও হতে পারে না। তাহলে কি...!

হলঘরে মিনিট পাঁচেক পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার মোখলেসুর রহমান। তারপর এগোলেন নার্সারী রূমের দিকে। দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিয়ে খুললেন তিনি দরজা। দাঁড়ালেন দোলনার পাশে।

দোলনাটা খালি।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার দোলনা ধরে। তারপর অদৃশ্য কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন:

নার্সারীর দরজাটা বন্ধ ছিল। তাই তুমি তোমার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান দোলনাতে ফিরে আসতে পারোনি। তুমি বুঝতে পারোনি যে বাতাসের ধাক্কায় দরজাটা অমনভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি জানি তুমি এই বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছ। ভান করছ এমন কিছুর, আসলে যা তুমি নও। মাথার চুল খামচে ধরলেন ডাক্তার, বিবর্ণ একটুকরো হাসি ফুটল মুখে। আমি এখন শায়লা আর মাহবুবের মত কথা বলছি, তাই না? কিন্তু আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। আমি অপার্থিব কোন কিছুতে বিশ্বাস করি না। তারপরও আমি কোন ঝুঁকি নেব না।

নিচে নেমে এলেন ডাক্তার। চেয়ারে রাখা ডাক্তারি ব্যাগ খুলে একটা যন্ত্র বের করলেন।

হলঘরে ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন ঘষটে ঘষটে আসছে এদিকে। পাঁই করে ঘুরলেন ডাক্তার।

আমি তোমাকে এই দুনিয়ায় এনেছি, ভাবলেন তিনি। আর এখন আমিই তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেব...!

শব্দ লক্ষ্য করে ঠিক ছপা হেঁটে গেলেন ডাক্তার। হাতটা উঁচু করে ধরলেন সূর্যালোকে।

দেখো বাবু! কি চকচকে, কি সুন্দর!

সূর্যের আলোতে ঝিকিয়ে উঠল স্কালপেলটা।

ঘাসের আড়ালে কে

বসন্তের এক চমৎকার দিনে আমি হাজির হলাম বাতেংগো। দক্ষিণ সাগরের পরিনেশিয়ান গ্রামগুলোর মত বাতেঙগোও বিশিষ্ট হয়ে আছে তার লম্বা ঘাসের জন্যে। আর ব্রনক্স বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে আমি এবার বিশেষ শ্রেণীর ঘাস খুঁজতেই বেরিয়েছি। বাতেংগার সবেধন নীলমণি লঞ্চঘাটে নামার পরেই পরিচয় হলো ঘাট মাস্টার গ্রেভসের সঙ্গে। সুদর্শন, হাসিখুশি স্বভাবের এই তরুণ খুব সহজেই কাউকে আপন করে নিতে পারে। এমনকি আমার পোষা কুকুর ডন, যে কিনা পলিনেশিয়ান কিংবা মেলানেশিয়ান কাউকেই পছন্দ করে না, সে পর্যন্ত গ্রেভসের ভক্ত হয়ে গেল দশ মিনিটের মধ্যে।

গ্রেভসের ঢেউ খেলানো লোহার ছাদের বাড়িটি আপাদমস্তক ঘোষণা করছে এখানে একজন অবিবাহিত পুরুষ মানুষ বাস করে। গ্রেভস এই দ্বীপে আছে বছর তিনেক। গর্বিত সুরে জানাল, এই সময়ের মধ্যে একদিনও তাকে কেউ কর্তব্যকর্মে গাফিলতি করতে দেখেনি। বেশ কিছুদিন ধরে সাদা চামড়ার মানুষের সান্নিধ্যে থেকে বঞ্চিত গ্রেভস। আমাকে দেখে এত খুশি হলো যে পরিচয়ের আধঘণ্টার মধ্যে জেনে ফেললাম তার শৈশবের সমস্ত ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

অবশ্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটি খুবই সরল। পরবর্তী ট্রিপে যে স্টীমারটি আসছে ওটায় চড়ে তার বান্ধবী আসবে আমেরিকা থেকে। তারা দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং স্টীমারের ক্যাপ্টেন ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

বন্ধু, বলল সে, আপনি হয়তো ভাবছেন আমার প্রেমিকা এখানে এসে খুবই একা অনুভব করবে। কিন্তু আপনি জানেন না আমি আমার সমস্ত ভালোবাসার অর্ঘ্য তার পায়ের তলায় নিবেদন করব। নিঃসঙ্গতা তাকে ছুঁতেই পারবে না। একজন মানুষ, যে সারাদিন ভাবতে থাকে কি করে তার প্রেমিকাকে সুখী করবে, সে তার স্বপ্নকন্যাকে কাছে পেলে কি করবে কল্পনা করুন তো একবার! আচ্ছা আপনি না। হয় এবার ভেতরে আসুন। ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই।

গ্রেভস আমাকে নিয়ে তার বেডরুমে ঢুকল, ড্রেসিং টেবিলের ওপর দেয়ালে বাঁধানো একটি বড় ছবির সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

একজন সামান্য ঘাট মাস্টারের প্রেমিকা এত সুন্দরী হবে এ আমি কল্পনাই করিনি। মেয়েটি শুধু রূপবতীই নয়, অদ্ভুত লাবণ্যময়ী। অদ্ভুত নিষ্পাপ একটি ভাব খেলা করছে তার সুন্দর মুখখানায়।

খুব সুন্দরী, বলল সে। তাই না?

এতক্ষণ চুপচাপ গ্রেভসের কথাই শুনে গেছি আমি। এবার মন্তব্য করলাম, আমি এখন দিব্যি বুঝতে পারছি কেন আপনি এই অসাধারণ রূপবতী মেয়েটির ছবির দিকে তাকিয়ে নিজেকে একা ভাবেন না। এই মেয়ে কি সত্যি সামনের ট্রিপে এখানে আসছে? আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না!

হ্যাঁ, বলল গ্রেভস। সুন্দর না?

একজন ঘাট মাস্টার, বলে চললাম আমি, তার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য এমনকি তার পোষা কুকুর, বেড়ালের সঙ্গেও কথা বলে। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি আসল মানুষটিকে না দেখেও তার ছবির সঙ্গে কথা বলে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়া যায় যদি সে হয় এরকম শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যের অধিকারিণী। আসুন, হাত মেলাই।

তারপর আমি গ্রেভসকে প্রায় একরকম টেনেই ও ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম। কারণ আমার হাতে সময় খুব কম। যে কাজে এসেছি ওটার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি খোঁজ খবর নেয়া দরকার।

আমি কি কাজে এসেছি তা কিন্তু এখনও আপনি জানতে চাননি, বললাম আমি। তাই নিজে থেকেই বলছি। আমি ব্রনক্স বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে ঘাস সংগ্রহ করছি।

আচ্ছা! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল গ্রেভস। তাহলে তো আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন, ভাই। এই দ্বীপে একটা গাছও আপনার চোখে পড়বে কিনা সন্দেহ। কিন্তু চারদিকে আপনি শুধু ঘাসের বন্যাই দেখতে পাবেন। আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই তো কমপক্ষে পঞ্চাশ রকমের ঘাস রয়েছে।

আঠারো পদের ঘাস অবশ্য ইতিমধ্যে আমার চোখে পড়েছে, বললাম আমি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে বাতেঙগো দ্বীপের ঘাসে কখন আঁটি হয়?

পনি ভেবেছেন এই প্রশ্ন করে আমাকে বোকা বানাবেন, তাই না? বলল সে। কিন্তু ঘাট মাস্টারের কাজ করলেও এসবেরও ছিটেফোঁটা খবর আমি রাখি, ভাই সাহেব। ওদিকে, হাত তুলে দেখাল সে, ওগুলোকে আমরা বিচ নাট বলি ওগুলোতে প্রথম আঁটি জন্মাবে। আর যতদূর জানি সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যাবে।

সত্যি বলছেন?

আরে, আমি মিথ্যা বলতে যাব কোন্ দুঃখে?

সেক্ষেত্রে, বললাম আমি, আপনি আমাকে নির্ধারিত সময়েই আবার এখানে দেখতে পাবেন।

সত্যি? উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গ্রেভসের মুখ। তাহলে তো আপনি আমাদের বিয়েতেও অংশ নিতে পারবেন।

ও ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আমি আপনার স্বপ্নকন্যাকে বাস্তবে দেখতে চাই।

আপনি যাওয়ার পর আপনার কাজে লাগে এমন কিছু সাহায্য কি করতে পারি? আমার হাতে এমনিতেই প্রচুর সময়...।

ঘাস সম্বন্ধে যদি আপনার মোটামুটি একটা ধারণা থাকে...

তা অবশ্য নেই। তবে আমি ওদিকটাতে একবার যাব। যদিও যেতে হবে একাই। কারণ ওরা কেউ আমার সঙ্গে যেতে চাইবে না।

গ্রামের লোক?

হ্যাঁ। কুসংস্কারে বোঝাই সব। মানুষের চেয়ে ওই গ্রামে কাঠের দেবতার সংখ্যা বেশি। আর সবাই যেন আত্মহত্যার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সবকটা পাগল... আলোইট! হাঁক ছাড়ল গ্রেভস।

তার ডাক শুনে বাড়ির ভেতরে থেকে হেলেদুলে বেরিয়ে এল দশ বারো বছরের একটি ছেলে।

আলোইট, বলল গ্রেভস, এক দৌড়ে দ্বীপের পাহাড়টায় উঠে এই ভদ্রলোকের জন্য কিছু ঘাস নিয়ে আসতে পারবে? উনি তোমাকে এই জন্যে পাঁচ ডলার বকশিশ দেবেন।

মুখ শুকিয়ে গেল আললাইটের। মাথা নাড়ল যাবে না সে।

পঞ্চাশ ডলার?

এবার আরও জোরে মাথা নাড়ল আলোইট। আমি শিস দিয়ে উঠলাম। এতগুলো টাকার লোভ কেউ সামলাতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।

তাহলে ফোট ব্যাটা কাপুরুষ, ধমকে উঠল গ্রেভস। আমার দিকে ফিরে বলল, দেখলেন তো? টাকা পয়সা, মারধোর কোন কিছু দিয়েই ওদেরকে সাগর তীর থেকে একমাইল দূরেও নিয়ে যেতে পারবেন না। ওরা বলে পাহাড়ের কাছে ওই ঘাসের রাজ্যে গেলে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আপনার জীবনেও ঘটতে পারে।

কোন্ ঘটনা?

বহু বছর আগে এক মহিলা গিয়েছিল ওখানে, বলল গ্রেভস। মহিলাকে পরে লম্বা ঘাসের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার শরীর পুরোটা কালো হয়ে ফুলে গিয়েছিল। পায়ের গোছের ঠিক ওপরে কিসে যেন কামড় দিয়েছিল তাকে।

সাপ তো হতেই পারে না, বললাম আমি। আমি খুব ভালো করেই জানি এসব দ্বীপে সাপ নেই।

সাপে কামড়েছে এমন কথা ওরাও বলেনি, বলল গ্রেভস। ওরা বলেছে কামড়ের জায়গায় খুব ছোট ছোট দাঁতের দাগ দেখা গেছে। যেন খুব ছোট বাচ্চা কামড়েছে। উঠে দাঁড়াল সে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, এসব গাঁজাখুরি ব্যাপার নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। আপনি যদি ঘাস খুঁজতে ওদিকে যেতে চান তো একাই যেতে হবে। আর যদি না যান তাহলে চলুন একবার ঘাটের দিকে যাই। একটা ব্রেক ভেঙে গেছে। ওটাকে মেরামত করতে হবে। হপ্তা পাঁচেক পর আমি আবার যাত্রা শুরু করলাম বাতেগো দ্বীপের দিকে। একমাসেরও বেশি সময় ধরে আমি মানুষজনের সঙ্গ থেকে একরকম বঞ্চিত। তাই যতই বাতেঙগোর লঞ্চ ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের জলযান, ততই উৎফুল্ল হয়ে উঠছি আমি। গ্রেভস। এবং তার ভাবি স্ত্রীর কথা ভাবছি। মেয়েটির সৎসাহসের প্রশংসা করতেই হয়। সবকিছু ছেড়ে দক্ষিণ সাগরের এই নির্জন দ্বীপে শুধু অর প্রেমিকের স্বার্থে বসবাস করতে আসা চাট্টিখানি কথা নয়।

অবশেষে তীরে এসে ভিড়ল তরী। হাঁটুর কাছে রাখা শটগানটি তুলে নিলাম হাতে। ডন ঘেউ ঘেউ করে তার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম।

গুলির শব্দে বেরিয়ে এল গ্রেভস তার বাড়ি থেকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি রুমাল নাড়তে লাগল। আমি মেগাফোনে চিৎকার করে বললাম তাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। জানতে চাইলাম সে বাতেগোতে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে কিনা।

এতদূর থেকেও গ্রেভসের আচরণে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষ করলাম আমি। কয়েক মিনিট পর মাথায় একটি টুপি চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরুল সে। দরজা বন্ধ করল। হাঁটতে শুরু করল গ্রামের দিকে। কিন্তু ওর হাঁটার ভঙ্গিতেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি অনুপস্থিত। আমাকে দেখে সে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না।

আশ্চর্য তো! ডনকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি। গ্রেভসের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

ডনকে নিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম আমি। এগোলাম তীর ধরে। অনেক গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছে তীরে। এত অচেনা মানুষের উপস্থিতি ডনের জন্যে রীতিমত অস্বস্তিকর। সে আমার পায়ে পায়ে চলতে লাগল। গ্রেভস আসার আগেই তীরে পৌঁছে গেলাম আমরা। গ্রেভস ওখানে হাজির হতেই গ্রামবাসীরা সভয়ে সরে গেল দূরে, যেন কোন

কুরোগীকে দেখছে। আমার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসল গ্রেভস, কথা বলার জন্যে মুখ খুলতেই ডন পা শক্ত করে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল।

ডন! চাপা গলায় ধমকে উঠলাম আমি। ডন গুটিসুটি মেরে গেল, কিন্তু ওর পিঠের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকল গ্রেভসের দিকে। গ্রেভসের মুখটা টানটান, রাগরাগ একটা ভাব। ছেলেমানুষি ভাবটা চেহারা থেকে। একেবারেই উধাও। কিছু একটা ব্যাপারে ও খুব টেনশনে আছে, মনে হলো আমার।

এই যে বন্ধু, বললাম আমি। খবর কি তোমার?

গ্রেভস ডানে আর বাঁয়ে তাকাল একবার, লোকগুলো সিঁটিয়ে গেল, পিছু হটল আরও কয়েক পা।

খবর তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ, কাঠখোট্টা গলায় জবাব দিল সে। আমাকে একঘরে করা হয়েছে। একটু থেমে আবার বলল, এমনকি তোমার কুকুরটাও তা বুঝতে পেরেছে। ডন, গুড বয়! এদিকে এসো!

ডন গরগর করে উঠল।

দেখলে তো!

ডন! ধারাল গলায় বললাম আমি। এই লোকটি আমার বন্ধু। তোমারও। যাও, গ্রেভস। ওকে একটু আদর করো।

গ্রেভস এগোল ডনের দিকে। ওর মাথায় চাপড় মেরে আদুরে গলায় কি যেন বলতে লাগল।

ডন এবার আর গর্জন করল না বটে, কিন্তু গ্রেভসের প্রতিটি চাপড়ে শিউরে উঠল সে, যেন খুব ভয় পাচ্ছে।

তাহলে তোমাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে, অ্যাঁ? ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ কৌতুককর মনে হলো। তা তোমার দোষটা কি?

কিছুই না। আমি শুধু ওই ঘাসের জঙ্গলে গিয়েছিলাম, বলল গ্রেভস। আর আমার... আমার কিছু হয়নি বলে ওরা আমাকে একঘরে করেছে।

মাত্র এই?

হ্যাঁ।

আচ্ছা! বললাম আমি। আমিও শিগগির একবার ওদিকে যাব। তার মানে আমাকেও ওরা একঘরে করে রাখবে। তাহলে ভালোই হবে। একসঙ্গে দুজন একঘরে হব। আচ্ছা, আমার জন্যে ইন্টাররেস্টিং কোন ঘাসের সন্ধান পেয়েছো ওখানে? ..

ঘাসের খবর আমি জানি না, বলল সে। কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছি। ওটা তোমাকে দেখাব এবং তোমার কাছে কিছু পরামর্শও চাইব। যাবে নাকি আমার বাড়িতে?

লঞ্চেই রাত কাটাব ঠিক করেছি, বললাম আমি। কিন্তু তুমি যদি জোরাজুরি করো আর রাতের খাবারটা।

আমি তোমার জন্যে এখনই লাঞ্চের ব্যবস্থা করছি, তাড়াতাড়ি বলল গ্রেভস। একঘরে হয়ে থাকার পর থেকে রান্নাবান্না সব নিজেকেই করতে হচ্ছে। অবশ্য আমার রান্না তোমার খুব একটা খারাপ লাগবে না আশা করি।

গ্রেভসকে এখন অনেকটা হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

ডনকে সঙ্গে নেব?

একটু ইতস্তত করল গ্রেভস, আ...ইয়ে...ঠিক আছে।

তোমার অসুবিধে হলে থাক।

ঠিক আছে, ওকে নিয়ে চলো। দেখি ওর সঙ্গে আবার নতুন করে ভাব করা যায় কিনা।

হাঁটতে শুরু করলাম আমরা গ্রেভসের সঙ্গে। ডন আমার পায়ের সঙ্গে সেঁটেই থাকল।

গ্রেভস, বললাম আমি। এইসব অশিক্ষিত গ্রামবাসী তোমাকে একঘরে করে রেখেছে এটা তোমার মন খারাপের কারণ নয়। অন্য কিছু একটা হয়েছে। কি সেটা? কোন খারাপ খবর?

আরে না,বলল সে।ও ঠিকই আসছে। এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তোমাকে আমি আস্তে আস্তে সব খুলে বলব। আমার ওপর রাগ কোরো না। আমি ঠিকই আছি।

কিন্তু তখন যে বললে ঘাসের জঙ্গলে কি ইন্টারেস্টিং একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছ?

পাথরের বিশাল একটি স্তম্ভ দেখেছি। জিনিসটা নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের মতই বড়। হাজার বছর আগের পুরানো, খোদাই করা। মেয়ে মানুষের মূর্তির মত। এছাড়াও অদ্ভুত ধরনের কিছু ঘাস চোখে পড়েছে তোমার কৌতূহল জাগবে। আমি তো আর তোমার মত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নই, তাই ওগুলোকে আলাদাভাবে চিনতে পারিনি।

ঘাসগুলোর নিচে লক্ষ লক্ষ ফুলও চোখে পড়ল... মানে কি বলব, এই জায়গাটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ জায়গা বলে মনে হয়েছে আমার।

দরজা খুলল গ্রেভস, একপাশে সরে দাঁড়াল আমাকে আগে যেতে দেয়ার জন্যে। আমি ভেতরে পা বাড়াতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল ডন।

শাট আপ, ডন!

ঠাস করে একটা থাবড়া বসলাম ওর নাকে। চুপ হয়ে গেল ডন, আমার সঙ্গে ভেতরে ঢুকল ভদ্র ছেলের মত। কিন্তু শরীর আড়ষ্ট হয়েই থাকল ওর।

.

গ্রেভসের বুকশেলফের ওপর জিনিসটাকে চোখে পড়ল আমার। হালকা বাদামী রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি ওটা, রক্তচন্দন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, গোলাপি একটি আভাও রয়েছে। ফুটখানেক উঁচু, কাঠ দিয়ে খোদাই করা জিনিসটা একটি পনেরো ষোলো বছরের মেয়ের মূর্তি। খোদাইয়ের কাজ এত নিখুঁত যে মূর্তিটাকে দারুণ জীবন্ত লাগল আমার কাছে। এমন জিনিস পলিনেশিয়ান বা অন্য কোন দ্বীপে এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার।

মূর্তিটি নগ্ন। ওর চোখ দুটি ইস্পাত নীল। –আর চোখের পাতা ঠিক যেন রেশম, একদম রক্তমাংসের নারীর মত। মূর্তিটি এত বেশি জীবন্ত যে কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। ডনও চঞ্চল হয়ে উঠে চাপা গলায় গোঁ গোঁ শুরু করল। আমি তাড়াতাড়ি ওর ঘাড় চেপে ধরলাম। মূর্তিটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে ওর একশো ভাগ।

মূর্তিটির দিকে চোখ তুলে তাকাতেই ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। ওটা কৌতূহল আর অবজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে আছে ডনের দিকে। তারপর ওটার ছোট, বাদামী বুক দুটো ফুলে উঠল, আবার সমান হলো, সবশেষে নাক দিয়ে সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আঁতকে উঠে একলাফে পিছিয়ে এলাম আমি, পড়লাম গিয়ে গ্রেভসের গায়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, মাই গড! ওটা জীবন্ত।

সুন্দর না। বলল গ্রেভস, ওকে আমি ঘাসের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছি। ভয়ানক দুষ্টু আর চঞ্চল ও। তোমার বন্দুকের আওয়াজ শোনার পর ওকে ওখানে তুলে রেখেছি। যাতে দুষ্টুমি করতে না পারে। অত উঁচু থেকে ও লাফাতে পারবে না।

ওকে তুমি ঘাসের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছ? রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম আমি। ওখানে আরও এরকম আছে নাকি?

থকথক করছে কোয়েল পাখিদের মত। বলল সে। কিন্তু ওদের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। জিনিসটার দিকে তাকাল গ্রেভস, মুচকি হাসল। কিন্তু তুমি কৌতূহল চাপতে না পেরে বেরিয়ে এসেছিলে, তাই না, খুকি? তারপর তোমার ঘাড়টা কাক করে চেপে ধরে এখানে নিয়ে এলাম আমি। তুমি আমাকে কামড়াবার সুযোগই পাওনি।

ওটার ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো। সাদা, ঝকঝকে একসারি দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। গ্রেভসের দিকে তাকাল সে, কঠিন চোখ দুটিতে ফুটে উঠল নমনীয়তা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম গ্রেভসকে সে খুবই পছন্দ করে।

ও এক অদ্ভুত পোষা প্রাণী, তাই না? বলল গ্রেভস।

অদ্ভুত? বললাম আমি। বরং বলো ভয়ঙ্কর। ওটাকে- ওটাকেও একঘরে করে রাখা উচিত। ডন ওটাকে মোটেই পছন্দ করেনি। জিনিসটাকে খুন করতে যাচ্ছিল সে।

ওকে দয়া করে জিনিস বলল না, অনুরোধ করল গ্রেভস। আর অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও কোরো না। তোমার কথা বুঝতে পারলে খুবই মাইণ্ড করবে। তারপর সে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল ওটার সঙ্গে। ভাষাটা গ্রীক বলে মনে হলো। জিনিসটা কথা বলার সময় বারবার উঁচু গলায় হেসে উঠল। হাসিটা মিষ্টি, যেন ঘণ্টা বাজল টুং টাং করে।

তুমি ওর ভাষা জানো?

অল্প অল্প টং মা লাও?
আনা টন সাগ আটো।
নান টেন ডম উড লন আড়ি।

ফিসফিস করে, খুব নরম গলায় কথা বলছে ওরা। আমার দিকে ফিরল গ্রেভস। ও বলছে কুকুরটাকে সে ভয় পায় না। আর সে একা থাকতেই বেশি পছন্দ করবে। তোমার কুকুরটা যেন তাকে বিরক্ত না করে।

ডনের তেমন কোন ইচ্ছেও নেই, বললাম আমি। এখন দয়া করে বাইরে চলল। ওকে আমার মোটেও ভালো লাগছে না। ভয় পাচ্ছি আমি।

জিনিসটাকে শেলফ থেকে নিচে নামাল গ্রেভস, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

গ্রেভস, বললাম আমি, তোমার ওই একমুঠি জিনিসটা কোন শুয়োর কিংবা বানর নয়, একটি মেয়ে। তুমি ওকে তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে অপহরণের মত মারাত্মক অপরাধ করেছ। এখন আমার পরামর্শ হচ্ছে যেখান থেকে ওকে এনেছ সেখানে ওকে রেখে এসো। তাছাড়া মিস চেস্টার ওকে দেখলেই বা কি ভাববেন?

ওকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই, বলল গ্রেভস। কিন্তু আমি অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তায় আছি- খুবই চিন্তায় আছি। কথাটা কি এখন বলব নাকি লাঞ্চের পর?

না, এখন বলো।

শুরু করল গ্রেভস। তুমি চলে যাওয়ার পর আমিও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠি। তোমার জন্যে ঘাসের নমুনা সংগ্রহ করতে দুবার ওদিকে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার আমি একটি গভীর উপত্যকার মত জায়গায় ঢুকে পড়ি। ওখানকার ঘাসগুলো সব বুক সমান উঁচু। আর ওখানেই বিশাল এক পাথরের স্তম্ভ পড়ে থাকতে দেখি। একসঙ্গে আমার চোখে পড়ে কিছু জীবন্ত প্রাণী। ওরা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি ওদের পিছু ধাওয়া করি। ওখানে প্রচুর আলগা পাথর ছড়ানো ছিটানো ছিল। একটা পাথর হাতে তুলে নিই ওগুলোর কোনটাকে কজা করা যায় কিনা ভেবে। হঠাৎ দেখি কতগুলো ঘাসের আড়াল থেকে এক জোড়া ছোট, উজ্জ্বল চোখ উঁকি দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা ছুঁড়ে মারি জিনিসটাকে লক্ষ্য করে। ধপাস করে পাথরটা ঘাসের মধ্যে পড়তেই গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই আমি। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যাই ওদিকে। তারপর ওকে দেখতে পাই আমি।

আমাকে দেখে তেড়ে কামড়াতে এসেছিল ও। আমি চট করে ওর ঘাড়টা দুআঙুল দিয়ে চেপে ধরতেই নিস্তেজ হয়ে যায়। তাছাড়া, পাথরের আঘাতে বেশ আহত হয়েছিল ও। আমার হাতে মরার মত পড়েছিল। ওকে ওভাবে মরতে দিতে মন চায়নি আমার। তাই ওকে বাড়িতে নিয়ে আসি। হপ্তাখানেক খুবই অসুস্থ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গে খেলতে থাকে। আমার টেবিলের নিচের দেরাজটা খুলে প্রায়ই ওটার

মধ্যে লুকিয়ে থাকে ও। আর আমার রাবারের বুট জুতো জোড়াকে বানিয়েছে খেলনা বাড়ি। সঙ্গী হিসেবে ও পোষা বেড়াল, কুকুর কিংবা বানরের মতই ভালো। তাছাড়া ও এত ছোট যে ওকে আমি আমার পোষা একটি প্রাণী ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারি না। তো এই হচ্ছে ওর গল্প। এরকম ঘটনা যে কারও জীবনে ঘটতে পারে, পারে না?

হুম, তা পারে, বললাম আমি। কিন্তু প্রথম দর্শনেই যে মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয় তাকে পোর কোন মানে আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার কথা যদি শোনো তাহলে বলব, ওকে যেখানে পেয়েছ সেখানে রেখে এসো।

চেষ্টা করেছিলাম, বলল গ্রেভস। কিন্তু ওকে ছেড়ে আসার পরদিন সকালেই দেখি আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে- চোখ দিয়ে জল পড়ছে না, কিন্তু কাঁদছে... তুমি অবশ্য একটা কথা ঠিকই বলেছ-ও শুয়োর কিংবা বানর নয়- একটি মেয়ে।

তুমি কি বলতে চাইছ ওটা তোমার প্রেমে পড়েছে? ঠাট্টার সুরে বললাম আমি।

সম্ভবত তাই।

গ্রেভস, এবার সিরিয়াস হলাম আমি। মিস চেস্টার সামনের ট্রিপের স্টীমারেই আসছেন। এর মধ্যে যা করার করতে হবে।

কি করব? অসহায় গলায় বলল গ্রেভস।

এখনও জানি না। তবে আমাকে ভাবতে দাও, বললাম আমি।

.

মিস চেস্টার আর সপ্তাহখানেক পরে আসবে। ইতিমধ্যে গ্রেভস বার দুই চেষ্টা করেছে বো-কে (ওটার নাম বো রেখেছে সে) ঘাসের জঙ্গলে ছেড়ে আসতে। কিন্তু দুইবারই তাকে পরদিন ভোরবেলা দেখা গেছে বারান্দায় বসে কাঁদতে। আমরা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি বো-র আত্মীয় স্বজনকে খুঁজে বের করতে। গ্রেভস ওকে নিজের জ্যাকেটের পকেটে পুরে বেরিয়েছে। কিন্তু কোনবারই সফল হইনি। বো ইচ্ছে করলেই পথ দেখাতে পারত। কিন্তু ইচ্ছে করেনি। খোঁজাখুঁজি পর্বের পুরো সময়টা আমরা তাকে দেখেছি গোমড়া মুখ করে থাকতে। গ্রেভস যে কবার তাকে মাটিতে নামিয়ে রাখতে চেয়েছে, ততবার সে গ্রেভসের জামার হাত ধরে ঝুলে থেকেছে। হাত থেকে তাকে ছোটাতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে ওকে।

খোলা জায়গায় বো-র গতি ইঁদুরের মতই দ্রুত। আর তাকে ছুঁড়ে ফেলেও নিস্তার নেই, এক দৌড়ে ছুটে এসে ধরত সে আমাদের। কিন্তু ঘন ঘাসের মধ্যে ভালোভাবে চলতে পারত না। আমরা ওকে ফেলে দ্রুত চলে যাচ্ছি, এই সময় কাঁদতে শুরু করত বো। এই কান্না সহ্য করা সত্যি কঠিন।

আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না বো। কিন্তু আমার ওপর চড়াও হওয়ার সাহসও পায় না। কারণ সে দেখছে গ্রেভসের ওপর আমার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আর আমিও বো-কে কখনও ঘাটাতে যাই না। মানুষ সাপ কিংবা বড় ইঁদুরকে যেমন ভয় পায়, বো-কে আমিও তেমনি ভয় পাই। এমনিতে বো-কে দেখলে যে কোন লোকেরই ভালো লাগবে। কিন্তু ও যখন লাফ মেরে মাছি কিংবা ঘাস ফড়িং ধরে কচকচিয়ে জ্যান্ত চিবিয়ে খায়, কিংবা ওর সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করতে গেলেই ওর কান দুটো বেড়ালের মত মিশে যায় মাথার পেছনে এবং হিস হিস শব্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ে, তখন দেখে খুবই ভয় লাগে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না।

ডনও বো-র সঙ্গে লাগতে যায় না। ইতিমধ্যে সে বুঝে গেছে তার প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী। বো তার দিকে কোন কারণে তেড়ে আসলে সে রুখে দাঁড়ায় না, বরং লেজ উল্টে পালায়। আমার মত ডনও বুঝতে পেরেছে বো-র মধ্যে সাংঘাতিক কিছু একটা আছে যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সুতরাং ওকে না ঘটানোই ভালো।

একদিন ভোরবেলা, দিগন্ত রেখায় ধোয়া দেখতে পেলাম আমরা। গ্রেভস তাড়াতাড়ি তার রিভলভার বের করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ওর স্টীমার আসছে।

হ্যাঁ, সায় দিয়ে বললাম আমি। তাই তো মনে হচ্ছে। তবে এখনই আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বো-র ব্যাপারে?

অবশ্যই। বো-কে দিন কয়েকের জন্য আমার কাছে রাখব। তোমরা দুজনে মিলে ঘরসংসার একটু সাজাও। তারপর মিসেস চেস্টার, মানে মিসেস গ্রেভার ঠিক করবেন কি করা যায়। তবে বো-কে এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আভাস দিয়ো না। ওকে আমার লঞ্চে নিয়ে এসো। তারপরের সব দায়িত্ব আমার।

খুশি মনে আমার পরামর্শ মেনে নিল গ্রেভস। বো-কে নিয়ে সে আমার লঞ্চে চলে এল। বো চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। ওকে দ্রুত আমার কেবিনে পুরে বাইরে থেকে তালা মেরে দিলাম। যেই বুঝল ওকে বন্দী করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল বো, কাঁদতে কাঁদতে।

গ্রেভসের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। শুকনো গলায় বলল, তাড়াতাড়ি চলো। আমার খুব খারাপ লাগছে।

অবশ্য মিস চেষ্টারকে দেখামাত্র মন ভালো হয়ে গেল গ্রেভসের। খানিক পর সম্ভবত সে ভুলেই গেল বো-র কথা।

মিস চেস্টারকে দেখে আবার মুগ্ধ হলাম আমি। ছবির চেয়েও সুন্দরী সে। এমন একটি মেয়ের স্বামী হতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। গ্রেভস নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

ওদের বিয়েটা খুব দ্রুত এবং ছিমছামভাবে হয়ে গেল। কন্যা সম্প্রদান করলেন স্টীমারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি। ক্যাপ্টেন বিয়ে পড়ালেন। আর নাবিকরা সব সমস্বরে গাইল একটি মধুর বিয়ের গান। শ্যাম্পেন আর কেক দিয়ে সারা হলো সকালের নাস্তা। শ্বেতশুভ্র পোশাক পরা পরীর মত মিস চেস্টার তার স্বামীর হাত ধরে লাজুক হেসে তীরে বাঁধা নৌকায় উঠল খানিক সমুদ্র ভ্রমণ করে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে। পরপর সাতাশবার পেতলের কামান দেগে অভিনন্দিত করা হলো নব দম্পতিকে। ওদেরকে নিয়ে নৌকা ভেসে পড়ল সমুদ্রে।

এত দ্রুত সবকিছু শেষ হয়ে গেল যে আমি খুবই নিঃসঙ্গবোধ করতে লাগলাম। ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। কোন কাজ নেই বলে বসে বসে রাইফেল আর রিভলভারটি পরিষ্কার করলাম। কিছুক্ষণ নোট লিখলাম দক্ষিণ সাগরের ঘাস সম্পর্কে। তারপরও কিছুই ভালো লাগছে না বলে ডনকে নিয়ে দিগম্বর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রে। অনেকক্ষণ হুটোপুটি করলাম সাগর জলে। তীরে উঠে চিৎ হয়ে পড়ে থাকলাম উজ্জ্বল সূর্যের নিচে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামল। উঠে পড়লাম আমরা। সোজা চলে এলাম লঞ্চে। ধীরে সুস্থে ডিনার খেলাম। তারপর আবার কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম বো-র অবস্থা দেখতে।

বুনো বেড়ালের মত ছুটে এল বো আমার দিকে। ঝট করে সরে গিয়েছিলাম বলে রক্ষে, নইলে নির্ঘাত কামড় খেতাম। কিন্তু তারপরও আমার প্যান্টের কাপড় ছিঁড়ে নিয়েছে বো। বিদ্যুৎগতিতে কাজ করল আমার পা, ধাই করে লাথিটা গিয়ে লাগল ওর গায়ে, ছিটকে কেবিনের এক কোনায় গিয়ে পড়ল বো। তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জ্বেলে নিলাম, সতর্ক একটা চোখ রেখেছি বো-র ওপর। ও একটা চেয়ারের নিচে গিয়ে ঢুকল। ভয়ঙ্কর কুদ্ধ দেখাচ্ছে। আমি আরেকটা চেয়ারে বসে কথা বলতে শুরু করলাম।

এতে কোন লাভ হবে না, বললাম আমি। তুমি বেহুদা আমাকে কামড়ে দিতে চাইছ। তুমি জানো তোমাকে এক লাথিতে আমি ভর্তা বানিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু তোমাকে আমি মারতে চাই না। তারচে আমার কাছে এসে বসো। এসো, আমরা বন্ধু হই। অবশ্য তুমি আমাকে পছন্দ করো না তা আমি জানি। আর আমিও যে তোমাকে দুচোখে দেখতে পারি না সে কথাও তোমার অজানা নয়। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে আমাদের সহাবস্থান করতেই হবে। আর ওটা যাতে ভালোভাবে হয় সেই চেষ্টাই আমাদের করা উচিত। সুতরাং চেয়ারে নিচ থেকে বেরিয়ে এসো, আমার সঙ্গে দ্র ব্যবহার করো। আমি তোমাকে বাদাম খাওয়াব। বাদাম খাওয়ার লোভেই বোধহয় সে বেরিয়ে এল চেয়ারের তলা থেকে। আমি পকেট থেকে কিছু বাদাম বের করে মেঝেতে রাখলাম, ও দ্রুত এগিয়ে এল সামনে, কুটকুট করে খেতে লাগল ওগুলো।

এক মিনিটের মধ্যে বাদামগুলো সাবড়ে সে তাকাল আমার দিকে। তার চোখে অসীম বেদনা, যেন বলছে, আমি কি দোষ করেছি? আমাকে কেন তোমার সঙ্গে থাকতে হবে? আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। আমাকে গ্রেভসের কাছে যেতে দাও।

আমি ওকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলাম। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন কাজ হলো না। তার চোখে আমার জন্যে উপচে পড়ছে ঘৃণা। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম। একটা বালিশ ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে। ইচ্ছে হলে ঘুমাবে। তারপর বেরিয়ে এলাম বাইরে। দরজা বন্ধ করতেই সে কান্না জুড়ে দিল। আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। খুব নরম গলায় ভালো ভালো ভালোবাসার কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু সে আমার দিকে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। উপুড় হয়ে শুয়ে একভাবে কাঁদতেই থাকল।

এবার মেজাজ চড়ে গেল আমার। ঘাড় ধরে ওকে শূন্যে তুলে ফেললাম। মাথা ঘুরিয়ে ও আমাকে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। আমি লক্ষ করলাম ও কাঁদছে, কিন্তু চোখে এক বিন্দু জল নেই। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে হলো। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে লাগলাম। জলকণার চিহ্ন মাত্র নেই চোখের তারায়। ওর ঘাড়টা বোধহয় খুব জোরে চেপে ধরেছিলাম আমি, ব্যথা পেয়ে ওর ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যেতে লাগল, বেরিয়ে পড়ল দাঁত।

এই সময় আমার গ্রেভসের গল্পটা মনে পড়ল। ঘাসের জঙ্গলে মৃত অবস্থায় যে মহিলাকে পাওয়া গিয়েছিল তার সমস্ত শরীর কালো হয়ে গিয়েছিল, দাঁতের দাগ ছিল পায়ের গোছের ওপর। ছোট ছোট দাঁত-বাচ্চাদের।

আমি জোর করে বো-র মুখ হাঁ করালাম। মোমবাতিটা দাঁড় করালাম মুখটার সামনে। কিন্তু ও এত বেশি শরীর মোচড়াচ্ছে যে বাধ্য হয়ে মোমবাতিটা মাটিতে রেখে ওর ঠ্যাং দুটো মুক্ত হাতটা দিয়ে চেপে ধরতে হলো। ইতিমধ্যে যা দেখার দেখে নিয়েছি আমি। সমস্ত শরীর আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল দ্রুত। একসারি ইঁদুরের দাঁতের দুই পাশে সঁচাল দুই ছেদক দন্ত নিয়ে যে শরীরটা আমার হাতের মধ্যে মোচড় খাচ্ছে আর হিস হিস শব্দ তুলছে, ওটা কোন নারী শরীর নয়-বিষাক্ত একটা সাপ!

.

ওটাকে আমি একটা সাবানের পরিত্যক্ত কাঠের বাক্সে ঢুকিয়ে ওপরে কাঠের ছিলকা মেরে দিলাম। ওকে আসলে উচিত লোহার বাক্সে পুরে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া। কিন্তু গ্রেভসের সঙ্গে কথা না বলে কাজটা করা ঠিক হবে না ভেবে প্ল্যানটাকে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখলাম।

কোন দুর্ঘটনায় যাতে পড়তে না হয় সে জন্যে আগেভাগে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ কে বলতে পারে বো-র ভাই ব্রাদাররা সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিতে

আসবে না। তাই পকেটে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি, রাবার ব্যাণ্ডেজ এবং এক বাক্স পারমাঙ্গানেট ক্রিস্টাল (সাপে কামড়ানো রুগীর ফার্স্ট এইডের মহৌষধ) পুরে ডেকে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চমৎকার তারাজ্বলা রাত। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ঘুমটা জমবে ভালো, কিন্তু ঘুমাবার আগে বো-র অবস্থাটা একবার দেখে আসা উচিত ভেবে উঠে পড়লাম। দরজা বন্ধ করতে নিশ্চই ভুলে গিয়েছিলাম আমি। কারণ ভেতরে ঢুকে দেখি বো নেই। পালিয়েছে। মাথা দিয়ে বাড়ি মেরেই বোধহয় সে নরম কাঠের বাক্সটা ভেঙেছে। ওর শারীরিক সামর্থ্যকে এতটা অবজ্ঞা করা উচিত হয়নি আমার।

লঞ্চের লোকজন লণ্ঠন জ্বেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজল বো-কে। কিন্তু কোথাও ওর টিকিটিও দেখা গেল না। তার মানে জলে নেমে গেছে বো। অবশ্য সাপদের জন্য সাঁতার কাটা কোন সমস্যা নয়।

আমি ছোট একটা নৌকায় চড়ে দ্রুত তীরে চলে এলাম। ডনকে সঙ্গে করে, হাতে লোড করা শটগান নিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলাম তীর ধরে। পথ শর্টকাট করার জন্যে ঘাসের একটা জঙ্গলে ঢুকে দ্রুত এগোতে থাকলাম। হঠাৎ ডন কাঁপতে শুরু করল, ঘাসের গায়ে নাক লাগিয়ে কি যেন শুঁকছে।

গুড ডন, চেঁচিয়ে উঠলামি আমি। গুড বয়, ওর পিছু নাও! খুঁজে বের করো ওকে!

প্রকৃতি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আমরা গ্রেভসের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর থেকে ওর বারান্দায় দুই ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। দেখেই বুঝলাম গ্রেভস এবং তার বৌ। আমি ওকে সাবধান করার জন্যে মুখ খুলেছি, বলতে যাচ্ছি বো পালিয়ে গেছে এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, এই সময় তীক্ষ্ণ এবং তীব্র একটা চিৎকার বিস্ফোরণের মত আঘাত হানল কানে। দেখলাম গ্রেভস বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গেল তার স্ত্রীর দিকে। মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে, দুহাতে জড়িয়ে ধরল তাকে।

মিসেস চেস্টার এখনও জ্ঞান হারায়নি, দাঁতে দাঁত চেপে আছে, ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে। আমি তাড়াতাড়ি ওর পা থেকে খুলে ফেললাম মোজা। আঙুল এবং গোড়ালির মাঝের জায়গাটায় কামড় বসিয়েছে বো। বিষের ক্রিয়ার ইতিমধ্যে জায়গাটা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। ডাক্তারি ছুরিটা দিয়ে আমি ক্ষতচিহ্নটা চিরে ফেললাম, ওষুধ লাগিয়ে জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম।

গ্রেভস, ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললাম। তোমার স্ত্রী জ্ঞান হারাতে শুরু করলে অল্প অল্প করে তাকে ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়ো। তবে ভয়ের কিছু নেই বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ ঠিক সময়ই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। আর শোনো, ভুলেও বলতে যেয়ো না কেন এবং কিসে তাকে কামড়েছে...।

বলে আর দেরি করলাম না আমি। ডনকে বারান্দায় একটি থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম। ও খুবই অস্থির হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ওর বাঁধন খুলে ছুটলাম বো-র পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে।

উজ্জ্বল চাঁদ দিন করে রেখেছে চারদিক। বালির ওপর বো-র ছোট ছোট পায়ের দাগ স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। ডনকে শোকালাম ওই দাগ, তারপর তাড়া দিলাম, খোঁজো ওকে, ডন! শিগগির খুঁজে বের করো।

পায়ের দাগ ধরে আমরা ক্রমশ ঢুকে পড়লাম দ্বীপের ভেতরের অংশে। ঘাসের গন্ধ তীব্রভাবে নাকে ধাক্কা মারছে। ডনের চলার গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে গেল, শরীর হয়ে উঠল আড়ষ্ট, তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করল। আমি মাথা বাড়ালাম। কিছুই চোখে পড়ল না, এদিকে ডন তার লেজের ডগা বিপুল বেগে নাড়তে শুরু করেছে, শরীরটা ক্রমশ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে লাগল, ঘন এক গোছা ঘাসের দিকে মাথাটা এগিয়ে নিল। এক পা সামনে বাড়াল ডন, ওর ডান থাবাটা উঠে গেল শূন্যে, লেজ নাড়ানো থেমে গেল একই সঙ্গে। শক্ত, লোহার মত হয়ে উঠল ওটা।

দাঁড়াও, ডন! প্রায় ফিসফিস করে বললাম আমি। শটগানটা স্থির করলাম ঘন ঘাস গোছাকে লক্ষ্য করে, ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ল...।

.

তোমার স্ত্রী এখন কেমন আছে?

আগের চেয়ে ভালো। পরপর দুটো গুলির শব্দ শুনলাম। শিকার মিলল কিছু?

পূর্বপুরুষ

রোজমেরী হার্ট বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছে ম্যান্টলপিসের ওপর ঝোলানো পোর্ট্রেটটির দিকে। বহু বছর ছবিটি চিলেকোঠায় নানীর ঘরে ছিল, আজ সকালে রোজমেরীর ঘরে আনা হয়েছে ওটা।

নানী মারা গেছেন তাই অন্যান্য অনেক জিনিসের মত পোর্ট্রেটটিও বংশাধিকার সূত্রে পেয়ে গেছেন রোজমেরীর মা।

এ ছবিটি তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের, মিসেস হার্ট বলেছেন মেয়েকে। নেবে এটা? তোমার ঘরে টাঙিয়ে রাখবে।

সত্যি দেবে আমাকে? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে রোজমেরী।

তা হলে খুব মজা হবে। ওঁকে দারুণ লাগছে আমার। অভিজাত...রাজকীয়। মার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। তুমিও অবশ্য তাই।

হেসে উঠলেন মিসেস হার্ট, মেয়ের কাঁধ চাপড়ে বললেন, রাজকীয়-ফাজকীয় বুঝি না তবে উনি ছিলেন আমার প্রপিতামহ। কাজেই চেহারায় মিল থাকতেই পারে। ব্যক্তি

সূচিপত্র

জীবনে ওঁর মত হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি। উনি খুব সাহসী ছিলেন; রানী ভিক্টোরিয়ার সময়ে যুদ্ধ করেছেন।

উনি সৈনিক ছিলেন নাকি? আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল রোজী। তার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসও আছে, প্রাচীনকালের ইতিহাস পড়ার সময় সেই সময়ে যেন চলে যায় ও, নিজেকে ইতিহাসের একটা অংশ মনে হতে থাকে। রানী বা রাজকুমারী জাতীয় কিছু একটা ভাবে রোজমেরী নিজেকে।

প্রপিতামহ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মারা গেছেন, বলল ওর মা। সাংঘাতিক আহত হয়েও ব্যাটল অভ ইঙ্কারম্যানে দল নিয়ে গেছেন তিনি, যুদ্ধ করেছেন রাশানদের বিরুদ্ধে। নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেননি কখনও। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবার আগ পর্যন্ত বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। ইতিহাস বলে, ওই যুদ্ধে জয়ী হবার পেছনে প্রপিতামহের বিরাট ভূমিকা ছিল।

.

সেদিন সারাক্ষণ নিজের পূর্ব-পুরুষের কথা ভাবল রোজমেরী। কিন্তু তাকে তো শুধু প্রপিতামহ গ্রেগরী বলে ডাকা যাবে না, সংক্ষিপ্ত একটা নাম দেয়া উচিত। অনেক ভেবে রোজমেরী ঠিক করল তার পূর্বপুরুষকে শুধু গ্রেগরী নামেই ডাকবে। কারণ গ্রেগরী তার কাছে রক্ত মাংসের মানুষের মতই বাস্তব মনে হচ্ছে। যেন ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু।

রাতের বেলা, ঘুমুবার সময় বিচিত্র এক অনুভূতি জাগল রোজমেরীর। আগে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে ঘুমাতে তার খুব ভয় লাগত। মাকে অবশ্য এ কথা কখনও বলেনি রোজী মা হাসাহাসি করবে বলে। সত্যি তো, দশ বছরের একটা মেয়ে আলো নিভিয়ে ঘুমাতে ভয় পায় শুনলে সবাই হাসবে।

তবে আজ ভয় লাগছে না। মাথার ওপর গ্রেগরীর ছবি আছে বলেই হয়তো। যে লোক যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করতে পারেন তিনি সহজেই তার আত্মীয়, ছোট একটি মেয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবেন। কাজেই রোজমেরীর ভয় পাবার কিছু নেই। বরং ওকে আরো সাহসী হতে হবে। ভয় পেলে নিজের পূর্বপুরুষকে লজ্জায় ফেলে দেয়া হবে।

বিছানায় কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে গায়ের চাদর সরিয়ে নিঃশব্দে নেমে পড়ল রোজমেরী, দাঁড়াল জানালার সামনে, পর্দা সরাল। এরকম কাণ্ড আগে কখনও করেনি সে। জানালা সবসময় বন্ধ রেখেছে রোজী। কারণ চাঁদের আলো পড়ে দেয়ালে ভ্যাম্পায়ার আকৃতির যে সব নকশা তৈরি করে, রোজমেরী খুবই ভয় পায়।

জানালা থেকে সরে এল রোজমেরী, তাকাল পোট্রটের দিকে। গ্রেগরীর চোখ ওকে অনুসরণ করছে। বিছানায় লাফ দিল রোজমেরী, হাসল পূর্ব-পুরুষের দিকে তাকিয়ে।

গুড নাইট, গ্রেগরী, বলল সে। তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সুইচ টিপে আলো নেভালো রোজমেরী, একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সে রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল রোজমেরী। তার স্বপ্নে জ্যান্ত হয়ে ছবির ফ্রেম থেকে নেমে এলেন গ্রেগরী। রোজমেরী দেখল দৃশ্যপট বদলে গেছে। সে চলে এসেছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সেই সময়ে। গ্রেগরী বিশাল তরবারি নিয়ে বীর বিক্রমে শত্রুর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কিন্তু বেশিক্ষণ লড়াই করা সম্ভব হলো না। আহত হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। রোজমেরী ছুটে গেল তার কাছে। তিনি মৃত্যুর আগে বলে গেলেন, রোজমেরী, সাহস রাখো। ভয়ের কিছু নেই।

ঘুম ভেঙে গেল রোজমেরীর। স্বপ্নটাকে তার খুব বাস্তব মনে হতে লাগল। ভয়ে ভয়ে সে পোর্সেটের দিকে তাকাল। ভেবেছে ওখানে গ্রেগরীর ছবির বদলে রাশান কোন সৈনিককে দেখবে।

না, গ্রেগরী আছেন আগের জায়গাতেই।.শান্ত, স্থির ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রোজমেরী। তুমি তাহলে এখনও ওখানে আছ। বেশ।

সাহস রাখো। পোট্রটকে যেন বলতে শুনল রোজমেরী।

স্কুলের কাউকে গ্রেগরী সম্পর্কে কিছু বলল না রোজমেরী। ব্যাপারটা গোপন থাকল। তবে গ্রেগরী তার মনে সত্যি সাহস এনে দিলেন। একটা ছোট্ট ঘটনাই এর প্রমাণ।

রোজমেরীদের স্কুলে একটি খেলা খেলে সবাই। প্রথমে বৃত্তাকারে দাঁড়ায় মেয়েরা, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাঝখানে, ঘোরাতে থাকে একটি রশি, রশির অন্যপাশ চাপা থাকে পাথর দিয়ে। এখন ঘুরন্ত ওই রশি এক লাফে পার হয়ে যেতে হবে। টাইমিংটা এক্ষেত্রে নিখুঁত হওয়া চাই। আর এখানটায় রোজমেরীর গড়বড় হয়ে যায়। সে রশি পার হতে গিয়ে প্রতিবার আছাড় খেয়েছে। আর ক্লাসশুদ্ধ মেয়ে হেসে উঠেছে, সেই সাথে পি.টি টিচার মিস ব্রিগসের কঠিন ধমক তো আছেই।

তবে এবার ঠিক ঠিক রশি পার হয়ে গেল রোজমেরী। সে যখন লাফ দেবে ঠিক করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রেগরীর গলা শুনতে পেল, ওকে অভয় দিচ্ছেন তিনি, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলছেন। তারপর বলে উঠলেন: এখন! লাফাও!

লাফ দিল রোজমেরী এবং চমৎকারভাবে রশি পার হয়ে গেল। মিস ব্রিগস স্বীকার করতে বাধ্য হলেন আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে রোজমেরীর। কিন্তু রোজমেরী তো জানে কৃতিত্বটা আসলে কার।

সেদিন স্কুল লাইব্রেরীতে গিয়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ওপর বই খোঁজ করল রোজমেরী।

অত কঠিন বই তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না, খুকী, লাইব্রেরিয়ান বলল ওকে। সত্যি পড়বে?

মাথা দোলাল রোজী। জ্বী, কারণ আমাদের পরিবারের একজন ওই যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর ছবি আছে আমার কাছে। আমি যুদ্ধটি সম্পর্কে জানতে চাই।

টিফিন পিরিয়ডে খেলার মাঠে বসে ইঙ্কারম্যানের যুদ্ধ সম্পর্কিত লেখা সমস্ত তথ্য গোগ্রাসে গিল রোজমেরী। শিউরে উঠল যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা জেনে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথাও উল্লেখ আছে, উনি যুদ্ধাহত মানুষের সেবা করেছেন। গ্রেগরীর সাথে কি ফ্লোরেন্সের সাক্ষাৎ হয়েছিল, ভাবল সে।

রোজমেরী ঠিক করল বড় হয়ে সে নার্স হবে, মানুষের সেবা করবে। কল্পনায় দেখল হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে সে হেঁটে যাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে থাকা রোগীদের কুশল জিজ্ঞেস করছে। তারপর দেখল সম্পূর্ণ সাদা পোশাকে সে চার্চে যাচ্ছে, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে তরবারি হাতে লম্বা এক সৈনিক, অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

বই পোকা! খেলার মাঠে এক মেয়ে ঠাট্টা করে ডাকল রোজমেরীকে। সাথে সাথে কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল রোজী। বইয়ের আরেকটি পাতা ওল্টাতেই গ্রেগরীর নাম চোখে পড়ল তার। তার পূর্ব পুরুষের নাম সত্যি আছে ইতিহাস বইতে! ক্যাপ্টেন গ্রেগরী হ্যাঁসকস। আবার কল্পনার ডানায় ভর করল রোজমেরী। দেখল টিভিতে

কুইজ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন: ক্যাপ্টেন গ্রেগরী হ্যাঁসকস কে ছিলেন?

প্রত্যেকে তার বাযারে চাপ দিল, প্রথম জন বলল: ব্যাটল অভ ইঙ্কারম্যানের হিরো ছিলেন তিনি।

গর্বে বুক ফুলে গেল রোজমেরীর। আমাকে আর কেউ ভীতু বলতে পারবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে। আমি ক্যাপ্টেন হ্যাঁসকসের নাম রক্ষা করব।

.

মাকে বইটি দেখানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল রোজমেরী, ছুটল বাড়ির দিকে। মা সাধারণত দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন তার জন্যে। আজ তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। কলিংবেল টিপল রোজমেরী, অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ পরেও কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে ভয় লাগল ওর। মা কি কোথাও গেছেন? ফেরার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন? নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

হঠাৎ ঝড়াং করে খুলে গেল দরজা, চৌকাঠে এসে দাঁড়াল কুৎসিত দর্শন, বিশালদেহী এক লোক।

এতক্ষণে স্কুল থেকে ফেরার সময় হলো, খুকী! বলল সে বিশ্রী হেসে।

এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, ভেতরে ঢুকতে দিল রোজমেরীকে। মাকে এই সময় দেখতে পেল সে। ম্লান, বিবর্ণ, থরথর করে কাঁপছেন ভয়াল দর্শন লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে।

ওহ্, রোজী, আমার সোনা, প্রায় ডুকরে উঠলেন তিনি, তারপর লোকটাকে বললেন, এবার তুমি চলে যাও, প্লীজ। বললামই তো আমাদের এখানে তোমার কোন কাজ নেই। দয়া করে চলে যাও!

রোজী, বলল লোকটা। বেশ সুন্দর নাম। লোকটার গলায় এমন কিছু ছিল, ভয় পেয়ে গেল রোজমেরী, তুমি দেখতেও ভারী সুন্দর। ঘুরে দাঁড়াল সে মিসেস হার্টের দিকে। আপনি নিশ্চয়ই চান না আপনার মেয়ের কোন ক্ষতি হোক? ধরুন, ওর সুন্দর মুখে যদি একটা খুরের পোঁচ দিই? ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল লোকটা শেষের দিকে।দেব নাকি?

রোজমেরীর কানে কানে কে যেন ফিসফিস করে বলল, সাহস রাখো। মনে মনে জবাব দিল সে। সাহস রাখছি। গ্রেগরী। অবশ্যই সাহস হারাব না।

গলায় জোর এনে রোজমেরী লোকটাকে বলল, তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। নইলে আমি পুলিশ ডাকব।

খ্যাক খ্যাক হেসে উঠল লোকটা। কীভাবে ডাকবে, খুকী? ফোনের লাইন কেটে দিয়েছি। শোনো, ফ্যাচফ্যাচ কোরো না। আমার কিছু টাকা দরকার। দিয়ে দাও। সুবোধ বালকের মত চলে যাব।

শিরদাঁড়া টানটান করে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল রোজমেরী। তুমি খামোকাই তর্ক করছ। আজকাল বাড়িতে কেউ টাকা-পয়সা রাখে না-লোকে চেক ব্যবহার করে।

মিসেস হার্টের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচালো লোকটা। খুব চালাক মেয়ে বানিয়েছেন তো!

রোজমেরী মার দিকে তাকাল। বসে আছেন তিনি চেয়ারে, ভয়ে সাদা মুখ।

ভয় পেয়ো না, মাম্মি, শান্ত গলায় বলল সে। ড্যাডি এক্ষুনি চলে আসবে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল লোকটা। তুমি সত্যি খুব চালাক, রোজী। তোমার বাবা মারা গেছে অনেক আগে, সে কথা জানি না ভেবেছ? সব খবর নিয়েই এসেছি।

হঠাৎ চেহারা বদলে গেল লোকটার, থমথমে হয়ে উঠল। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, বেশ বুঝতে পারছি, হিসহিস করে বলল সে। দেখাচ্ছি মজা!

এক লাফে পৌঁছে গেল মিসেস হার্টের পেছনে, পেছন দিয়ে চেপে ধরল গলা। রোজমেরী স্থির দাঁড়িয়ে রইল, আপনা আপনি শক্ত হয়ে গেল মুঠো। লোকটাকে থামাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে? আগে তোমার মাকে শেষ করব তারপর তোমাকে, বিছু মেয়ে, শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করছে সে, মিসেস হার্টের গলায় শক্ত আঙুলগুলো চেপে বসল।

গ্রেগরী, গ্রেগরী, ওকে থামাও। মৃগীরোগীর মত চেঁচিয়ে উঠল রোজমেরী।

হতভম্ব দেখাল লোকটাকে, মিসেস হার্টের গলা ছেড়ে দিল। কী বললে তুমি? খেঁকিয়ে উঠল সে। গ্রেগরী আবার কে?

রোজমেরীই প্রথমে দেখতে পেল গ্রেগরীকে। মার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরনে ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম, হাতে ব্যাটেল অভ ইঙ্কারম্যানের সেই ভারী তরবারি যা দিয়ে বহু শত্রু ঘায়েল করেছেন তিনি। ক্যাপ্টেনকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রোজমেরী, মা বা লোকটা কি দেখতে পাচ্ছে না?

শিউরে উঠলেন মিসেস হার্ট। খুব ঠাণ্ডা লাগছে। রোজমেরী বুঝতে পারল গ্রেগরীর উপস্থিতি টের পেয়েছেন মা। কিন্তু লোকটা? রোজমেরীর চিৎকার শুনেই কি সে ওভাবে দমে গেল?

হঠাৎ লোকটার গোটা শরীর ঝাঁকি খেল, হাত মুঠো করল সে, ঘন ঘন ঢোক গিলল, কাউকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। হঠাৎ দুলে উঠল শরীর, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।– ওহ্, মাই গড, আমার হার্ট, গুঙিয়ে উঠল সে। আমার বোধহয় হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে।

মুখ আর শরীর কুঁকড়ে গেল তার, অনবরত গোঙাচ্ছে, চাপ দিয়ে ধরছে বুক।

বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। মনে হচ্ছে কেউ আমাকে ছুরি মেরেছে। সিধে হলো সে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে, পরক্ষণে দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

.

কিছুক্ষণ পর পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স এল রোজমেরীদের বাড়িতে, শয়তান লোকটার লাশ নিয়ে গেল। হৈ চৈ কমলে দোতলায় উঠে এল রোজমেরী, দাঁড়াল পোর্ট্রেটের সামনে।

ওহ্, গ্রেগরী, তুমি সত্যি দারুণ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। চোখে জল নিয়ে বলল ও। গ্রেগরী তাকিয়ে আছেন ওর দিকে, মুখে হাসি। চোখ মুছে রোজমেরীও হাসল। ফিসফিস করে বলল, ব্যাপারটা শুধু আমরা দুজনেই জানি, তাই না?

এমন সময় বাতাস এসে নাড়িয়ে দিল পর্দা। আর ছবিটি সত্যি সত্যি চোখ পিট পিট করে উঠল রোজমেরীর দিকে তাকিয়ে।

প্রেতচক্র

সীন নদীর উপরের সেতু পার হলো রাউল। মনটা খুশিতে ভরা, আপন মনে সে গানের কলি ভাঁজছিল। ফরাসী যুবক রাউল বয়সে তরুণ। ও দেখতে বেশ সুন্দর। সুন্দর মুখে ছোট সাইজের বাহারী কালো গোঁফটি চমৎকার মানিয়েছে। চাকরিটাও তার ভালো। রাউল একজন ইঞ্জিনীয়ার।

কারদোনে এল রাউল, ঢুকল সতেরো নম্বর বাড়িতে। পরিচারিক কেতামাফিক সুপ্রভাত জানাল বটে, কিন্তু জানাল অত্যন্ত বেজার মুখে। রাউল বোধ হয় সেটা লক্ষ্যই করল না। সে হাসিমুখেই প্রত্যুত্তর দিল।

রাউলের গন্তব্যস্থল চারতলার একটি ফ্ল্যাট। খুশি মনেই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দরজা খুলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল রাউল। গলায় আবার গানের সুরটা এসে গেল, গুন গুন করে একটা কলি গাইতে লাগল সে। আজ সকালে মনের মধ্যে যেন খুশির জোয়ার এসে গিয়েছে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলল- খুলে দিল একজন বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা, রাউলকে দেখে তার বলিরেখাঙ্কিত মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সুপ্রভাত, মঁশিয়ে মহিলা হাসিমুখে বলল।

সুপ্রভাত, এলিস হাসিমুখে রাউল উত্তর দিল।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করল এলিস, তারপর রাউলের দিকে তাকিয়ে বলল, বৈঠকখানায় একটু বসুন আপনি, আমি মাদামকে খবর দিচ্ছি। একটু পরেই তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

মাদাম কি ব্যস্ত? কি করছেন তিনি?

একটু বিশ্রাম করছেন, এলিস উত্তর দিল।

বিশ্রাম করছেন? এখন? একটু অবাক হয়েই রাউল প্রশ্ন করল, কেন মাদামের কি শরীর খারাপ হয়েছে?

খারাপ হবে না তো কি? এলিস একটু মুখঝামটা দিয়ে বলল।

ছোট বৈঠকখানার দরজা খুলে দিল এলিস তারপর রাউল সোফায় বসতেই আগের কথায় জের টেনে বলল, মাদামের শরীর তো খারাপ হবেই, এরকম বারবার চক্রে বসতে হলে কারো শরীর কি ভালো থাকে! আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছি। মাদাম দিন দিন কেমন রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছেন, ওর শরীরটা রক্তশূণ্য তাই বিছানায় শুয়ে থাকেন।

রাগ করছ কেন এলিস? ওর কাঁধে হাত দিয়ে মিষ্টি গলায় রাউল বলল, ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না, এর মধ্যে শয়তানের কোন ব্যাপারই নেই। অনর্থক শয়তান বোরাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?

রাউলের কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না এলিস। আপন মনে নিচু গলায় সে বলতে লাগল, এসব শয়তানী কাণ্ড-কারখানা আমার মোটেই পছন্দ হয় না, মাদামের শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন- দেখুন দিনের পর দিন কি হাল হচ্ছে। আমরা ইহজগতের মানুষ। পরলোকের আত্মাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি আমাদের? আমাদের এটুকু জানলেই হলো যে, ভালো আত্মারা স্বর্গে যান আর খারাপ আত্মাদের যেতে হয় নরকে। পাপীরা তাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি পায় নরকে।

পরলোক সম্পর্কে তোমার চিন্তা-ভাবনা দেখছি একেবারে জটিলতা মুক্ত। এ সম্পর্কে তোমার হিসেব-নিকেশও দেখছি খুবই সহজ।

আপনাদের বিয়ের পরে আর প্রেতাত্মা নিয়ে এসব চক্র-টক্র করবেন না তো, মঁশিয়ে? এলিস প্রশ্ন করল, তার কণ্ঠস্বরে অনুরোধের সুর।

আরে না, না, এলিসের দিকে তাকিয়ে রাউল হাসল।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি মাদামকে খুব ভালোবাস, তাই না এলিস?

হ্যাঁ, বৃদ্ধা অকপটে স্বীকার করল।

মাদামও তোমাকে খুব বিশ্বাস করেন?

আমার তো তা-ই মনে হয়।

চিন্তা করো না এলিস, বিয়েটা একবার হয়ে যাক, তারপর এসব প্রেতাত্মা আর পরলোকের কারবার একেবারে তুলে দেব, আমার স্ত্রীকে আর এসব অপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে দেব না। এ নিয়ে কোন ঝামেলায়ই পড়তে হবে না তাকে।

এলিসের মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ব্যগ্রভাবে সে বলল।

সত্যি?...সত্যি বলছেন মঁশিয়ে?

হ্যাঁ, গম্ভীরভাবে রাউল জবাব দিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল স্নেহময়ী এলিস, বৃদ্ধা পরিচারিকা সত্যি সত্যিই তার তরুণী মাদামকে ভালোবাসে।

চাপা গলায় রাউল বলতে লাগল, সত্যি, সিমোনের মধ্যে একটা অদ্ভুত-একটা আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। আর সে অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রয়োগ করেছে বারবার। কিন্তু আর নয়। এবার এ ব্যাপার ইতি টানা উচিত। আমি সিমোনকে ভালোবাসি। আমি কি আর ওর অবস্থা লক্ষ্য করিনি? তুমি মাদামকে ভালোবাস এলিস, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমার মাদাম যে দিন দিন রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছেন তা আমার নজর এড়ায়নি। সবই জানি আমি। জানি, একজন মিডিয়াম-এর দেহ এবং মনের উপর কি প্রচণ্ড চাপ পড়ে সেই দারুণ স্নায়বিক চাপ সহ্য করা খুবই শক্ত। কিন্তু এলিস, একটা কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। কথাটা হলো এই যে তোমার মাদাম প্যারিস শহরের সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াম। কিন্তু না, কেবল প্যারিস শহর নয়, সারা ফরাসী দেশে ক্ষমতার দিক দিয়ে মাদামের সমতুল্য মিডিয়াম আর নেই। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না এলিস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক তোমার মাদামের কাছে আসে। তাদের ধারণা এ মিডিয়ামের কাছে কোন ভণ্ডামি বা জালিয়াতি নেই। এখানে এলে তারা ঠকবেন না।

ঠকবে? মাদামের কাছে? তপ্তস্বরে এলিস বলল, আমার মাদামের মতো সৎ মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। উনি চেষ্টা করলেও কাউকে ঠকাতে পারবেন না এমনকী একটা হাবাগোবা বাচ্চাও ঠকবে না তার কাছে।

ঠিকই বলছ তুমি। এক এক সময় মনে হয় তোমার মাদাম যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়, ও যেন নেমে এসেছে স্বর্গের নন্দনকানন থেকে। মর্ত্যলোকে নিয়ে এসেছে স্বর্গলোকের অমৃত বার্তা।

এলিস খুশি নিয়ে তাকিয়ে রইল রাউলের দিকে।–আচ্ছা এলিস, তোমার মাদামকে তো আর মিডিয়ামের কাজ করতে হবে না; এরপর থেকে তো তিনি মনের সুখে ঘরকান্না করবেন। এ কথা শুনে তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছ?

এলিস হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। রাউল ভেবেছিল খবরটা শুনে বৃদ্ধা খুবই খুশি হবে। কিন্তু ও হঠাৎ গম্ভীর গেল কেন?

কি ব্যাপার, এলিস?

ভাবছি একটা কথা, গম্ভীর মুখে এলিস বলল।

কি কথা?

মঁশিয়ে, আপনি তো বলছেন মাদাম প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কাজ-কারবার ছেড়ে। দেবেন, কিন্তু প্রশ্ন হলো প্রেতাত্মারা যদি মাদামকে ছেড়ে না দেয়?

তার অর্থ?

প্রেতাত্মারা যদি না ছাড়ে?

কি বলতে চাইছ তুমি? একটু অসহিষ্ণু স্বরেই রাউল প্রশ্ন করল।

ব্যাপারটা কি জানেন মঁশিয়ে, পরলোকের বাসিন্দাদের নিয়ে বেশি কারবার করলে অনেক সময় তারা আর মিডিয়ামকে ছাড়তে চায় না। আমার ভয় তো সেখানে।

আমার ধারণা ছিল তোমার মধ্যে কোন কুসংস্কার নেই, রাউল বলল।

অহেতুক কুসংস্কার আমার মধ্যে নেই মঁশিয়ে, তবে...

তবে কি? তুমি বলতে চাইছ গুছিয়ে বল।

আমি যা বলতে চাই, তা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না সঁশিয়ে। আগে ভাবতাম মিডিয়ামরা হলো ধূর্ত এবং প্রতারক। প্রিয়জনের বিয়োগে ব্যথাতুর মানুষদের তারা নানা কৌশলে ঠকায়। কিন্তু মাদামকে দেখে বুঝেছি যে আমার ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। আমার মাদাম সহজ-সরল মানুষ, উনি অত্যন্ত সৎ।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, রাউল বলল।

চাপা গলায় শঙ্কা-বিহ্বল গলায় এলিক বলল, এখানে যা ঘটে তার মধ্যে কোন কৌশল বা চাতুরি নেই। যা দেখা যায় তা সত্যি সত্যিই ঘটে। আর... আর সে জন্যই আমার ভয় হয়... খুব ভয় হয়। মঁশিয়ে, এসব কাজ করা মোটেই উচিত নয়। এ জগৎ আর পর জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন প্রকৃতির বিধান নয়। আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করছি- কাজ করছি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই অস্বাভাবিক কাজের জন্য একদিন চরম মূল্য দিতেই হবে।

এলিসের দুকাঁধে হাত রেখে রাউল তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল। বলল, স্থির হও এলিস, কেন ঘাবড়ে যাচ্ছ? শোন, তোমাকে একটা সুসংবাদ দেই। আজকেই আমার শেষ প্রেত-বৈঠক। এরপর আর পরলোক বা ভূত প্রেত নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না।

আজকেও আবার একটা বৈঠক আছে? আতংকভরা গলায় এলিস প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, আর এটাই শেষ বৈঠক।

এলিস যে অসন্তুষ্ট হয়েছে, ওর মুখের ভাবে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু মাদাম বোধহয় আজ চক্রে বসতে পারবেন না।

কেন? রাউলের কণ্ঠে স্পষ্ট অসন্তোষের সুর।

মাদাম অসুস্থ, মাথার যন্ত্রণায় তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আজ চক্রে বসলে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

কিন্তু আমরা যে কথা দিয়েছি। শুধু তা-ই নয়, আগাম টাকা পর্যন্ত নিয়েছি।

তাতে কি, জানিয়ে দিন মিডিয়াম অসুস্থ। আজ তিনি চক্রে বসতে পারবেন না।

ওদের কথার মাঝখানে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক সুতনুকা নারী, দীর্ঘকায়া, গৌরবর্ণা, ক্ষীণদেহে কমনীয়তা আর লাবণ্যের অভাব নেই, মেয়েটির মুখখানা মহাশিল্পী বতিচেলির আঁকা ম্যাডোনার ছবির মত। রাউলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এলিস তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সিমোন! রাউলের কণ্ঠে আবেগ।

রাউল, প্রিয়তম।

নিজের দুহাত বাড়িয়ে রাউল সিমোনের দীর্ঘ শুভ্র হাত দুখানি ধরল। তারপর দুবার চুমু খেল সুন্দর হাত দুখানিতে। সুতনুকা নারী আবেগভরে মৃদুস্বরে বলতে লাগল, রাউল, প্রিয়...প্রিয়তম!

রাউল আবার ওর সাদা হাত দুটোতে চুম্বন করে ব্যগ্রভাবে তার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, সিমোন, তোমার চেহারাটা বড় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, এলিস বলল তোমার নাকি মাথায় যন্ত্রণা, বলল তুমি বিশ্রাম করছ। তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? তুমি কি অসুস্থ?

না না, ঠিক অসুস্থ নই, ইতস্তত গলায় সিমোন বলল।

সিমোনের হাত ধরে সোফার দিকে এগোল রাউল। ওকে সোফায় বসাল। নিজে বসল ওর পাশে, তারপর জিজ্ঞেস করল,

তাহলে বল কি হয়েছে তোমার?

রাউলের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল সিমোন, কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল, ওর দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে। তারপর নিচু গলায় দ্রুত বলে ফেলল,

আমি ভয় পেয়েছি...বড্ড ভয় পেয়েছি, রাউল।।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রাউল। ভাবল সিমোন হয়তো আরো কিছু বলবে। কিন্তু যখন দেখল মেয়েটি আর কিছু বলছে না তখন তাকে কিছুটা সাহস আর উৎসাহ দেবার জন্য বলল,

ভয়! কিসের জন্য ভয়? কাকে ভয়?

জানি না, তবে ভয় পেয়েছি।

কিন্তু কেন? বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে রাউল তাকাল সিমোনের দিকে।

রাউলের প্রশ্নের উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গেই। তার দিকে তাকিয়ে সিমোন বলল,

জানি তুমি অবাক হবে। কিন্তু আমি যে ভয় পেয়েছি তার মধ্যে একবিন্দু মিথ্যে নেই। কিসের ভয়... কেন ভয়... কাকে ভয় এসব আমি কিছু জানি না, সব সময়েই এক অজানা আতংক কালো মেঘের মত আমার মনের আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে। মনে হয় আমার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, তার উপর এই অজানা আতংক, রাউল, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল সিমোন। নরম হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে রাউল বলল, না ডার্লিং, এভাবে হাল ছাড়ছ কেন? এমন করে ভেঙে পড়লে তো চলবে না, তোমার কি হয়েছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। অতি পরিশ্রমের ফলেই এসেছে এই ক্লান্তি। মিডিয়ামের জীবনে এরকম ক্লান্তি আসতেই পারে। তোমার এখন যা দরকার তাহলো বিশ্রাম-পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আর সেই সঙ্গে চাই মানসিক শান্তি।

সিমোনের মুখে ফুটে উঠল কৃতজ্ঞতার ছাপ। রাউলের দিকে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ রাউল। এখন আমার দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর শান্তি।

চোখ বুজে রাউলের বাহুমূলে মাথা রাখল সিমোন। নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিল রাউলের হাতের ওপর। আমি তোমার উপর এমনি করে নির্ভর করতে চাই, একটুখানি সুখ চাই। আমার চাহিদাটা খুব বেশি নয় রাউল, অস্ফুটস্বরে সিমোন বলল।

তাকে আরও কাছে টেনে নিল রাউল, সিমোনের চোখ দুটি তখনও বন্ধ। তার বুক থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘনিঃশ্বাস। মৃদুকণ্ঠে সে বলল, রাউল, প্রিয়তম, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরলে আমি সবকথা ভুলে যাই। ভুলে যাই কি ধরনের জীবন আমাকে কাটাতে হচ্ছে। মিডিয়ামের জীবন বড় দুর্বিষহ-বড় ভয়ংকর। কিন্তু তোমার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লে এ শঙ্কাতুর জীবনের কথাও আমি ভুলে যাই। তখন নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমার মনে

আর কোন সংশয় থাকে না। তুমি তো অনেকেটাই জান রাউল, তবু বলব মিডিয়ামের জীবনের সবকিছু তুমি জানো না।

রাউলের মনে হলো তার আলিঙ্গনে বাঁধা সিমোনের শরীরটা যেন ক্রমেই শক্ত। হয়ে উঠছে, একটা আড়ষ্টতা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে তার সুন্দর দেহ-লতাটিকে।

চোখ খুলল সিমোন। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই সে বলতে লাগল।

ছোট একখানা অন্ধকার ঘর। তার মধ্যে আমি বসে থাকি। অপেক্ষা করি। আমার চারপাশে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। বড় ভয়ঙ্কর এই নিরন্ধ্র অন্ধকার। এ অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে কেবল শূন্যতা আর শূন্যতা। স্বেচ্ছায় এই অন্ধকার রাজ্যে নিজেকে ছেড়ে দিই। আমার চারপাশে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আরো ঘন হয়ে ওঠে। সেই অন্ধকারে অপেক্ষা করতে করতে আমার চেতনার উপরও ধীরে ধীরে নেমে আসে অন্ধকার। আমি অচেতন হয়ে পড়ি। তারপর যা ঘটে তার কিছুই জানতে পারি না আমি। আমার কোন অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে ফিরে আসে আমার চেতনা, মনে হয় দীর্ঘ ঘুমের পর আমি যেন জেগে উঠলাম, তারপর এক অপরিসীম ক্লান্তিতে আমার সমস্ত দেহ মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

জানি ডার্লিং, আমি জানি, নরম গলায় রাউল বলল।

সে যে কি ভয়ঙ্কর ক্লান্তি তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না,নিস্তেজ গলায় সিমোন বলল, একথা বলতে বলতে সিমোনের শরীরটা যেন আরো এলিয়ে পড়ল।

তোমার তুলনা নেই সিমোন, নিজের দুহাত দিয়ে সিমোনের হাত দুটো চেপে ধরে রাউল বলল, তুমি অনন্যা। তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াম। এ ব্যাপারে তোমার শ্রেষ্ঠতা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

একটু হেসে নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সিমোন।

তুমি মাথা নাড়লে কি হবে, আমি সত্যি কথাই বলছি। এই দেখ... পকেট থেকে দুখানা চিঠি বের করল রাউল, বলল, এই যে, এই চিঠিখানা এসেছে। অধ্যাপক রোশের কাছ থেকে আর এই চিঠিখানা লিখেছেন ডক্টর জেনির, দুজনে একই অনুরোধ করেছেন।

কি অনুরোধ? ভীরু গলায় সিমোন জিজ্ঞেস করল।

দুজনেই অনুরোধ করেছেন তুমি যেন মাঝে মাঝে মিডিয়াম হিসেবে তাদের প্রেত-চক্রে অংশগ্রহণ করো।

না-না-না-মোটেই না! সোফা ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল সিমোন, কক্ষনো করব না ও কাজ। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। এবার এ কাজে ইতি টানব। তুমি... তুমি... নিজেও তো আমায় কথা দিয়েছ। রাউল।

অবাক হয়ে সিমোনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাউল। ভয়ে, উত্তেজনায় সিমোন কাঁপছে। ওকে দেখাচ্ছে কোণঠাসা প্রাণীর মত। সোফা থেকে উঠে ওর হাত ধরল রাউল, যেন সাহস দিতে চাইল ওকে। তারপর আশ্বস্ত করবার সুরে বলল, হ্যাঁ, ও সব প্রেত-চক্রের ব্যাপার-স্যাপার তো শেষই হয়ে গিয়েছে। তোমাকে নিয়ে আমার খুব অহংকার সিমোন, তাই চিঠি দুটো দেখালাম।

সন্দেহের দৃষ্টিতে রাউলের দিকে তাকাল সিমোন, বলল, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে তুমি আর কখনও আমাকে প্রেত-চক্রে বসতে বলবে না।

না না, রাউল আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলল, তবে...

তবে কী? রাউলের তার বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই সিমোন প্রশ্ন করল।

মানে...এসব বিখ্যাত লোকদের জন্য তুমি যদি স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে বসতে রাজী হও তবে।

না না, মোটেই না। আর কখনও চক্রে বসব না আমি, উত্তেজিতভাবে রাউলকে বাধা দিল সিমোন, চক্রে বসার মধ্যে বিপদ আছে। সে বিপদ বড় ভয়ঙ্কর।

দুহাতে নিজের কপাল টিপে ধরল সিমোন, দাঁড়াল গিয়ে জানালার কাছে। রাউলের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, কথা দাও, আর কখনও আমাকে চক্রে বসতে বলবে না।

রাউল এগিয়ে গেল ওর দিকে। সিমোনের দুকাঁধের উপর নিজের হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, সিমোন, ডার্লিং। কথা দিচ্ছি আজ রাতের পর আর কোনদিন তোমায় প্রেত-চক্রে বসতে বলব না।

চমকে উঠল সিমোন। রাউল পরিষ্কার বুঝতে পারল ওর চমকানি।

আজ! ভীরু গলায় সিমোন বলল, হ্যাঁ, আজকেই তো মাদাম একস্-এর আসবার কথা। আমি তো একদম ভুলেই গিয়েছিলাম তার কথা।

ঘড়ির দিকে তাকাল রাউল। বলল, মাদাম একস-এর আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে তিনি এসে যাবেন। কিন্তু সিমোন, তোমার শরীর যদি সুস্থ না থাকে...

রাউলের কথা যেন শুনতেই পেল না সিমোন। সে নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়েছে।

মাদাম একস্! সত্যি বলছি রাউল, খুব অদ্ভুত এক মহিলা উনি। ওকে দেখলে আমার বড় ভয় হয়।

সিমোন।

রাউলের গলায় ভৎর্সনার সুর বেজে উঠল। সে সুরটা ধরতে পারল সিমোন। রাউলের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, জানি রাউল, তুমি অন্য ফরাসীদের মত। তোমার কাছে মা হলো অত্যন্ত পবিত্র। সন্তানহারা শোকাকুলা মা সম্পর্কে এরকম ধারণা পোষণ করা যে উচিত নয় তা আমি ভালো করেই জানি। এটা আমার নির্বুদ্ধিতা, নিষ্ঠুরতাও বলতে পার। কিন্তু রাউল... আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না... ভদ্রমহিলা এত মোটা... ওঁর গায়ের রঙটা কেমন অদ্ভুত রকমের তামাটে। তার উপর আবার মহিলার হাত দুখানা... হাত দুটো লক্ষ্য করে দেখেছ? কি বিরাট... কি বলিষ্ঠ হাত দুখানা! ঠিক যেন পুরুষের হাত! উঃ কি ভয়ানক!

কেঁপে উঠল সিমোন। চোখ বুজল। কাঁধের উপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল রাউল তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সিমোন।

কেন?

আচ্ছা, তুমি তো একটা মেয়ে, আর অপর একজন নারীর প্রতি তোমার সহানুভূতি এবং সমবেদনা থাকা উচিত। ভদ্রমহিলা সদ্য সন্তানহারা হয়েছেন। মেয়েটি ছিল ওর একমাত্র সন্তান। সন্তানহারা শোকাকুলা মায়ের উপর তোমার দয়া হয় না? হওয়া উচিত।

অস্থির হয়ে উঠল সিমোন। তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না রাউল। মনের এই অনুভূতি কারো চাওয়া-না-চাওয়ার উপর নির্ভর করে না। মাদাম একস্‌কে যখন প্রথম দেখলাম তখনই এ আতংকের অনুভূতি আমার মনকে গ্রাস করে ফেলেছে।

তোমার ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, রাউল বোঝাবার চেষ্টা করল।

অস্থিরভাবে নিজের হাত সরিয়ে দিল সিমোন, উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল, তোমাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না রাউল। তুমি বুঝতেই চাইছ না, মাদাম একস্‌-কে দেখলে আমি আঁতকে উঠি। দারুণ ভয়ে আমার মনটা কুঁকড়ে যায়। তোমার বোধহয় মনে আছে তার হয়ে প্রেত-চক্রে বসতে আমি দ্বিধা করছিলাম-রাজী হয়েছিলাম অনেক পরে। আমার ধারণা হয়েছিল, তার জন্য আমার ভয়ঙ্কর কোন অমঙ্গল হবে। যেমন করেই হোক তিনি জীবনে মহাবিপদকে আহ্বান করে আনছেন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাউল বলল, আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল ঠিক উল্টো। মাদাম একস্‌-এর জন্য তুমি যে কটা প্রেত-চক্রে বসেছ তার সবকটিই খুব সফল হয়েছে। ছোট্ট অ্যামেলির বিদেহী আত্মা খুব সহজেই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। মৃত

অ্যামেলির দেহধারণগুলো হয়েছিল অতি চমৎকার। শেষ বৈঠকের সময় যদি অধ্যাপক রোশ উপস্থিত থাকতেন তবে খুব ভালো হত।

দেহধারণের কথা বলছ, গলায় স্বর নামিয়ে সিমোন বলল, ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বল, রাউল। তুমি তো জান, আমি যখন আবিষ্ট অবস্থায় থাকি তখন বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন থাকি। এই রূপধারণের ব্যাপারগুলো কি সত্যি ঘটে?

হ্যাঁ।

খুব সুন্দর হয়?

সিমোন আবার জিজ্ঞেস করল।

বিপুল উৎসাহে ঘাড় নাড়ল রাউল। বলল, প্রথমে দিকের কয়েকটা প্রেত-চক্রে অ্যামেলিয়াকে দেখা যাচ্ছিল একটা অস্পষ্ট কুয়াশার বৃত্তের মধ্যে। তাকে ঠিক পরিস্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু শেষবারে যা হলো তা একেবারে অকল্পনীয়।

কি হলো শেষবারে? সিমোনের স্বরে একই সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল। ধীর গলায় রাউল বলল, শেষবারে বাচ্চাটা একেবারে রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে এসেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল শিশুটি যেন সত্যিই জীবন্ত! আমি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে দেখেছিলাম। কিন্তু

দেখলাম তাতে তোমার খুব কষ্ট হয়। মাদাম এক-ও বাচ্চাকে স্পর্শ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি তাকে স্পর্শ করতে দেইনি, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে প্রয়াত সন্তানকে স্পর্শ করার সুযোগ পেলে সন্তানহারা জননীর ধৈর্যের বাধ হয়তো ভেঙ্গে যেতে পারে। তার ফলে নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো তিনি তোমার কোন মারাত্মক ক্ষতি করে ফেলতে পারেন।

জানালার দিকে মুখ ফেরালো সিমোন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর নিস্তেজ গলায় বলল,

যখন জ্ঞান হলো তখন আমি বড় ক্লান্ত। দেহ-মনে তখন আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিন্তু রাউল, এসব কাজ কি ঠিক হচ্ছে? আমরা কোন অন্যায় কাজ করছি না তো? এলিস কি বলে জান?

কি বলে?

ও বলে আমরা নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শয়তানের সঙ্গে কাজ-কারবার করছি।

সিমোন হাসল। কিন্তু কেন যে হাসল তা সে নিজেই জানে না।

আমি কি বিশ্বাস করি জানো? গম্ভীরভাবে রাউল বলল, অজানাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার মধ্যে সব সময়েই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কাজের পিছনের উদ্দেশ্যটা যদি ভালো হয় তবে বিজ্ঞানের স্বার্থে এটুকু বিপদের ঝুঁকি নেওয়াটা আমি সঙ্গত বলেই মনে করি। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য-বিজ্ঞানের স্বার্থে বহু লোক জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণ দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে এটা চলে আসছে। এক যুগের মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছে পরের যুগের মানুষদের। তুমি যে প্রেত-চক্রে বসছ, তা বিজ্ঞানের জন্যই বসেছ। জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবার কাজে তোমার প্রচুর অবদান রয়েছে। দীর্ঘদিন এ কাজ করবার ফলে আজ তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ, এবার তোমার কাজের ইতি টানা হবে। আজকেই তোমার শেষ প্রেত-চক্র। এরপর থেকে শুরু হবে তোমার জীবন।

একটানা এতক্ষণ কথা বলে রাউল থামল।

রাউলের দিকে তাকাল সিমোন। একটুখানি হাসল, স্নেহের হাসি বলেই মনে হলো তার, এতক্ষণে তার উত্তেজনা বোধহয় কেটে গিয়েছে। ফিরে এসেছে। আগেকার স্বাভাবিক স্থিরতা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিস্তেজ গলায় সে বলল, মাদাম একস্-এর আসবার সময় পার হয়ে গিয়েছে। উনি তো দেরি করেন না। হয়তো আজকে আর আসবেনই না উনি।

আমার কিন্তু মনে হয় উনি ঠিকই এসে যাবেন। তোমার ঘড়িটা বোধহয় ঠিক সময় দিচ্ছে না, হয়তো সঠিক সময় থেকে এগিয়ে রয়েছে।

ঘরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ছোটখাট জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে সিমোন বলল।

মাদাম একস্ কে? তার সত্যিকারের পরিচয় কি? কোথা থেকে এলেন তিনি? তিনি কোন্ দেশের-কোন্ জাতের? তার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব কে আছে?–এর একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারব না আমরা। আসলে তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমরা। একস্ তার আসল নাম হতে পারে না। তিনি আমাদের কাছে এসেছেন ছদ্ম পরিচয়ে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাউল বলল, এর মধ্যে আর অবাক হবার কি আছে? অনেক লোকই মিডিয়ামের কাছে আসল পরিচয় গোপন করেই আসে। সাবধানতার জন্যই এটা করা হয়।

বোধহয় তাই, নিরুত্তাপ গলায় সিমোন বলল। ওর হাতে ছিল একটা ছোট চীনেমাটির ফুলদানী। হঠাৎ সেটা পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চমকে সেদিকে ফিরে তাকাল সিমোন। তারপর রাউলের দিকে ফিরে বলল, দেখেছো আমার মধ্যে আর আমি নেই। আচ্ছা রাউল, আমি যদি মাদাম একৎসকে বলি যে, আজ চক্রে বসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে কি খুব অন্যায় কিছু হবে?

রাউলের মুখে ফুটে উঠল একই সঙ্গে বিস্ময় এবং বেদনাবোধ। তা দেখে সিমোনের মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

ধীর গলায় রাউল বলল, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে, সিমোন।

পিছিয়ে গেল সিমোন। তার পিঠ দেওয়াল স্পর্শ করল। আর্তকণ্ঠে সে বলল, এ কাজ থেকে আমাকে মুক্তি দাও রাউল। আমি আর পারছি না...সত্যিই পারছি না...।

রাউলের চোখে ফুটে উঠল নরম ভর্ৎসনার দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সামনে সিমোন আবার গুটিয়ে গেল।

রাউল বলতে লাগল, টাকার জন্য আমি মোটেই ভাবছি না, সিমোন। অবশ্য এই শেষ প্রেত-চক্রের জন্য মাদাম একস্ যে টাকাটা দিতে চাইছেন তার অঙ্কটা বিরাট।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সিমোন বলল, সবকিছু কি টাকা দিয়ে কেনা, যায় রাউল?

নিশ্চয়ই যায় না। এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু লক্ষ্মী সিমোন, একটা কথা ভেবে দেখ।

কি কথা?

মনে কর তুমি সত্যিই অসুস্থ নও। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোন ধনী মহিলার অনুরোধে চক্রে-বসা বা না-বসাটা সম্পূর্ণভাবে তোমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। ভেবে দেখ, মাদাম একস্ একজন মা। এই মা সদ্য তার একমাত্র সন্ত নিকে হারিয়েছেন। তিনি যদি শেষবারের মত তার সন্তানকে দেখতে চান, তুমি তাঁকে দেখার সুযোগ দেবে না? সন্তানহারা মাকে তুমি এটুকু দয়া দেখাবে না?

গম্ভীর হতাশায় সিমোন নিজের হাত ছুঁড়তে লাগল। ও যে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না।

একটু আত্মস্থ হয়ে নিস্তেজ গলায় ও বলল, তোমার কথায় বড় কষ্ট পাচ্ছি রাউল। হয়তো তুমি যা বলছ তা-ই ঠিক। তোমার কথামতই কাজ করব আমি। কিন্তু এবার বুঝেছি আমি ভয় পাচ্ছি কেন। আমার ভয়ের কারণ হলো ছোট্ট একটা শব্দ।-আর সেই শব্দটি হলো, মা।।

কি বলছ সিমোন!

ঠিকই বলছি। জানো রাউল, প্রকৃতির রাজ্যে কিছু আদিম মৌলিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। অবশ্য সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাদের অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাতৃত্ব-মায়ের প্রবৃত্তি কিন্তু আগের মতই রয়েছে। এ নষ্ট হয়ে যায়নি। এর রূপও পাল্টায়নি। এ ব্যাপারে পশু আর মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সন্তানের প্রতি

মায়ের ভালোবাসার কোন তুলনা নেই পৃথিবীতে। এ ভালোবাসাকে আইনের বাঁধনে বাঁধা যায় না। এ ভালোবাসা নির্ভয়ে যে কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে পারে। এই অন্ধ ভালোবাসা নিজের পথে দাঁড়ানো যে কোন বাধাকে নিমর্মভাবে-নৃশংসভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমার ভয় এই প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন মৌলিক প্রবৃত্তিটিকে।

একটানা এতক্ষণ কথা বলে সিমোন থামল। উত্তেজনা ও ক্লান্তিতে হাঁফাচ্ছে। রাউলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ও। তারপর বলল, আজ আমি নিতান্ত নির্বোধের মত কথা বলছি-আচরণ করছি, তাই না, রাউল?।

সস্নেহে সিমোনের হাত ধরে রাউল বলল, বুঝতে পেরেছি, তুমি খুব ক্লান্ত। যাও, যতক্ষণ মাদাম একস্ না আসেন, ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নাও। শোবার ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে থাক।

বেশ, রাউলের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সিমোন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিন্তায় ডুবে গেল রাউল। তারপর বসবার ঘরের দরজা খুলে চলে এল পাশের হলঘরে। ছোট হলঘরটা পার হয়ে এবার সে এল পাশের আর একখানা ঘরে। এ ঘরখানাও আগের ঘরখানারই মত। ঘরের একপ্রান্তে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র কুঠুরী। কুঠুরীর মধ্যে রয়েছে একখানা বড় হাতলওয়ালা বিরাট ইজিচেয়ার। কালো ভেলভেটের ভারী পর্দাগুলো এমনভাবে সাজানো যে ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে এই ছোট ঘরখানাকে ঢেকে ফেলে

দেওয়া যায়। আবার প্রয়োজন হলে পর্দার আবরণ সহজেই সরিয়ে ফেলে ছোট কুঠুরীখানাকে লোকচক্ষুর সামনে আনা যায়।

এলিস ঘর সাজাচ্ছিল। কুঠুরীর সামনে দুখানা চেয়ার আর একখানা গোল টেবিল। টেবিলের উপর একটা খঞ্জনি, একটা শিঙে, কয়েকখানা কাগজ আর পেন্সিল।

রাউলকে দেখে এলিস বলল, মঁশিয়ে, আজই কিন্তু শেষ প্রেত-চক্র। আজকের ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে রক্ষে পাই।

কলিংবেল-টা বেজে উঠল তীব্র তীক্ষ্মস্বরে।

যাও, দেখ গিয়ে কে এসেছেন। মনে হয় মাদাম একসই এসেছেন।

ঐ মহিলা তো গীর্জায় গিয়ে সন্তানের আত্মার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করতে পারেন। গম্ভীর গলায় অনুযোগের সুরে এলিসা বলল।

কলিংবেল-টা আবার আর্তনাদ করে উঠল।

যাও, দেখ গিয়ে কে এসেছেন, আদেশের সুরে রাউল বলল।

গজগজ করতে করতে এলিস চলে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এল। তার সঙ্গে একজন মহিলা। মহিলার দিকে তাকিয়ে এলিস বলল,

আপনি একটু বসুন মাদাম। আমার মাদামকে খবর দিচ্ছি যে আপনি এসেছেন।

মাদাম এক-এর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য রাউল এগিয়ে গেল। সিমোন ঠিকই বলেছে। বিরাট চেহারা ভদ্রমহিলার। যেমন লম্বা তেমনি মোেটা তার গায়ের রঙ অদ্ভুত রকমের তামাটে। হাত দুখানা সত্যিই পুরুষালি। ফরাসী দেশের প্রথা অনুযায়ী তার পরনে ফরাসী দেশের কালো পোশাক। মহিলার কণ্ঠস্বরও অত্যন্ত গম্ভীর।

আমার বোধ হয় আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, গমগমে গলায় মাদাম একস্ বললেন।

হাসিমুখে রাউল বলল, হ্যাঁ, দেরি হলো। তবে বেশি নয়, মাত্র কয়েক মিনিট।

মাদাম সিমোন কোথায়?

মাদাম সিমোনের শরীরটা সুস্থ নয়। তিনি শুয়ে আছেন, রাউল উত্তর দিল। করমর্দনের পর ভদ্রমহিলা হাত সরিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি শক্তভাবে রাউলের হাতটা চেপে ধরলেন। গম্ভীর অথচ তীক্ষ্মস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ও তাই বুঝি, তা মাদাম সিমোন আজ চক্রে বসতে পারবেন তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বসবেন, রাউল দ্রুত উত্তর দিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলা। তারপর মুখের কালো আবরণটার বাঁধন খুলতে খুলতে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আপন মনে নিচু গলায় তিনি বলতে লাগলেন, মঁশিয়ে রাউল, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এরকম প্রেত-চক্র আমার মনে কত আনন্দের সৃষ্টি করে। আমি অবাক হয়ে যাই। আমার একমাত্র সন্তান অ্যামেলি! সে আর আমার কাছে নেই। কিন্তু মাদাম সিমোন চক্রে বসলে আমি আমার ছোট্ট বাচ্চাকে দেখতে পাই... তার সঙ্গে কথা বলতে পারি... হয়তো সম্ভব হলে তাকে আমি স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারব।

দ্রুত কণ্ঠে রাউল বলল, না মাদাম একস, স্পর্শ করবার চেষ্টা মোটেই করবেন না। আমার নির্দেশ ছাড়া আপনি কোন কিছুই করতে পারবেন না। করলে সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে।

আমার বিপদ হবে?

না মাদাম, বিপদের সম্ভাবনা মিডিয়ামের। প্রেত-চক্রে বিদেহী আত্মার দেহধারণের সময় যা ঘটে বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। খুঁটিনাটি বা জটিলতার মধ্যে না গিয়ে

আমি সহজভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন।

বলুন, মাদাম একস্-এর স্বর গগ করে উঠল।

কোন বিদেহী আত্মা যদি স্থূলদেহ ধারণ করতে চায় তবে মিডিয়ামের দেহ থেকে তাকে দেহধারণের উপাদান গ্রহণ করতে হয়। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রেত-চক্রের সময় মিডিয়ামের মুখ থেকে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার মত বাষ্প বেরোয়। এই বাস্পই ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে প্রেতাত্মার নিখুঁত দেহের সৃষ্টি করে। মিডিয়ামের দেহ থেকে যে সূক্ষ্ম বাষ্প বেরিয়ে আসে তাকে বলে এক্টোপ্লাজম্। যারা প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তারা বলেন যে এই এক্টোপ্লজ মিডিয়ামেরই দেহের অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওজনের সাহায্যে এ জিনিসটা প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিপদের সম্ভানা রয়েছে। কারণ দেহধারী প্রেতাত্মাকে স্পর্শ করলেই মিডিয়ামের দেহে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। রূপধারী প্রেতাত্মাকে স্পর্শ করলে মিডিয়ামের ভয়ংকর বিপদ হতে পারে। এমনকি এক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাদাম একস্ শুনছিলেন রাউলের কথা।

রাউল আবার বলতে লাগল, তা হলেই বুঝতে পারছেন মাদাম, মিডিয়ামের গুরুত্ব কোথায়। মিডিয়ামের সাহায্য ছাড়া বিদেহী আত্মা দেহধারণই করতে পারে না। মিডিয়াম

হলো ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে সংযোগের সেতু। যে কেউ চাইলেই মিডিয়াম হতে পারে না। কারণ সবার মধ্যে মিডিয়াম হবার প্রয়োজনীয় গুণগুলো নেই। দুএকজনের মধ্যে এ দুর্লভ ক্ষমতার স্ফুরণ হয়।

আশ্চর্য! আচ্ছা মঁশিয়ে রাউল, এমন দিন কি আসবে না যখন এই দেহধারণের ব্যাপারটা উন্নতির এমন স্তরে পৌঁছবে যে দেহধারী আত্মা মিডিয়ামের দেহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে?

এ যে সাংঘাতিক কল্পনা, মাদাম।

হোক সাংঘাতিক, অসম্ভব তো নয়?

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্তত এখনও পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় এটা একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু আজকের কথাই তো শেষ কথা নয়, আজকে যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তা তো সম্ভব হয়ে উঠতে পারে?

এ কূট প্রশ্নের উত্তর আর রাউলকে দিতে হলো না। সিমোন ঘরে ঢুকল। ওকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিবর্ণ দেখাচ্ছে। তাহলেও ও যে অনেকটা সামলে উঠেছে তা। বেশ বোঝা যায়।

সিমোন এগিয়ে এসে মাদাম একস্-এর সঙ্গে করদর্মন করল। হাত মেলাবার সময় সে যে শিউরে উঠল তা লক্ষ্য করল রাউল।

শুনে দুঃখিত হলাম যে, আপনার শরীর নাকি ভালো নেই, মাদাম একস্ বললেন।

ঠিক আছে, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।

আজকে চক্রে বসতে পারবেন তো? মাদাম এক প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চয়ই পারব, একটু রুক্ষস্বরেই সিমোন বলল। ওর স্বরের রুক্ষতায় রাউল তো বটেই, মাদাম একস্ পর্যন্ত যেন চমকে উঠলেন।

দেরি করে লাভ কি, তাহলে কাজ শুরু করা যাক, একথা বলে সিমোন ঢুকে পড়ল ছোট কুঠরীখানার মধ্যে। বসল গিয়ে বড় হাতলওয়ালা ইজিচেয়ারখানায়।

আচমকা এক অজানা আতংকের তুহিন-শীতল স্রোত যেন বয়ে গেল রাউলের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে। আবেগের সঙ্গে সে বলল।

আজকে তোমার শরীরটা ভালো নেই, সিমোন। আজ প্রেত-চক্র বন্ধ থাক। আশা করি মাদাম একস্ কিছু মনে করবেন না।

একি কথা মঁশিয়ে! কুদ্ধস্বরে মাদাম একস্ বললেন।

ঠিকই বলছি আমি, রাউলও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, অসুস্থ শরীর নিয়ে আজ চক্রে না বসাই ভালো।

কিন্তু মঁশিয়ে, মাদাম সিমোন তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, আজ আমার জন্য শেষবারের মত উনি চক্রে বসবেন, মাদাম একস্-এর কণ্ঠ থেকে একই সঙ্গে ক্রোধ আর ঘৃণা ঝরে পড়ল।

ঠিক, আমি কথা দিয়েছি। আর সে কথার খেলাপও আমি করব না, ঠাণ্ডা গলায় সিমোন বলল।

এই তো চাই, কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে মাদাম একস্ বললেন। রাউলের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ধীরকণ্ঠে সিমোন বলল, ভয় পাচ্ছ কেন রাউল? ভয় পেয়ো না। আমি তো শেষবারের

মত প্রেত-চক্রে বসছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এই আমার শেষবারের মত কষ্ট পাওয়া। আর... আর কখনও এই অসহ্য কষ্ট পেতে হবে না আমাকে। এই শেষ... এই শেষ।

সিমোনের ইঙ্গিতে রাউল কুঠরীর কালো ভারী পর্দাটা টেনে দিল। তারপর জানালার পর্দাগুল টেনে দিতেই আধো আলো আধো ছায়ার পরিবেশ সৃষ্টি হলো ছোট ঘরখানার মধ্যে। মাদাম একৎসকে একখানা চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত করে রাউল অন্য চেয়ারখানায় বসল। মাদাম একস্ একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন। কথাটা।

আমাকে মাফ করবেন সঁশিয়ে, আমি আপনার বা মাদাম সিমোনের সতোকে অবিশ্বাস করছি না। জানি আপনার দুজনেই অত্যন্ত সৎ। আর এই প্রেত-চক্রের মধ্যেও কোন জালিয়াতি বা কারচুপি নেই। কিন্তু তবুও আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে হতে চাই আর তাই এই জিনিসটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

একথা বলে নিজের হাত-ব্যাগ থেকে একটা সরু শক্ত দড়ি বের করলেন মাদাম একস্।

মাদাম, রাউল চিৎকার করে উঠল, এ তো অপমান... ভীষণ অপমান!

না, এ হলো নিছক সাবধানতা, অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় মাদাম একস্ বললেন।

না না, এ হলো অপমান...মারাত্মক অপমান...আপনি আমাদের দুজনকেই অপমান করেছেন, উত্তেজিতভাবে রাউল চিৎকার করে উঠল।

মঁশিয়ে রাউল, আপনার আপত্তির কারণ তো আমি বুঝতে পারছি না, বিদ্রুপের সুরে মাদাম একস্ বললেন, আপনাদের চক্রে যদি কোন জালিয়াতি বা কারচুপি না থাকে তাহলে আপত্তি করছেন কেন? আপনাদের মধ্যে যদি কোন ছলনা থাকে তবে ভয় পাওয়ার তো কোন কারণ নেই।

দারুণ ঘৃণায় রাউলের মুখ বিকৃত হলো। তারপর একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। মাদাম একস্-এর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ-ভরা স্বরে সে বলতে লাগল,

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মাদাম একস্, এ ব্যাপারে আমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ভয় পাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই এখানে। বেশ তো, যদি আমার হাত পা দড়ি দিয়ে বাধলে খুশি হতে পারেন, তবে বাঁধুন।

রাউল ভেবেছিল এই বিদ্রুপের পর মাদাম একস্ আর বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাবেন না। কিন্তু তার ভাবনটা যে একেবারেই ভুল তা বোঝা গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

মাদাম একস্ অবিচলিত স্বরে বললেন, ধন্যবাদ সঁশিয়ে, তারপর দড়িটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন রাউলের দিকে।

আচম্বিতে পর্দার পিছন থেকে সিমোনের তীব্র তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর শোনা গেল,

না না রাউল, মাদাম একস্-এর অপমানকর প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হয়ে না। ব্যঙ্গের হাসি হেসে মাদাম একস্ বললেন, মাদাম সিমোন, আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি!

হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি ভয় পেয়েছি।

রাউল চিৎকার করে উঠল, কি বলছ, সিমোন? মাদাম এক ভাবছেন আমরা তাকে ঠকাতে যাচ্ছি। আমরা জালিয়াত- জোচ্চোর।

আমাকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে হবে, গম্ভীর গলায় মাদাম একস্ বললেন। তারপর রাউলকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধলেন খুব শক্ত করে।

বাঁধতে আপনি খুব ওস্তাদ, বিদ্রূপ-ভরা গলায় রাউল বলল। মাদাম এক এর বাধার কাজ শেষ হলো।

এবার খুশি হয়েছেন তো?

মাদাম একস্ কোন উত্তর দিলেন না। তিনি যেন রাউলের উপহাস গায়েই মাখলেন না। তিনি ঘরের দেওয়ালগুলি ভালো করে পরীক্ষা করলেন। হলঘরে যাবার দরজাটায় তালা লাগিয়ে চাবিটা খুলে নিলেন। চাবিটা রাখলেন নিজের কাছেই। তারপর এগিয়ে এসে বসলেন চেয়ারে।

হ্যাঁ, এবার আমি তৈরি। প্রেত-চক্র শুরু হোক, অদ্ভুত সুরে বললেন তিনি।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। পর্দার পিছনে সিমোনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমেই ভারী হয়ে উঠতে লাগল। একসময় সে শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। তারপর থেমে গেল। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। তারপর শোনা গেল একটা চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। একটু পরে তা-ও থেমে গেল। আবার নিস্তব্ধতা, আচমকা খঞ্জনির ঝনঝন আওয়াজে নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে শিঙে পড়ে গেল ঘরের মেঝেতে। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন ওটাকে ছুঁড়ে ফেলল। খল খল করে কে যেন হেসে উঠল, মহাবিদ্রুপের হাসি। কুঠরীর ভারী পর্দাটা একটু সরে গেল। দেখা গেল মিডিয়াম সিমোনকে। মিডিয়াম চেতনা হারিয়েছে, তার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর।

হঠাৎ মাদাম একস্ জোরে শ্বাস টানলেন। মিডিয়াম সিমোনোর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে হাল্কা কুয়াশা। মনে হচ্ছে যেন একটা সরু ফিতে বের হয়ে আসছে সিমোনের ঈষৎ উন্মুক্ত মুখ থেকে।

কুয়াশা ক্রমেই ঘন হতে লাগল। মিডিয়ামের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুকণা, কণাগুলো অতিসূক্ষ্ম। কণাগুলির মধ্যে একটা আলোড়ন উঠেছে। সূক্ষ্মকণাগুলো জমাট বাঁধছে-ঘনীভূত হচ্ছে। আকার নিচ্ছে। সে আকার একটা শিশুর... একটি বাচ্চা মেয়ের।

অ্যামেলি... আমার ছোট্ট অ্যামেলি... আমার বাচ্চা আসছে আমার সামনে।

মাদাম একস্ বলে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ফিসফিসে হলেও তীক্ষ্ণ।

অস্পষ্ট মূর্তিটা ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে রইল রাউল। এমন নিখুঁত দেহধারণ এর আগে কখনই দেখেনি সে।

সত্যিকারের রক্ত-মাংসে গড়া একটা জীবন্ত শিশু যেন এসে দাঁড়িয়েছে ঐ ছোট্ট কুঠরীখানার প্রবেশপথে।

মা...মামণি, শিশুর মত কচি গলার ডাক শোনা গেল।

আমার মেয়ে...আমার অ্যামেলি সোনা... চিৎকার করে বলতে বলতে উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে অর্ধেকটা উঠে পড়লেন মাদাম একসা।।

সাবধান মাদাম, অত উত্তেজিত হবেন না, রাউল চেঁচিয়ে উঠে সতর্ক করল। ইতস্তত করতে করতে বাচ্চা মেয়েটি এগিয়ে আসতে লাগল সামনের দিকে। দুখানি ছোট হাত সামনে বাড়িয়ে ছোট্ট অ্যামেলি আবার ডাকল, মা...মামণি...।

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মাদামের গলা থেকে এক অদ্ভুত স্বর বেরিয়ে এল। তিনি আবার উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল রাউল, একি করছেন মাদাম? বসুন, বসে পড়ন, নইলে মিডিয়ামের...। রাউলের কথায় কান না দিয়ে মাদাম এক তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, আমার একমাত্র সন্তান অ্যামেলি- ওকে আমি ধরব... ওকে আমি বুকে নেব...

পাগলের মত সামনের দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন মাদাম একস্।

ঈশ্বরের দিব্যি! নিজেকে সংযত করুন মাদাম। নিজের চেয়ারে বসুন। বসে পড়ন এক্ষুণি।

রাউল খুব ভয় পেয়েছে।

আমার বাচ্চা! আমি ওকে ধরবই। আমি ওকে কোলে নেবই। কেউ আমকে ঠেকাতে পারবে না।

সাবধান মাদাম! আমি আদেশ করছি, আপনি বসে পড়ন। আর একটি পা-ও এগোবেন না।

বাঁধনের মধ্যে রাউলের শরীরটা ছটফট করতে লাগল। বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মাদাম এক তার কাজটি বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছেন।

আসন্ন বিপদের চিন্তায় রাউলের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। আর্তকণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল, ঈশ্বরের দিব্যি! দয়া করে বসে পড়ন... বসে পড়ন দয়া করে। মিডিয়ামের কথাটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন... দয়া করে তার কথাটা মনে রাখুন।

মাদাম একস্ যেন শুনতেই পাননি রাউলের কথা। এক অদ্ভুত আনন্দ আর উন্মাদনার ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডলে। বাচ্চা মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছিল পর্দার ফাঁকে। মাদাম এক হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়াম সিমোনের মুখ থেকে বেরিয়ে এক তীব্র আর্তনাদ। অসহ্য যন্ত্রণায় যেন কষ্ট পাচ্ছে মিডিয়াম।

-হাঁ ঈশ্বর! এ কি সাংঘাতিক ব্যাপার! এ যে সহ্য করা যায় না, মিডিয়াম যে... রুক্ষ গলায় হেসে উঠে মাদাম একস্ বললেন, মঁশিয়ে রাউল, আপনার মিডিয়ামের জন্য আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি কেবল আমার হারানো মেয়েকে ফিরে পেতে চাই।

-আপনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন, মাদাম। ঐ শিশু এ জগতের নয়। ওকে আর স্পর্শ করবেন না।

-স্পর্শ করব না মানে? ওকে যে আমার চাই। আমার দেহের মধ্যে ও তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। আমার কাছ থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছিল বাছা। কিন্তু মৃতের রাজ্য থেকে আমার অ্যামেলি সোনা আবার ফিরে এসেছে আমারই কাছে। ও তো মরে যায়নি... ও বেঁচে আছে। আয়.. আমার সোনা আমার কোলে আয়।

রাউল আবার চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু অপরিসীম আতংকে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। একটি শব্দও বেরোল না তার মুখ থেকে।

মাদাম এক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীর সমস্ত নির্দয়তা, নির্মমতা, আদিম অসভ্যতা যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠছে তার মধ্যে। অন্যের কথা ভাববার মত মানসিকতা আর তার মধ্যে নেই। নিজের অন্ধ আবেগেই তিনি মত্ত।

শিশু অ্যামেলির দুঠোঁট ফাঁক হলো। তৃতীয়বারের মত শোনা গেল কচি গলার ডাক, মা... মামণি!

-ও আমার সোনা... ও আমার মণি... কে বলে তুই মরে গিয়েছিস! ...আয় আয় আমার কোলে আয়... আমার ভাঙা বুকখানাকে জুড়ে দে...

উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন মাদাম একস্। পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে এল অসহ্য যন্ত্রণার এক দীর্ঘায়িত আর্তনাদ।

-সিমোন...সিমোন। রাউল চিৎকার করে উঠল। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে রাউল দেখল শিশুটিকে কোলে নিয়ে মাদাম একস্ দ্রুত চলে গেলেন তার পাশ দিয়ে। তালা খুলবার শব্দ শোনা গেল। তারপর শোনা গেল সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ। দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন মাদাম একস্।

পর্দার ওপাশ থেকে তখনও ভেসে আসছে আর্তনাদ। অসহ্য যন্ত্রণা ছাড়া এরকম আর্তনাদ কেউ করে না। এরকম আর্ত বিলাপ-ধ্বনি রাউল তাঁর জীবনে কোনদিন শোনেনি। আর্তনাদ ক্রমে মিলিয়ে গেল। শোনা গেল একটা বিশ্রী-বীভৎস ঘড় ঘড় শব্দ। তারপর ধপাস করে একটি শব্দ শোনা গেল। শব্দটা দেহপতনের।

উন্মাদের মত দেহের বাঁধন খুলবার চেষ্টা করতে লাগল রাউল। শেষ পর্যন্ত তার উন্মত্ত চেষ্টার কাছে মাদাম একস্-এর কঠিন বাঁধনও হার স্বীকার করতে বাধ্য। হলো। অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল রাউল। সে শক্ত বাঁধন থেকে মুক্ত হলো।

রাউল উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এলিস ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে চিৎকার করে উঠল, মাদাম!... মাদাম! গলা চিরে, সিমোন! ডাকটা বেরিয়ে এল রাউলের।

দুজনে ছুটে গেল কালো পর্দাটার দিকে। একটানে সরিয়ে দিল পর্দাটা।

আর তক্ষুণি চমকে গিয়ে পিছিয়ে এল রাউল। উদ্ভ্রান্তভাবে সে বলে উঠল, হায় ঈশ্বর! রক্ত, এত রক্ত! জায়গাটা যে লালে লাল হয়ে গিয়েছে।

রাউলের পাশে শোনা গেল এলিসের রুক্ষ কণ্ঠস্বর। সে স্বর ভয়ে, বিস্ময়ে এবং উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার মাদামকে জীবনটাই দিতে হলো! কিন্তু মঁশিয়ে রাউল, সত্যি করে বলুন কি হয়েছে? কি করে মাদাম একটুকুন হয়ে গেলেন। তার দেহটা যে ছোট হয়ে গিয়েছে-অর্ধেকেরও বেশি ছোট হয়ে গিয়েছে। এ কি করে হলো? কি কাণ্ড হচ্ছিল এখানে। বলুন মঁশিয়ে... বলুন... বলুন।

জানি না! রাউল উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল আমি জানি না।...আমি কিছু জানি না। একি হলো। এ আমি কি করলাম... ওই...। মৃত্যুপুরীর বাসিন্দাকে জীবনলোকে নিয়ে এসে সিমোন নিজেই যে মৃত্যুপুরীতে চলে গেল! আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না এলিস। আমি জানি না... কিছু জানি না... সিমোন! সিমোন!

প্রেতিনী

আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন ওখানে যেতে চাইছ না, বলল সোহানা রহমান। আমি সত্যি বুঝতে পারছি না।

আমরা ডিজনিওয়ার্ল্ডে যাব, বলল স্টিভ অস্টিন। ওখানে অনেক মজা আছে।

জাহান্নামে যাক ডিজনিওয়ার্ল্ড, মুখ ঝাঁপটে উঠল সোহানা। আমি ডিজনিওয়ার্ল্ডে বহুবার গেছি। আমি লেক দেখতে যাব।

না, সোহানা।

কেন নয়?

এখন ওখানে অনেক ঠাণ্ডা।

গরমের সময় যেতে চাইলাম, বললে এখন ওখানে খুব গরম।

শ্রাগ করল স্টিভ। আমি ও বাড়ি বিক্রি করে দেব। দালালের সঙ্গে কথাও বলেছি।

তোমার বাবা ওই বাড়িতে মারা গেছেন, ডায়মণ্ড লেকের তীরে চমৎকার একটি বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। আর তুমি ওটা আমাকে দেখতে পর্যন্ত দিতে চাইছ না!

ওখানে দেখার আছেটা কী! একটা লেক। কিছু জঙ্গল। আর কুৎসিত চেহারার ছোট একটি কেবিন।

অ্যালবামে ওই বাড়ির ছবি তুমি আমাকে দেখিয়েছ। ছবিতে তোমাকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। বোঝাই যায় কৈশোরের দিনগুলো চমৎকার কেটেছে তোমার ও বাড়িতে।

আমার কৈশোর খুব একটা ভালো কাটেনি ও বাড়িতে, অন্ধকার ঘনাল স্টিভের চেহারায়। আমি ওখানে যাব না।

ঠিক আছে, স্টিভ, বলল সোহানা। তুমি ডিজনিওয়ার্ল্ডে ছুটি কাটাতে যাওগে। আমি ডায়মণ্ড লেকে বেরিয়ে আসব।

সোহানার জন্ম বাংলাদেশে। তবে এইচ.এস.সি পাশের পরে তাকে ইউএসএ পাঠিয়ে দেয়া হয়। পড়াশোনার জন্য। ওর বাবা আজাদ রহমান জাতীয় সংসদের একজন প্রভাবশালী সদস্য। মা সমাজকর্মী। স্টিভের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে সোহানা। পড়তে পড়তে ভালো লাগা। প্রেম থেকে

পরিণয়। স্টিভ একটি ল ফার্মে চাকরি করে। সোহানা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। দুজনে মিলে দুহপ্তার ছুটি কাটাতে বেরিয়েছে।

তুমি মাঝে মাঝে এমন অযৌক্তিক সব দাবি করে বস। বিরক্ত হলো স্টিভ।

মোটেই না, বলল সোহানা। আমি যা করতে চাইছি তা অযৌক্তিক কিছু নয়। ডায়মণ্ড লেকে তোমার বাবার একটা কেবিন আছে। আমি সেখানে ছুটিটা কাটাতে চাইছি। কিন্তু আমি যখন বলেছি যাব। যাবই। তুমি গেলে যাবে না গেলে নাই।

ঠিক আছে। তুমিই জিতলে, চেহারা বাংলা পাঁচের মত হয়ে আছে স্টিভের তুমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছ যাবে। আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

গুড, বলল সোহানা। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলছি। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব।

.

গন্তব্যে পৌঁছুতে প্রায় সারাটা দিন লেগে গেল ওদের। ইন্টারস্টেট ছেড়ে পাহাড়ি রাস্তায় ঢুকে পড়ল। মসৃণ, ঝকমকে রাস্তা। স্টিভ যখন ছোট ছিল ওই সময়ই চওড়া করা হয় হাইওয়ে। ওর বাবা যখন লেকের তীরে জমি কিনে কেবিন বানান, ওই সময় দুই লেনের রাস্তাটি ছিল আঁকাবাঁকা এবং বিপজ্জনক। কৈশোরে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু ক্রেস্ট লাইন

পাহাড়কে মনে হত আকাশ ছুঁয়েছে। এখন নতুন কেনা ক্রাইসলার ইমপেরিয়াল সাবলীলগতিতে পাহাড় বেয়ে চুড়োয় উঠে যাচ্ছে।

এই প্রথম ডায়মণ্ড লেকে যাচ্ছি, বলল সোহানা, আমাদের সেলিব্রেট করা উচিত। ঘন জঙ্গলে এলাকা দিয়ে ছুটছে গাড়ি। শ্যাম্পেন লাগবে আমার। লেকের আশপাশে শপিং সেন্টার নেই?

গ্রামে আছে, বলল স্টিভ, নার্ভাসভঙ্গিতে চেপে ধরে আছে হুইল। এ কদিন ভালোই কেটেছে দিন, কিন্তু এখানে আসার পরে... গায়ে একটি জেনারেল স্টোর আছে।

তোমার কী হয়েছে? জিজ্ঞেস করল সোহানা, এরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন চেহারা? আমি গাড়ি চালাব?

আমার কিছু হয়নি, জবাব দিল স্টিভ।

কিন্তু মিথ্যা বলেছে ও। ও ঠিক নেই।

এখানে ফিরে আসা উচিত হয়নি। মোটেই উচিত হয়নি।

এক গভীর অন্ধকার অপেক্ষা করছে ডায়মণ্ড লেকে।

.

গ্রামটির খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। শুধু বাক্স আকারের একটি মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল গড়ে উঠেছে, সঙ্গে স্পোর্টস ক্লদিং স্টোর এবং নতুন একটি গিফট শপ।

সোহানা ওয়েডস জেনারেল স্টোর থেকে এক কেজি গরুর মাংস আর এক বোতল শ্যাম্পেন কিনল। বুড়ো ওয়েড মারা গেছে বহুদিন, তার ছেলে এখন দোকান চালায়। বাপের সঙ্গে ছেলের চেহারায় অনেক মিল; এমন কী ছেলে বাপের মতই তারের চশমা পরে চোখে। আর চশমাটি ঝুলে থাকে নাকের ডগায়।

অনেকদিন পরে এলে, বলল সে স্টিভকে।

হু... অনেকদিন পর।

স্টিভ গাড়ি নিয়ে কেবিনের পথ ধরেছে, সোহানা বলল স্টিভ বুড়োর ছেলের সঙ্গে অমন শীতল ব্যবহার না করলেও পারত।

তাহলে কী করতে বলো আমাকে? ওর হাতে চুমু খাব?

অন্তত হাসিমুখে কথা বললেই পারতে। লোকটা তো তোমাকে হাসি মুখেই হ্যালো বলল।

আমার হাসি আসেনি।

এমন শক্ত হয়ে আছ কেন? একটু রিল্যাক্স করো না। বলল সোহানা। খোদা, কী সুন্দর!

ওদেরকে ঘিরে আছে ঘন পাইনের সারি, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে চমকাচ্ছে সবুজ তৃণভূমি, চকচকে গ্রানিট, যেন রঙের সাগরে কালো দাগ।

এখানে কী ধরনের ফুল জন্মায়, জানো?

বাবা এসব খবর রাখতেন, বলল স্টিভ। এদিকে আছে পপিন, আইরিশ, বাগল ফ্লাওয়ার, কম্বাইন... বাবা ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। বুনো প্রকৃতির রঙিন ছবি তুলতেন। বিশেষ করে পাখির ছবি। লাল ঝুঁটিঅলা কাঠঠোকরার ছবি তুলতে খুব ভালোবাসতেন তিনি।

তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বেরুতে না?

মাঝে মাঝে। বেশির ভাগ সময় মা-ই সঙ্গে যেত। শুধু বাবা আর মা। আমি তখন লেকে সাঁতার কাটতাম। বাবা জঙ্গল দারুণ পছন্দ করতেন। তবে মা মারা যাওয়ার পরে মাত্র

দুবার এসেছি এখানে। চোদ্দ বছর বয়স যখন আমার, তারপর থেকে বাবার সঙ্গে আর আসা হয়নি। বাবাকে বাড়িটি বিক্রি করে দেয়ার জন্য। অনেকবার বলেছি। তিনি কানেই তোলেননি আমার কথা।

ভালোই করেছেন। তোমার কথা শুনলে আর এদিকে আসা হত না।

বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলে বেঁচে যাই। গম্ভীর গলায় বলল স্টিভ।

কেন? স্বামীর দিকে ফিরল সোহানা। এ জায়গাটির প্রতি তোমার এত বিতৃষ্ণা কেন?

জবাব দিল না স্টিভ। ওরা লারসনের পুরানো মিল হুইল পাশ কাটাল। পনেরো বছর পরে আবার ডায়মণ্ড লেক ভেসে উঠল স্টিভের চোখের সামনে-গাছের ফাঁকে ঝিলিক দিল যেন রোদে ঝলসানো ইস্পাত। স্টিভের শিরদাঁড়া বেয়ে নামল বরফ জল। চোখ পিটপিট করছে ও। শুনতে পাচ্ছে দিড়িম দিড়িম ঢাকের বাজনা বাজাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

ওর এখানে আসা মোটেই ঠিক হয়নি।

.

যেমন দেখে গেছে ঠিক তেমনই আছে কেবিন-লম্বা, ঢালু ছাদ, রেডউডের তৈরি কাঠের বাড়ি। নুড়ি বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেল ওরা।

বাড়িটা একদম নতুনের মত লাগছে! বাচ্চা মেয়ের মত কলকল করে উঠল সোহানা। আমি ভেবেছি ভাঙাচোরা একটা বাড়ি দেখব।

বাবা বাড়ির যত্ন নেয়ার জন্য কেয়ারটেকার রেখেছিলেন। যার প্রয়োজন হত এ বাড়িতে দুএক রাত্তির কাটিয়ে যেত।

সামনের দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল দুজনে।

বাহ্, ভারী সুন্দর তো! বলল সোহানা।

ঘোঁত ঘোঁত করল স্টিভ। ড্যাম্প পড়ে গেছে। বেডরুমে কেরোসিন তেলের একটা স্টোভ ছিল। রাতে স্টোভ জ্বালাতাম। রাতেরবেলা এদিকে খুব ঠাণ্ডা পড়ে।

কেবিনের ভেতরটা কালো ওক কাঠে তৈরি। আসবাবগুলোও একই কাঠের, পাথরের একটি চুল্লিও আছে। লেকের দিকে মুখ ফেরানো কাঁচের জানালা। লেকের তীরে, পাহাড়ের দিকে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা পাইন। ভারী মনোহর দৃশ্য।

ভিউকার্ডের কোনও দৃশ্যের মধ্যে যেন চলে এসেছি আমি, বলল উদ্ভাসিত সোহানা। ঘুরল স্বামীর দিকে, হাত ধরল। কটা দিন এখানে সুন্দরভাবে থাকার চেষ্টা করা যায় না, স্টিভ?

চেষ্টা নিশ্চয় করা যায়, জবাব দিল স্টিভ।

.

রাতের বেলা চুল্লিতে আগুন জ্বালল স্টিভ। সোহানা রান্না করল। বাসমতি চালের ভাত, গরুর মাংসের রেজালা, ডাল আর সালাদ। ডেসার্ট হিসেবে থাকল ভ্যানিলা আইসক্রিম। চাল আর ডাল সে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। স্টিভ সোহানার হাতের গরুর মাংস আর ভাত খেতে বেশ পছন্দ করে।

খাওয়া শেষে শ্যাম্পনের গ্লাস টোস্ট করে সোহানা বলল, ডায়মণ্ড লেকের ছুটি সফল ও সার্থক হোক।

তবে স্টিভ কিছু বলল না। সে জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে চুপচাপ মদ গিলল।

কৈশোরে এখানে তোমার নিশ্চয় অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল, বলল সোহানা।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল স্টিভ। না...আমি একাকী থাকতেই ভালোবাসতাম।

তোমার গার্লফ্রেণ্ড ছিল না?

চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল স্টিভের। আমার বয়স তখন মাত্র চোদ্দ।

তো? তোমরা, আমেরিকানরা তো আরও আগেই মেয়েদের প্রেমে পড়ো। তোমার জীবনে বিশেষ কেউ ছিল না?

বললামই তো এখানে আমার জীবন খুব একটা ভালো কাটেনি। অন্য কথা বলো। এসব নিয়ে বলতে ভাল লাগছে না।

সিধে হলো সোহানা। বাসনগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, ঠিক আছে। তোমার ভালো না লাগলে এ প্রসঙ্গ থাক।

শোনো, শক্ত গলায় বলল স্টিভ। আমি এখানে আসতে চাইনি। তোমার চাপাচাপিতে আসতে হলো। এটুকুই যথেষ্ট নয় কী?

না। এটুকুই যথেষ্ট নয়, স্টিভের দিকে ফিরল সোহানা। তোমার হয়েছেটা কী? তখন থেকে দেখছি মুখটা রামগরুড়ের ছানা করে রেখেছে।

সোহানার কাছে হেঁটে এল স্টিভ, চুমু খেল গালে, ডান হাত আলতো ছুঁয়ে গেল স্ত্রীর ঘাড় এবং কাঁধ। দুঃখিত, সোহানা, বলল ও। এ জায়গাটা আমার ভালো লাগে না। আমি এখানে কোনও দিনই আসব না ভেবেছিলাম। এখানে এলে অতীত স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

সোহানা আয়ত চোখ রাখল স্টিভের চোখে। এ জায়গা নিয়ে তোমার জীবনের কোনও খারাপ ঘটনা ঘটেছে, না?

আমি জানি না, ধীরে ধীরে বলল স্টিভ। আমি সত্যি জানি না কী ঘটেছিল...

জানালা দিয়ে বাইরে, লেকের কাঁচের মত স্বচ্ছ, কালো, তেলতেলে জলে তাকাল স্টিভ।কালো জলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এল রাতজাগা পাখির ডাক।

ভয়ার্ত এবং ব্যথাতুর আর্তনাদ।

.

পরদিন জোরে জোরে বাতাস বইতে লাগল। সোহানা ধরে বসল সে লেক ঘুরে দেখবে। এটা কেমন জায়গা আমি দেখতে চাই। রাজি হতেই হলো স্টিভকে। ওর বাবার

ইঞ্জিনচালিত একটা রোবোট আছে। ওটায় চড়ে দুজনে ভেসে পড়ল লেকে। ইঞ্জিনের শব্দ খালি কেবিনে যেন প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল।

বিশাল লেকে শুধু ওরা দুজন। আর কেউ নেই।

এদিকে আর কাউকে দেখছি না কেন? জানতে চাইল সোহানা।

গরম শেষ হলে এদিকে আর কেউ পা মাড়ায় না। অক্টোবরে এদিকে এমন ঠাণ্ডা পড়ে, কেউ সাঁতার কাটা কিংবা বোট চালানোর কথা ভুলেও ভাবে না। আর আজ অক্টোবরের শেষ। ওর কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন বেড়ে গেল বাতাসের গতি, পাহাড় বেয়ে নেমে এল হাড় জমাট বাঁধা শীতল হাওয়া।

ফিরে যাই চলো, বলল সোহানা। পাতলা সোয়েটারে শীত মানছে না। জ্যাকেট নিয়ে আসা উচিত ছিল। স্ত্রীর কথা শুনছে না স্টিভ, স্থির দৃষ্টি পাথুরে তীরে। হাত তুলে দেখাল, ওখানে কে যেন বসে আছে,কাঁপা গলা ওর। পাথরের স্তূপের পাশে।

কই, আমি তো কাউকে দেখছি না।

ওই তো বসে আছে, ঢোক গিলল স্টিভ। আমাদেরকে দেখছে। নড়াচড়া করছে না।

স্টিভের কণ্ঠ কেমন ভৌতিক এবং অপার্থিব। অস্বস্তি লাগল সোহানার। কই আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কথাটা পুনরাবৃত্তি করল সে।

ঈশ্বর! স্টিভ ঝুঁকে এল সোহানার দিকে। তুমি কি কানা? ওই তো...পাথরের ওপরে। তীরের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে স্টিভ।

আমি শুধু পাথর দেখতে পাচ্ছি। তবে, বাতাসে হয়তো কোনও কিছু উড়ে এসে পড়েছে

চলে গেছে, সোহানার কথা কানে যায়নি স্টিভের। এখন কেউ নেই ওখানে।

আউটবোর্ডের থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল স্টিভ, লেকের কাকচক্ষু জলের বুক চিরে তীরে অভিমুখে ছুটল বোট।

জলের ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটি বাজপাখি, শিকারের সন্ধানে।

গাঢ় ধূসর আকাশের কফিনে শুয়ে বিশ্রাম নিতে চলেছে ক্লান্ত সূর্য।

আজ রাত হবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার একটি রাত। রাত একটার দিকে, আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ, কেবিনে ঘুমাচ্ছে সোহানা, স্টিভ নিঃশব্দে দরজা খুলে চলে এল লেকের ধারে,

বোল্ডারগুলোর পাশে। পরনের ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট ভেদ করে চামড়ায় ধারাল ছুরির পোচ বসাচ্ছে কনকনে উত্তুরে বাতাস।

তবে বাইরের ঠাণ্ডা কাবু করতে পারেনি স্টিভকে, ভেতরের হিমধরা ভয় ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপ্টে রেখেছে সাপের কুণ্ডলীর মত।

ভয় পাচ্ছে স্টিভ কারণ ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। গ্রনিট পাথরে নিশ্চল যে মূর্তিটি ও দেখেছিল, তার সঙ্গে ডায়মণ্ড লেককে নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠার নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

মনে মনে যা ভেবেছিল স্টিভ, তাই ঘটল। আবার আবির্ভূত হলো সেই মূর্তি। পাইনের জঙ্গলের ঘন আঁধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নারী, কুড়ি/একুশ হবে বয়স, লম্বা, কোমর ছাপানো চুল, শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার উন্মুখ ভঙ্গি দেহে, দীঘির অতল জলের মতই মিশমিশে কালো, জ্বলজ্বলে চোখ। তার পরনে লম্বা, সাদা গাউন। জোছনায় রুপোর মত ঝলমল করছে। সে এগিয়ে এল স্টিভের দিকে।

লেকের তীরে মুখোমুখি হলো দুজন।

জানতাম একদিন না একদিন তুমি ফিরে আসবেই, নারীমূর্তি হাসল স্টিভের দিকে তাকিয়ে। তার কণ্ঠ মার্জিত, হাসিমাখা, তাতে উষ্ণতা অনুপস্থিত।

স্থির চোখে মেয়েটিকে দেখছে স্টিভ। কে তুমি?

তোমার অতীতের একটা অংশ। হাত বাড়িয়ে দিল নারী। খুলল মুঠো। তালুতে ব্রোঞ্জের একটি চেইন, তাতে ছোট্ট মুক্তো বসানো। শেষ যেবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় তারপর থেকে আমি এটা গলায় পরে আছি। তখন আমি সবে তেরোতে পা দিয়েছি। আর তুমি চৌদ্দ।

ভেনেট, ফিসিফিস করে নামটা উচ্চারণ করল স্টিভ, নারীর গভীর কালো চোখের মাঝে যেন হারিয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। ভীত হয়ে উঠল পরক্ষণে। জানে না কেন তবে মেয়েটি তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে, স্টিভি, বলল সে। আমি তখন ছোট্ট লাজুক একটি গেঁয়ো মেয়ে। আর আমার জীবনে তুমিই প্রথম পুরুষ যে আমাকে চুমু। খেয়েছো।

মনে আছে আমার, বলল স্টিভ।

আর কী মনে আছে তোমার? জিজ্ঞেস করল তরুণী। মনে পড়ে এখানে, এই পাথরের ওপর বসে তুমি আমাকে চুম্বন করেছিলে? সেটা ছিল গ্রীষ্মের এক রাত। লাখ লাখ তারা জ্বলছিল আকাশে। লেক ছিল শান্ত এবং সুন্দর। মনে পড়ে, স্টিভি?

আ...আ আমার মনে পড়ছে না, তোতলাচ্ছে স্টিভ।

তুমি ওই স্মৃতি কবর দিয়ে রেখেছ, বলল মেয়েটি। তোমার মন সে রাতের। স্মৃতির ওপর পর্দা ফেলে রেখেছে তোমাকে রক্ষা করার জন্য। বেদনা থেকে দূরে রাখার জন্য।

আমি তোমাকে নেকলেস দেয়ার পরে, ধীরে ধীরে বলল স্টিভ, উপযুক্ত হাতড়ে বেড়াচ্ছে, মনে করার চেষ্টা করছে, আমি... তোমাকে স্পর্শ করি... তুমি তোমার শরীর আমাকে ছুঁতে দিতে চাওনি, কিন্তু আমি–

তুমি আমাকে ধর্ষণ করেছিলে, মেয়েটির কণ্ঠ যেন হিমশীতল সিল্ক। আমি কাঁদছিলাম, তারস্বরে চিৎকার করছিলাম, তোমাকে মিনতি করছিলাম থামার জন্য, কিন্তু তুমি আমার কথা শোননি। তুমি আমার পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলে, আমাকে ব্যথা দিয়েছ। অনেক অনেক ব্যথা দিয়েছ।

সে রাতের প্রতিটি দৃশ্য পরিষ্কার ফুটল স্টিভের মনছবিতে। ভেনেটের অনাঘ্রাতা কুমারী শরীরে প্রবেশ করার পরে কিশোরী তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল... তবে এরপরে কী ঘটেছে মনে নেই ওর।

আমি চিৎকার করছিলাম বলে তুমি রেগে গিয়েছিলে, তরুণী মনে করিয়ে দিল স্টিভকে। কী রাগ সেদিন তোমার! আমি চিৎকার করছি আর তুমি আমার চিৎকার বন্ধ করার জন্য একের পর এক ঘুসি মেরে আমার মুখটাকে থেতলে দিয়েছ।

আমি দুঃখিত, বলল স্টিভ। খুবই দুঃখিত... আ-আমার মাথাটা বোধহয় সেদিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এরপরে কী ঘটেছিল মনে আছে তোমার?

মাথা নাড়ল স্টিভ। না...কিছু মনে পড়ছে না।

আমি, বলব কী ঘটেছিল?

হ্যাঁ, নিচু গলায় বলল স্টিভ, মেয়েটি যা বলবে নিশ্চয় সুখকর কিছু নয়। তবু ও জানতে চায়।

তুমি একটি পাথর তুলে নিয়েছিলে। বড় একখণ্ড পাথর। বলল ভেনেট। তারপর পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে আমার মাথাটাকে প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর তুমি আমাকে তোমার বাবার বোটে তুলে নাও... ওই বোটটা, রো বোটটা হাত তুলে দেখাল সে। বোট নিয়ে চলে এসেছিলে লেকের ঠিক মাঝখানে। বোটে লোহার

নোঙর এবং কিছু রশি ছিল। তুমি রশি দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেললে যাতে সাঁতার কাটতে না পারি। তারপর

না! হাপরের মত ওঠানামা করছে স্টিভের বুক। বিস্ফারিত চোখ। আমি ওটা করিনি! গডড্যাম ইট, আমি ওই কাজ করিনি!

নিরুত্তাপ স্বরে বলে চলল তরুণী, তুমি আমাকে বোটের পাশ দিয়ে পানিতে ঠেলে ফেলে দিলে, পায়ে নোঙর বাঁধা। আমি তলিয়ে যাই পাতালে। আর উঠতে পারিনি। লেকে সলিল-সমাধি ঘটে আমার।

মিথ্যা কথা! তুমি বেঁচে আছ। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ। জ্যান্ত!

আমি দাঁড়িয়ে আছি বটে তবে বেঁচে নেই। যদি বেঁচে থাকতাম তাহলে এখন এতটাই বড় হতাম আমি। এরকমই চেহারা থাকত আমার।

এসব–স্টিভের গলা কাঁপছে। তুমি নিশ্চয় আশা করছ না যে আমি বিশ্বাস করব

-যে তেরো বছরের একটি কিশোরীকে তুমি খুন করতে পার? কিন্তু ঠিক এক কাজটাই তুমি করেছ। তুমি দেখবে ওরা যখন আমাকে লেক থেকে তুলল ওই সময় আমাকে

কেমন দেখাচ্ছিল...? রশির বাঁধন আলগা হয়ে যাওয়ার পরে আমি পানির ওপরে ভেসে উঠি।

কদম বাড়াল তরুণী। কাছিয়ে এল। আরও কাছে।

কাছে এসো না। খবরদার! চেঁচিয়ে উঠল স্টিভ, ঝট করে এক কদম পিছাল। চলে যাও!

স্টিভের সামনে এখন একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে। তার মাথার বামদিকের হাড় ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে, চাঁদের আলোয় বীভৎস সাদা দেখাচ্ছে, শরীরটা ফুলে ঢোল, কুচকুচে কালো। তার একটা চোখ অদৃশ্য, খেয়ে ফেলেছে। জলজ কোনও প্রাণী, পরনের পোশাক ভেজা, পচা, কাদামাখা।

.

হাই, স্টিভি, খনখনে গলায় ডাকল সে।

ভৌতিক দেহটার সামনে থেকে চরকির মত ঘুরেই দৌড় দিল স্টিভ। প্রচণ্ড আতঙ্কে উন্মাদের মত ছুটছে। সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়াচ্ছে। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রাণপণে ছুটছে। পালিয়ে যাচ্ছে লেকের তীর এবং ভয়ঙ্কর ওই জিনিসটার কাছ থেকে। ছুটতে ছুটতে বেদম হাঁফিয়ে গেল স্টিভ, গলা আগুনের মত জ্বলছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, পা আর

টানতে চাইছে না শরীর। দম নিতে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টিভ। একহাতে জড়িয়ে ধরে থাকল পাইনের গুঁড়ি। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত স্টিভ আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। জোছনায় প্লাবিত এ নিবিড় অরণ্যে ওর ঘনঘন নিঃশ্বাস নেয়া এবং দম ফেরার শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। তারপর, আস্তে আস্তে, যখন স্বাভাবিক হয়ে আসছে দম, মাথা তুলে চাইল স্টিভ এবং...ওহ গড, ওহ ক্রাইস্ট...

ওই যে সে!

ভেনেটের বিকটভাবে ফুলে থাকা বিশ্রী মুখটা স্টিভের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। মাংস গলে গলে পড়া, সাদা হাড় বেরিয়ে থাকা হাতটা বাড়িয়ে দিল প্রেতিনী, স্পর্শ করল স্টিভের গাল....

.

দুই বছর পরে, সোহানা ডায়মণ্ড লেকের বাড়িটি বিক্রি করে চলে এল বাংলাদেশে। জাভেদ চৌধুরী নামে এক সুদর্শন যুবকের প্রেমে পড়ল সে। জাভেদ একদিন কথায় কথায় জানতে চাইল সোহানার প্রথম স্বামীর খবর। ভাবলেশশূন্য মুখে সোহানা বলল, ও ডুবে মরেছে। ফ্লোরিডার ডায়মণ্ড লেকে।

ফোবিয়া

একেকজন মানুষের একেক রকম ফোবিয়া থাকে-এ এমন এক অস্বাভাবিক ভয় যার ওপর লোকের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কেউ মাকড়সা দেখলে অজ্ঞান হয়ে যায় ভয়ে, কারও রয়েছে তেলাপোকা ভীতি। তবে ইলেন ইঁদুর দেখলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। আর ইঁদুর নিয়ে সে রাতে ওর জীবনে যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল...।

.

ছোট রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার খেয়ে বেরুতে বেরুতে রাত আটটা বেজে গেল। রেস্টুরেন্টটি বড় পার্কটির এক কোণে। গরমের রাত। ইলেন সিদ্ধান্ত নিল হেঁটেই বাড়ি ফিরবে। ওর বাসা বেশি দূরে নয়, পার্ক থেকে মাত্র কয়েকশো গজ।

ইলেন ঢুকে পড়ল পার্কে। মাথার ওপর ডালপালা নিয়ে ঝুঁকে আছে গাছ। রাস্তাটা নির্জন এবং একটু যেন বেশিই অন্ধকার। গা কেমন ছমছম করে ওঠে ইলেনের। কদম দ্রুত হলো ওর। এ পার্ক নিয়ে নানা অদ্ভুতুড়ে গল্প শুনেছে ইলেন। যদিও বিশ্বাস করেনি সেসব কাহিনি।

অন্ধকার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভোলা একটা জায়গায় চলে এল ইলেন। আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। এদিকটাতে অল্প জোছনা। চলার গতি কমিয়ে দিল সে, যদিও মন থেকে অস্বস্তি ভাবটা দূর হচ্ছে না।

পার্কের মাঝখানে বড়সড় একটি লেক। যে রাস্তা ধরে হাঁটছে ইলেন, ওটা সোজা লেকের দিকে চলে গেছে। এ রাস্তার মাথায় আরেকটা পথ দেখতে পেল ইলেন। ওখানে কেউ নেই। পেছন ফিরে তাকাল ও, ভাবছে ফিরতি পথ ধরবে কিনা। কিন্তু ও পার্কের মাঝামাঝিতে চলে এসেছে। এখন আবার ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

রাস্তায় পাতার খসখস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বাতাসে দুলছে ডাল, খসখস শব্দ তুলছে পাতায়। ব্যস্ত শহরের দূরের কোলাহল পার্কের নীরবতা ভঙ্গ করতে পারেনি। ইলেন হাঁটছে, রাতের বাতাসে পাতার ফিসফিসানি। মনে হচ্ছে ও যেন সভ্যতা থেকে হাজার মাইল দূরে। হঠাৎ আরেকটা শব্দে খাড়া হয়ে গেল। কান। পাতা বা অন্য কিছুর শব্দ নয়, ভিন্ন একটা আওয়াজ। পায়ের শব্দ। আমারই পায়ের শব্দ, নিজেকে বোঝাতে চাইল ইলেন।

না, সিমেন্টের রাস্তায় যে শব্দটা উঠেছে ওটা ইলেনের পায়ের আওয়াজ নয়। অন্য কারও পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ভয় ঢুকে গেল ইলেনের মনে। ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে লাগল কলজে। চলার গতি বেড়ে গেল।

ইলেনের ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ পেছনের পায়ের শব্দটা হচ্ছে ওর পা ফেলার শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ইলেন জোরে হাঁটলে পেছনের জনও জোরে হাঁটছে।

ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল ইলেন। ওর পেছনে যে-ই থাকুক, তাকে বুঝতে দেয়া যাবে না ও ভয় পেয়েছে। ইচ্ছে করে হাঁটার গতি মন্থর করল ইলেন। কিন্তু অনুসরণকারী মোটেই গতি কমাল না। দ্রুত হয়ে উঠল তার পদশব্দ।

নিজের ওপর আর নিয়ন্ত্রণ রইল না ইলেনের। দৌড় দিল ও। ছুটতে লাগল রাস্তা ধরে। কয়েক সেকেণ্ড পেছনে কোনও শব্দ পেল না ইলেন। তারপর, ওর হৃৎপিণ্ডের দিড়িম দিড়িম ঢাকের শব্দ ছাড়িয়ে পেভমেন্টে ভেসে এল দ্রুত এবং ছন্দবদ্ধ ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

লেক সোজা যে রাস্তাটি চলে গেছে, ওটাতে উঠে এল ইলেন। অনেকেই পার্কে হাওয়া খেতে এসে লেকের ধারে বসে থাকে। ইলেন আশা করল এমন কাউকে দেখতে পাবে। ছোট একটি টিলা বেয়ে নেমে লেক অভিমুখে ছুটল ও। মোড় ঘুরল। দপ করে নিভে গেল আশার আলো। লেকের রাস্তায় জন-মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। ইলেন টের পেল টিলা বেয়ে নেমে আসছে তার অনুসরণকারী পায়ের শব্দ : হচ্ছে। থপ থপ থপ থপ। ওকে এই ধরল বলে!

উন্মাদের মত চারপাশে চোখ বুলাল ইলেন। বামে বেশ ঘন ঝোঁপ আর কতগুলো গাছ দেখতে পেল। ছুটে গেল ওদিকে, চট করে লুকিয়ে পড়ল ঝোঁপের আড়ালে।

এদিকে গাছপালার সারি। ঘন বলে চাঁদের আলোর অবাধ প্রবেশের সুযোগ নেই। ডাল আর পাতার আবরণী ভেদ করে যেটুকু আলো প্রকৃতির বুকে পৌঁছেছে। তাতে অন্ধকার দূর হয়েছে সামান্যই। ইলেন প্রথমে পায়ের শব্দ শুনতে পেল তারপর দেখতে পেল পায়ের মালিককে।

লোকটা ইলেনের লুকানো জায়গা থেকে কুড়ি ফুট দুরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইলেনের দিকে পেছন ফেরা। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর পা বাড়াল লেকের ধারের বেঞ্চিতে। বসল।

ঝোঁপের আড়ালে বসে ঘেমে ভিজে একাকার ইলেন। ওর এখানে লুকিয়ে পড়া মোটেই উচিত হয়নি। লোকটা নিশ্চয় টের পেয়েছে ও কোথায় লুকিয়েছে। লোকটা কি অপেক্ষা করছে কখন ইলেনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে এবং আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে? অবশ্য ইলেনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে পার্কের ভ্রমণকারীরা হাঁটতে হাঁটতে এদিকে চলে আসতে পারে। ও তখন লাফ মেরে বেরিয়ে আসবে ঝোঁপের আড়াল থেকে, লোকের ভিড়ে মিশে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে পার্ক থেকে।

বেঞ্চিতে বসা লোকটার দিকে আবার তাকাল ইলেন। সে চুপচাপ বসেই আছে, স্থির দৃষ্টি লেকে। হঠাৎ কী যেন একটা নজর কাড়ল ইলেনের। পানির ধারে কীসের একটা ছায়া, এগিয়ে আসছে। বিরতি দিল। এবারে ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ইলেন। বড় একটা ইঁদুর। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় লাফ মেরে উঠতে গেল ইলেন নিজেকে দমন করল বেঞ্চির লোকটার কথা ভেবে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাওয়া চিৎকারটাকেও একই সঙ্গে গলা টিপে মারল।

যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে ইলেন, বড়টার সঙ্গে আরও তিনটে ইঁদুর যোগ দিল। চাঁদের আলোয় ওদের বিকট ছায়া এবং কুৎসিত মুখগুলো দেখতে পাচ্ছে ইলেন। সিমেন্টের রাস্তায় প্রাণীগুলোর থাবার আওয়াজ উঠল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল ইলেনের, মন চাইল ছুট দেয়। কিন্তু বেঞ্চিতে বসা লোটার ভয়ে কিছুই করতে পারল না।

লোকটা পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছে বেঞ্চে, ইঁদুরগুলো তার কাছ থেকে তিন হাত দূরেও নেই। ওগুলোকে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে সে, ভাবল ইলেন। কিন্তু তার। মাঝে কোনও ভাবান্তর নেই। কেমন লোক এ?

ইঁদুরের দিকে চোখ ফেরাল ইলেন। ওরা যেন সম্মোহন করেছে ওকে। ঝোপে, দুই ফুট দূরে খস খস একটা শব্দ হলো। চিৎকার বন্ধ করার জন্য মুখে সোয়েটার চেপে ধরল ইলেন। যদি ওর দিকে ছুটে আসে কোনও ইঁদুর? ধারাল নখ বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে?

এমন সময় তীব্র আতংক নিয়ে ইলেন দেখল লেকের ধারের চারটে ইঁদুর ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। ওদের ধারাল মুখগুলো যেন উঁচিয়ে আছে ইলেনের দিকেই। লম্বা লেজ নড়ছে ডানে-বামে।

চিৎকার দিল ইলেন। উঠে দাঁড়াল বেঞ্চির লোকটা। ঝোঁপের দিকে আসছে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে সিধে হলো ইলেন। পিছিয়েছে এক কদম, একটা পা গিয়ে পড়ল গভীর একটা গর্তে। এটা ইঁদুরের গর্ত। ডজন খানেক ইঁদুরের বাচ্চা ব্যথা এবং ভয়ে কিকি করে উঠল। পিলপিল করে বেরিয়ে এল গর্ত ছেড়ে। ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। এক ঝটকায় গর্ত থেকে পা বের করে আনল ইলেন। আবার পিছিয়েছে, ওর পা চাপা পড়ে ভর্তা হয়ে গেল একটি বাচ্চা ইঁদুরের নরম শরীর। মরণ যন্ত্রণায় কিইইচ করে উঠল ওটা। ইলেন গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল।

লোকটা ক্রমে কাছিয়ে আসছে। ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল ইলেন। কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ে জমে যাওয়া দুর্বল হাঁটু যেন সাড়া দিতে চাইছে না। কোনও মতে ঘন ঝোঁপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল ও, পা রাখল রাস্তায়।

লোকটা দেখে ফেলেছে ইলেনকে। আরও কাছে চলে এসেছে সে। চাঁদের ম্লান আলোয় তার মুখ দেখতে পেল ইলেন। ভয়ে শরীরের সব কটা রোম দাঁড়িয়ে গেল। ওটা মোটেই মানুষের মুখ নয়! ওটা একটা ইঁদুরের মস্ত মুখ, মুখটা নড়ছে, সেইসঙ্গে নড়ছে মুখের দুপাশের গোঁফ।

ঘুরেই ছুট দিল ইলেন। প্রচণ্ড ভয়ে দিশাহারা হয়ে দৌড়াতে লাগল ও। পেছনে ভেসে এল অসংখ্য ইঁদুরের ভয়ঙ্কর কিকি নিনাদ।

ছুটতে ছুটতে পার্কের এক্সিট লেখা গেটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেল ইলেন। আর মাত্র দশ গজ। তারপরই ওর মুক্তি। আশ্চর্য! গেটের কাছে কেউ নেই। একজন ভ্রমণকারীও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাতে কী? ইলেন তো এখনই বেরিয়ে পড়বে। হঠাৎ ওর কলজে হিম হয়ে গেল ঠিক ওর পেছনে তীব্র কিইইচ শব্দ হতে। আঁতকে উঠে পাই করে ঘুরল ও। ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইঁদুর-মানব। জ্বলজ্বল করছে চোখ। দৃষ্টিতে বিকট উল্লাস। কই, দানবটার ছুটে আসার শব্দ তো পায়নি ও। ইলেনের মুখ হাঁ হয়ে গেল, চিৎকার দেবে। লম্বা, ধারাল থাবা আছড়ে পড়ল মুখে। চিৎকারটা আর মুখ ফুটে বেরুতে পারল না। তার আগেই আঁধার হয়ে এল ইলেনের দুনিয়া।

বাড়িওয়ালি

লণ্ডন থেকে শেষ বিকেলের ট্রেনে চেপে বসল বিলি উইভার। পথে সুইনডনে যাত্রা বিরক্তি হলো। গন্তব্য স্থল বাথ-এ যখন পৌঁছাল সে, ঘড়ির কাঁটা তখন নটার ঘর ছুঁয়ে গেছে। প্লাটফর্মের বিপরীত দিকের উঁচু দালান-কোঠার মাথায় উঁকি দিতে শুরু করেছে চাঁদ, বরফ ঠাণ্ডা বাতাস খুরের পোঁচ বসাল বিলির খোলা মুখে।

আচ্ছা, স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইল সে, ধারে কাছে কোন সস্তা হোটেল নেই?

বেল অ্যাণ্ড ড্রাগনে যেতে পারেন, জবাব দিল পোর্টার রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে। খালি ঘর মিলতে পারে। এখানে থেকে সিকি মাইল দূরে হোটেলটা। ওই যে ওদিকে।

বিলি লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে হাতে সুটকেস তুলে নিল, তারপর হাঁটা শুরু করল বেল অ্যাণ্ড ড্রাগনের উদ্দেশে। বাথ-এ এই প্রথম এসেছে বিলি। এখানে পরিচিত কেউ নেই। তবে লণ্ডনে, ওদের হেড অফিসের কর্তা মি. গ্রীনপ্লেড বলেছিলেন জায়গাটা ভারি সুন্দর। থাকার একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে, বলেছিলেন তিনি, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার কাজ বুঝে নিও।

সতেরো তে পা দিয়েছে বিলি। একটা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে কিছুদিন হলো ঢুকেছে। ট্রেনিং শেষে এই শহরতলিতে পাঠিয়েছে ওকে কোম্পানী। গায়ে নেভী-বু ওভারকোট, মাথায় নতুন ট্রিবলী হ্যাট আর কয়েকদিন আগে কেনা বাদামী স্যুট পরে বিলি রাস্তা দিয়ে হাঁটছে খোশমেজাজে। জীবনের প্রথম চাকরি এটা বিলির। সেই আনন্দে সারাক্ষণ সে আত্মহারা।

চওড়া রাস্তাটার আশপাশে কোন দোকানপাট নেই, শুধু সমান আকৃতির লম্বা, উঁচু কিছু বাড়িঘর ছাড়া। প্রতিটি বাড়ির সামনে উন্মুক্ত বারান্দা, চার-পাঁচটা সিঁড়ির ধাপ পেরুলে সদর দরজা। একসময় বাড়িগুলোর বেশ জৌলুস ছিল, লক্ষ করলে বোঝা যায়। তবে এখন প্রায় সবগুলোরই দৈন্যদশা, অযত্ন আর অবহেলায় দরজায় কাঠের কাজ দাঁত ভেংচে তাকিয়ে আছে, জানালাগুলোর গরাদ নেই একটারও, চাঁদের আলোয় হাঁ করে আছে নর কঙ্কালের খুলির মত।

হঠাৎ, কয়েক হাত দূরে, একটা স্ট্রীচ ল্যাম্পের পাশের বাড়িটার জানালার দিকে চোখ আটকে গেল বিলির। জানালার কাঁচের গায়ে একটা সাইনবোর্ডে, বড় বড় অক্ষরে লেখা: বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট। বোর্ডটার ঠিক নিচে ভারি সুন্দর একটা ফুলদানী আঁকা। দাঁড়িয়ে পড়ল বিলি। তারপর কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। মখমলের সবুজ পর্দা ঝুলছে জানালার দুপাশ থেকে। ফুলদানীটাকে ওগুলোর মাঝে অপূর্ব লাগছে। জানালার কাঁচে মুখ ঠেকাল বিলি। তাকাল ভেতরের দিকে। প্রথমেই চোখে পড়ল ফায়ার প্লেসটা। আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি। আগুনের সামনে, কার্পেটের ওপর পেটের কাছে মুখ গুঁজে

ঘুমাচ্ছে ছোট্ট একটা রোমশ কুকুর। আধো অন্ধকারে যতটুকু দেখা গেল, বিলি বুঝতে পারল ঘরটা বেশ দামী আর রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো হয়েছে। ঘরের এক কোণে একটা পিয়ানো, বড় একটা সোফা আর বেশ কিছু পেটমোটা আর্ম-চেয়ার; আরেক কোণে বড় আকারের একটা কাকাতুয়া দেখতে পেল বিলি। এ ধরনের সুরুচিসম্পন্ন পরিবেশ এ রকম পশুপাখি ঘরের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তোলে, মনে মনে ভাবল সে। হোটেলের চেয়ে জায়গাটা ভালো হবে, ধারণা করল বিলি। বয়সে তরুণ হলেও নিরিবিলি পরিবেশ পছন্দ তার হৈ-হল্লা ভালো লাগে না। হোটেলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আশা করা বাতুলতা মাত্র। আর এখানে হোটেলের চেয়ে সস্তায় ঘর ভাড়া পাবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তবে এর আগে কখনও বোর্ডিং-হাউজে থাকেনি বিলি। সত্যি বলতে কি, বোর্ডিং-হাউজ সম্পর্কে তার একটা ভীতিও আছে। বিলি শুনেছে বোর্ডিং-হাউজের মালিকরা মারকুটে স্বভাবের হয়। কেউ কেউ নাকি সুযোগ পেলে খদ্দেরের গলা কাটে। মানে পকেট একেবারে আলগা করে দেয়।

বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো মনে পড়তে এখানে থাকার আগ্রহ চুপসে গেল ফুটো বেলুনের মত। নাহ্ বেল অ্যাণ্ড ড্রাগনে আগে একবার চেষ্টা করে দেখা। উচিত। ঘুরে দাঁড়াল বিলি, চলে যাবার জন্যে।

আর তখনি ভারি অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটল। বিলির চোখজোড়া সম্মোহিতের মত আটকে থাকল সাইনবোর্ডের দিকে। কানে যেন বারবার ভেসে এল ওই শব্দগুলো: বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট, বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট, বেড ব্রেকফাস্ট। প্রতিটি অক্ষর আকৃতি পেল একেটি

বড় চোখে, কাঁচের মধ্য থেকে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। সাইনবোর্ডটার দিকে আঠার মত লেগে থাকল বিলির চোখ, ওকে আটকে রাখল, দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল। এক পাও নড়তে পারল না বিলি উইভার। হঠাৎ, বিলি টের পেল, যেন এক অদৃশ্য শক্তি ওকে আবার ঠেলে দিচ্ছে সামনের দিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানালার পাশ থেকে সরে আসছে সে, এগোচ্ছে বাড়িটার সদর দরজার দিকে, এইবার সিঁড়ি বেয়ে উঠল সে, হাত বাড়াল কলিংবেলের দিকে।

বেলে চাপ দিল বিলি। দূরে, পেছনের দিকে কোনো ঘরে বেজে উঠল ঘণ্টা টুং টাং শব্দে, আর তখুনি, প্রায় সাথে সাথে, বেলবাটন থেকে তখনও হাত সরাতে পারেনি বিলি, দড়াম করে খুলে গেল দরজা। চৌকাঠে একজন মহিলা। এত দ্রুত কাউকে আশা করেনি বিলি। লাফিয়ে উঠল সে।

ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। বিলিকে দেখে আন্তরিক হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। এসো, ভেতরে এসো, বলার ঢঙেও আন্তরিকতার টান। দরজাটা পুরো মেলে ধরে একপাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি। কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই চট করে ভেতরে ঢোকার প্রবল ইচ্ছে জাগল বিলির মনে। কেন, নিজেরও কারণটা জানা নেই।

জানালায় আপনার ঘর ভাড়ার নোটিশটা দেখলাম, বলল সে।

বুঝতে পেরেছি।

একটা ঘর খুঁজছি থাকার জন্যে।

সেজন্যে তোমাকে আর ভাবতে হবে না, মাই ডিয়ার, বললেন তিনি। ভদ্রমহিলার গোলাপী মুখখানা গোল, নীল চোখজোড়া সাংঘাতিক উজ্জ্বল।

আমি বেল অ্যাণ্ড ড্রাগনের দিকে যাচ্ছিলাম, সাফাই দেয়ার ভঙ্গিতে বলল বিলি। হঠাৎ আপনার নোটিশটা চোখে পড়ল।

এসেছ খুব ভালো করেছ। এখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছি বলে তুমি কিছু মনে করছ না তো?

না না, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার ঘর ভাড়া কত করে?

একরাতের জন্য সাড়ে পাঁচ ডলার, সকালের নাস্তাসহ।

দারুণ সস্তা। বিলি যে টাকা ঘর ভাড়ার জন্যে বাজেট করেছে এটা অর্ধেকেরও কম। বিলিকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বললেন, ভাড়া বেশি মনে হলে আমি কিছুটা কমাতে পারব। নাস্তায় কি ডিম লাগবে তোমার? এদিকে ডিম-টিম এখন

তেমন পাওয়াও যায় না। তাই দাম খুব বেশি। ডিম না খেলে আরও সস্তা পড়বে তোমার ঘর ভাড়া।

সাড়ে পাঁচ ডলার ঠিক আছে, বলল বিলি। আমি ওই ভাড়া দিতে পারব।

বেশ। ভেতরে এসো। ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ তখন থেকে!

ভদ্রমহিলার মাতৃসুলভ ব্যবহার মুগ্ধ করল বিলিকে। কৈশোরের প্রিয় বন্ধুটির স্নেহময়ী মায়ের মতই লাগছে ওঁকে, যেন বিলিকে তিনি ক্রিস্টমাসের ছুটি কাটাতে দাওয়াত করছেন। বিলি মাথা থেকে হ্যাট খুলল, পা রাখল চৌকাঠের ভেতরে।

ওটা ওখানে ঝুলিয়ে রাখো, বললেন তিনি, দেখি, কোটটা আমাকে খুলতে দাও।

হলঘরে আর কোন কোট বা হ্যাট চোখে পড়ল না বিলির। নেই ছাতা, ওয়ার্কিং স্টিক-কিছু না।

এখানে আমাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরকে করতে হয়, বিলির কাঁধে হাত রেখে ভদ্রমহিলা দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। আমার এই ছোট্ট বাড়িতে মানুষজন বলতে গেলে কেউ আসেই না। হাসি তার মুখে। তাই তোমাকে পেয়ে ভালো লাগছে।

মহিলা বড় বেশি বকবক করেন, ভাবল বিলি। তবে সাড়ে পাঁচ ডলারে রাত্রি যাপনের সুযোগ পেয়ে এটুকু বকবকানি সইতে রাজি আছে সে। আমি ভেবেছিলাম আপনার এখানে পেয়িংগেস্টদের অভাব নেই, মৃদু গলায় বলল বিলি।

তা অবশ্য নেই। তবে সবাইকে তো আমি ঘর ভাড়া দিই না। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে খুব খুঁতখুঁতে বলতে পারো।

আচ্ছা!

তবে তরুণ গেস্টদের জন্যে আমার দরজা সবসময়ই ভোলা। তেমন কেউ এলে আমি বরং খুশিই হই, সিঁড়ির অর্ধেক ধাপ পেরিয়েছেন মহিলা, রেলিং-এ ভর দিয়ে থামলেন, ঘাড় ঘুরিয়ে হাসিমুখে তাকালেন বিলির দিকে। ঠিক তোমার মত, কথাটা শেষ করলেন। তিনি। তাঁর নীল চোখজোড়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে যেন জরিপ করল বিলিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

একতলার ল্যাণ্ডিং দেখিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, এই ফ্লোরে আমি থাকি।

ওরা উঠে এল দোতলায়। এই ফ্লোর পুরোটা তোমার। বললেন ভদ্রমহিলা। এই যে এটা তোমার ঘর। আশা করি অপছন্দ হবে না। ছোট কিন্তু সুসজ্জিত একটি বেডরূমে ঢুকলেন তিনি বিলিকে নিয়ে, জ্বেলে দিলেন আলো।

সকালবেলায় সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে ঘরের ভেতরে, পারকিন্স, পারকিন্সই তো নাম, নাকি?

জ্বী না। বলল বিলি। উইভার, বিলি উইভার।

বেশ সুন্দর নাম তো! বিলি সাহেব, আপনার আশা করি কোন সমস্যা হবে না এ ঘরে থাকতে। ঠাণ্ডা লাগলে গ্যাসের চুলাটা জ্বালিয়ে নিও। ঘর গরম হবে।

ধন্যবাদ, বলল বিলি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সে লক্ষ করেছে বিছানা ঢেকে রাখার গুজনিটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, পেতে রাখা হয়েছে পরিষ্কার চাদর। যেন কেউ আসবে জানতেন বাড়িউলি।

তোমার পছন্দ হয়েছে জেনে আমারও বেশ ভালো লাগছে, গভীর চোখে তাকালেন তিনি বিলির দিকে। ভাবছিলাম যদি পছন্দ না হয়...।

না না, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি জবাব দিল বিলি। আমাকে নিয়ে আপনার অযথা চিন্তা করতে হবে না। সে সুটকেসটা চেয়ারের ওপর রেখে তালা খুলতে শুরু করল।

রাতে কিছু খাবে, খোকা? নাকি খেয়ে এসেছ?

ধন্যবাদ। কিছুই খাব না, বলল বিলি। আমাকে আবার কাল ভোরে উঠেই অফিসে দৌড়াতে হবে। তাই সকাল সকাল শুয়ে পড়তে চাইছ।

বেশ তো, শুয়ে পড়ো। তবে সম্ভব হলে ঘুমাবার আগে একবার নিচতলায় এসো। রেজিস্টার বুকে নাম সই করতে হবে। বোর্ডিং-হাউজ বা হোটেলের নিয়ম এটাই জানো বোধ হয়। আমাদেরও নিয়ম ভঙ্গ করা ঠিক হবে না, তাই না? হাত নেড়ে ভদ্রমহিলা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

মহিলা একটু বেশি কথা বললেও মনটা ভালো, ভাবল বিলি। হয়তো যুদ্ধে তিনি তাঁর সন্তানকে হারিয়েছেন। সেই শোক এখনও ভুলতে পারেননি।

সুটকেস খুলে ঘুমাবার যাবতীয় জিনিসপত্র বের করে ফেলল বিলি। তারপর হাত মুখ ধুয়ে নেমে এল নিচে, ঢুকল লিভিং রুমে। বাড়িউলি এখানে নেই, তবে ছোট্ট কুকুরটা এখনও ফায়ার প্লেসের সামনে গভীর ঘুমে মগ্ন। ঘরটা আরামদায়ক গরম। নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবছে বিলি।

পিয়ানোর ওপর রেজিস্টার বুকটা দেখতে পেল সে, খাতা খুলে নিজের নাম এবং ঠিকানা লিখল গোটা গোটা অক্ষরে। এই পৃষ্ঠায় মাত্র দুজন অতিথির আগমনের কথা লেখা

আছে। একজন কাড্রিফের ক্রিস্টোফার মূল হোল্যান্ড, অন্যজন ব্রিস্টলের গ্রেগরী ডব্লিউ টেম্পল।

নাম দুটো চেনা চেনা লাগল বিলির। কোথায় যেন এই অদ্ভুত নাম দুটো দেখেছে সে, এখন ঠিক মনে করতে পারছে না। খাতার দিকে আবার তাকাল বিলি। মূল হেল্যাণ্ডের নামটা বেশি চেনা চেনা লাগছে ওর কাছে। কিন্তু নামটা শুনেছে কোথায়?

গ্রেগরী টেম্পল? বেশ জোরেই নামটা উচ্চারণ করল বিলি, স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। ক্রিস্টোফার মূল হোল্যাণ্ড?

ভারি চমৎকার দুটি ছেলে, পেছন থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠ, ফিরে তাকাল বিলি। বাড়িউলি। হাতে সিলভারের বড় একটা চায়ের ট্রে, দুকাপ পানীয় ওতে।

নাম দুটো বড় চেনা চেনা লাগছে, বলল বিলি।

তাই নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার তো!

নাম দুটো অবশ্যই আগে কোথাও দেখেছি, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার, বেশ জোর দিয়ে বলল বিলি। সম্ভবত খবরের কাগজে। তবে বিখ্যাত কেউ ছিল না ওরা। বিখ্যাত ক্রিকেটার বা ফুটবলার, কোনটাই নয়।

আমারও তাই ধারণা, ভদ্রমহিরা সোফার সামনে নিচু একটা টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রাখলেন।

তবে বিখ্যাত কেউ না হলেও দুজনেই ছিল অপূর্ব সুন্দর দেখতে। লম্বা, বয়সে তরুণ, সুদর্শন, ঠিক যেমন তুমি।

আবার সেই প্রশংসা। বিলি খাতার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। এই যে দেখুন, তারিখটা আঙুল দিয়ে দেখাল সে। এখানে শেষ লোকটি এসেছে দুবছর আগে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আর ক্রিস্টোফার মূল হোল্যাণ্ড এসেছে তারও এক বছর আগে অর্থাৎ প্রায় তিন বছর আগে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা। সত্যি, এভাবে কখনও হিসেব করে দেখিনি। সময় কি দ্রুত যায়, পারকিন্স।

বিলি, তাঁকে আবার নিজের নামটা মনে করিয়ে দিল বিলি, বিলি উইভার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিলি! বিলি! মুখস্থ করার ভঙ্গিতে বললেন তিনি। আসলে কানে ভালো শুনতে পাই না আমি। স্মরণশক্তিও কমে যাচ্ছে।

ওদের ব্যাপারে জানেন কিছু? এই দুজনের সম্পর্কে?

না, তেমন কিছু জানি না।

আমার এখন সব কথা মনে পড়ছে। ওরা দুজন ছিল হরিহর আত্মা। দুই বন্ধু। সবাই এক নামে চিনত ওদেরকে। যেমন লোকে রুজভেল্ট এবং চার্চিলের নাম এক সাথে বলে, সেভাবে।

আচ্ছা! সরল বিস্ময় প্রকাশ করলেন ভদ্রমহিলা। আমার পাশে এসে বসো তো, খোকা। চা খেতে খেতে ওদের গল্প শুনি।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল বিলি। পিরিচের ওপর কাপে দ্রুত চামচ নাড়ছেন তিনি। তাঁর হাত জোড়া ছোট্ট, ফ্যাকাসে, নখে লাল টকটকে নেইলপলিশ।

আমি ওদের ছবি দেখেছিলাম খবরের কাগজে, বলে চলল বিলি। ক্রিস্টোফার মূল হোল্যাণ্ড বছর তিন আগে ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়। ইটন স্কুলে পড়ত সে। ভ্রমণের সাংঘাতিক বাতিক ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন...

তোমার চায়ে দুধ চলবে? আরেকটু চিনি?

দিতে পারেন। আচ্ছা, যা বলছিলাম হঠাৎ একদিন...।

ইটন স্কুলের ছাত্র? উঁহু, আমার কাছে যে মূল হোল্যাণ্ড এসেছিল সে তা হলে অন্য কেউ হবে। কারণ সে ইটনে পড়ত না। সে ছিল ক্যামব্রিজের আন্ডার গ্রাজুয়েট। এখানে এসে ওই ফায়ার প্লেসের সামনে বসে অনেক গল্প করেছে সে আমার সাথে। এসো, চা রেডি। সোফার পাশে খালি জায়গাটায় বিলিকে বসতে বললেন ভদ্রমহিলা হাসি মুখে।

ধীর পায়ে হেঁটে এল বিলি, বসল সোফার এক কোণে। বাড়িউলি ওর সামনে, টেবিলের ওপর চায়ের কাপটা রাখলেন। বিলি চায়ে চুমুক দিতে শুরু করল। প্রায় আধ মিনিট কেউ কথা বলল না। শুধু ফুড়ত্যাড়ৎ শব্দ শোনা গেল চা পানের। বিলি জানে উনি ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন, কাপের কিনারে চোখ রেখে ওকেই দেখছে। বোটকা, পচা একটা গন্ধ লাগছে নাকে, মহিলার গা থেকে আসছে। শরীর গুলিয়ে উঠল বিলির।

মি. মূল হ্যাণ্ড চা খেতে খুব ভালোবাসত, উদাসীন গলায় বললেন তিনি। আমার জীবনেরও কাউকে এত বেশি চা খেতে দেখিনি।

মূল হোল্যাণ্ড কবে গেছে এখান থেকে? জানতে চাইল বিলি।

গেছে? ভুরু কোঁচকালেন ভদ্রমহিলা। যায়নি, খোকা। মুল হোল্যাণ্ড আছে এখনও এ বাড়িতেই। মি. টেম্পলও আছে। দুজনেই তিনতলায় থাকে।

খুব আস্তে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল বিলি, আড়চোখে তাকাল মহিলার দিকে। হাসলেন মহিলা প্রত্যুত্তরে, ফ্যাকাসে হাত বাড়িয়ে বিলির। হাঁটুতে চাপড় দিলেন আদর করে। তোমার বয়স কত খোকা?

সতেরো।

সতেরো! চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। একদম সমান বয়স। মি. মূল হেল্যাণ্ডেরও বয়স ছিল সতেরো। তবে সে তোমার চেয়ে খানিকটা খাটো, আর তার দাঁতগুলোও তোমার মত এত ঝকঝকে নয়। খুবই সুন্দর দাঁত তোমার, বিলি, তা কি তুমি জানো?

যতটা সুন্দর বলছেন ততটা নয়, বলল বিলি। আমার কয়েকটা দাঁতের পেছনে ফিলিং করতে হয়েছে।

তাতে কিছু আসে যায় না। মি. টেম্পল ছিল তোমার চেয়ে বয়সী। আটাশ বছর ছিল বয়স। অবশ্য সঠিক বয়সটা সে নিজে থেকে না বললে আমি ধরতেই পারতাম না আসলে তার বয়স কত। খুবই তরুণ দেখাত তাকে। চামড়ায় একটা দাগও ছিল না।

মানে?

মানে তার ত্বক শিশুদের মতই কোমল আর মসৃণ ছিল।

একটু বিরতি। বিলি চায়ের কাপটা আবার তুলে নিয়ে চুমুক দিল, তারপর নিঃশব্দে পিরিচের ওপর নামিয়ে রাখল ওটাকে। ভদ্রমহিলার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে সে, কিন্তু তিনি হঠাৎ চুপ মেরে গেলেন। সিধে হয়ে বসে ওপর দিকে চাইল বিলি, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলল, ওই কাকাতুয়াটা... রাস্তা

থেকে ওটাকে প্রথম দেখে জ্যান্ত ভেবেছিলাম।

তাই নাকি?

জ্বী। দেখলে মনেই হয় না ওটা মৃত। দারুণ একটা কাজ হয়েছে পাখিটাকে নিয়ে। কে করেছে কাজটা?

আমি।

আপনি?

অবশ্যই, বললেন তিনি। বেসিলকেও নিশ্চই দেখেছ? ফায়ারপ্লেসের সামনে চোখ বোজা রোমশ কুকুরটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। বিলি তাকাল ওটার দিকে। হঠাৎ বুঝতে পারল ঘুমাচ্ছে না কুকুরটা, কাকাতুয়ার মত একই দশা হয়েছে ওটারও। হাত বাড়িয়ে কুকুরটার পিঠ ছুঁলো বিলি। শক্ত এবং ঠাণ্ডা। লোমের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দেখতে পেল চামড়াটা ধূসর-কালো এবং শুকনো, দারুণভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সাংঘাতিক ব্যাপার তো! বলল বিলি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল পাশে বসা ছোটখাট মহিলাটির দিকে। কাজটা করতে নিশ্চই প্রচুর খাটুনি গেছে।

একেবারেই না, বললেন তিনি। আমি আমার প্রিয় প্রাণীগুলোকে স্টাফ করে রাখি তারা মারা যাবার পরে। এটা আমার শখ বলতে পারো। তোমাকে আরেক কাপ চা দেব?

না, ধন্যবাদ, বলল বিলি। বাদাম মেশানো চা খাবার পর মুখের ভেতরটা এখন তেতো লাগছে।

এখানে তো মজা পাবার মত কিছু ঘটে না, আপন মনে বকবক করে চলেছেন মহিলা। তাই কদাচ যখন কিছু স্টাফ করার সুযোগ পাই, ছাড়ি না। এটা তো এক ধরনের শিল্পই, নাকি?

জ্বী, ডোক গিলে বলল বিলি। এই শীতেও ঘামতে শুরু করেছে সে।

ভালো কথা। তুমি রেজিস্টার বইতে নাম সই করেছ?

জ্বী, করেছি।

গুড। সত্যি বলতে কী, পরে যদি তোমার নামটা ভুলে যাই, তখন নিচে এসে খাতা দেখে নামটা স্মরণ করতে পারব। এখনও তো প্রায়ই কাজটা করি ওদের দুজনকে নিয়ে। ওই যে মি. মূল হোল্যাণ্ড আর মি... মি...

টেম্পল, বলল বিলি। গ্রেগরী টেম্পল। মাফ করবেন, একটা কথা জানতে চাইছি। গত দুতিন বছরে কি ওরা দুজন ছাড়া সত্যি আর কেউ আসেনি এখানে?

হাতে চায়ের কাপ, মাথাটা সামান্য বাঁয়ে হেলিয়ে তিনি তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন বিলির দিকে, তার হাসি দেখে গায়ের রোম সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটার।

না, খোকা, নরম গলায় বললেন তিনি। তিন বছর পরে শুধু তুমিই এসেছ।

বানরের মগজ

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাংলো থেকে বের হতেই গায়ে আগুনের হল্কা অনুভব করল রিচার্ড ক্লার্ক। সকাল এখন, কিন্তু মাত্র একশো গজের মত রাস্তা হেঁটেছে সে, সুতি শার্টটা ঘামে ভিজে সেঁটে গেল পিঠের সাথে। কপাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে, ভুরু ভিজিয়ে চোখে ঢুকছে। চোখ মিটমিট করছে ও, ডান হাতের চেটো দিয়ে একটু পর পর ভুরু থেকে মুছে ফেলছে ঘাম। বন্দরের দিকে মুখ তুলে চাইল ক্লার্ক। সিঙ্গাপুর জেটিতে ডজনখানেক সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙর করা, নারকেলের শুকনো শাস আর রাবার লোডের অপেক্ষায় আছে কাজটা শেষ হলে আবার বেরিয়ে পড়বে খোলা সাগরে।

এখানে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন নেই। জানুয়ারি চলছে অথচ গরমটা জুন বা সেপ্টেম্বর মাসের মতই। মাসের পর মাস, দিনে বা রাতে তাপমাত্রা সব সময় নব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটে স্থির হয়ে থাকছে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব বেশি। এমনকি মৌসুমী বৃষ্টিতেও গা পোড়ানো গরম কমছে না।

তবে রিচার্ড ক্লার্ক এ ধরনের আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে অনেক আগেই। গত ছবছরে এই দ্বীপ এবং তার বাসিন্দাদের হালহকিকত ভালোই চেনা হয়ে গেছে তার। বরং বলা যায় এদের জীবনযাত্রার সাথে এতই অভ্যস্ত ক্লার্ক যে অন্য কোথাও গেলে সে হয়তো স্বস্তিই পাবে না। ককেশিয়ান এবং পূর্ব দেশীয় জনগোষ্ঠীর অনেকের

সাথেই ওর হার্দিক সম্পর্ক। স্থানীয়দের সাথে সে মিশে যেতে পারে বন্ধুর মতই। আফিম সেবী, ক্ষয়াটে চেহারার চাইনিজ ধোপা বা আবলুস কালো ভারতীয় সুদখোর ব্যবসায়ী কিংবা সোনার দাঁত বাঁধানো মাড়োয়ারী শেঠ, সবাই তাকে চেনে, শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে। ক্লার্কও ওদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করে না। ওদেরকে সে-ও বন্ধু হিসেবেই দেখে। ক্লার্কের ইউরোপীয় বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে এমন মন্তব্যও করেছে, ক্লার্ক আসলে নিজস্ব সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে ক্রমশ প্রাচ্যমুখী হয়ে উঠছে। তবে ক্লার্ক বিশ্বাস করে, প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ধারণ করতে হলে আরও অনেক কিছু জানতে হবে তাকে, শেখার এখনও বাকি আছে অনেক কিছুই। স্থানীয়দের সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তার আগ্রহ এত প্রবল যে ক্লার্ক ইংল্যাণ্ডে, নিজের বাড়ি ঘরের কথা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে।

হলদে রঙের একটা মার্সিডিজ ট্যাক্সি সগর্জনে ওর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে ডাকল রিচার্ড ক্লার্ক। প্রায় সাথে সাথে ব্রেক কষল ড্রাইভার, টায়ারের সঙ্গে রাস্তার পিচের তীব্র ঘর্ষণে বিকট আওয়াজ উঠল, লাল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি ওর কাছ থেকে হাত বিশেক দূরে। গাড়ির জানালা দিয়ে হলদে রঙের একটা মুখ উঁকি দিল, মুচকি হাসছে।

ট্যাক্সি, জুন?

পা বাড়াল ক্লার্ক, উঠে বসল পেছনের সিটে, ড্রাইভার বিপজ্জনকভাবে স্পীড বাড়াল, দড়াম করে সিটের সাথে বাড়ি খেল ও, পঙ্খীরাজের গতিতে ছুটছে ট্যাক্সি। রাগ করল না ক্লার্ক। ট্যাক্সিঅলাদের এমন আচরণ গা সওয়া হয়ে গেছে।

কোনদিকে, জন? জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার। তার কাছে সবাই জন।

পায়া লেবার এয়ারপোর্ট।

পাঁচ ডলার-কেমন? তাকাল সে ক্লার্কের দিকে, মুখে চওড়া হাসি ফুটে উঠেছে। প্রত্যুত্তরে ক্লার্কও হাসল।

ফাজলামো হচ্ছে, না? তুমি কি আমাকে বোকা ট্যুরিস্ট ঠাউরেছ? তিন ডলার দেব, এক পয়সাও বেশি নয়।

ঠিক আছে, জন-সাড়ে তিন ডলার।

বললাম তো, তিন ডলারের এক পয়সাও বেশি নয়।

ঠিক আছে, জন-আপনার কথাই রইল। এখনও হাসছে ড্রাইভার, লোক চিনতে ভুল করেনি সে।

কোলিয়ার জেটি পার হয়ে গেল ওরা, দ্বীপের দূর প্রান্তের ব্যস্ত চায়না টাউনকেও পাশ কাটাল। এয়ারপোর্টে পৌঁছে ক্লার্ক ড্রাইভারকে তিন ডলার ছাড়া আরও পঞ্চাশ সেন্ট অতিরিক্ত বকশিশ দিল। তরুণ চাইনিজ ড্রাইভার খুশিতে হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল, গুনগুন করতে করতে আগের চেয়েও বেশি স্পীডে গাড়ি ছোটাল। বার-এ ঢুকে ব্রাণ্ডির অর্ডার দিল ক্লার্ক, গ্লাসটা নিয়ে চলে এল অবজারভেশন ব্যালকনিতে, ওর মক্কেলের আগমনের অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওয়েন হ্যারিসন আর আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবে। ক্লার্ক তার সাথে হ্যাণ্ডশেক করবে, নিরর্থক শুভেচ্ছা বিনিময় হবে, তার পরেরদিন ওর কাজ হবে আমেরিকানটাকে সিঙ্গাপুর ঘুরিয়ে দেখানো। এজন্য ক্লার্ক তিনশো ডলার পাবে। টাকার অঙ্কটাকে মোটেই মন্দ বলা যাবে না। কাজটা তেমন কঠিন নয় অথচ পারিশ্রমিক ভালো। এ ধরনের কাজ করে আরাম পায় ক্লার্ক। এ পর্যন্ত মক্কেল হিসেবে যত ট্যুরিস্ট ক্লার্কের কাছে এসেছে, এদেরকে হ্যাণ্ডল করতে কখনও তেমন বেগ পেতে হয়নি তাকে। বিশেষ করে আমেরিকানরা তো ইংরেজি জানা গাইড পেলে বর্তে যায়, থাক গাইডের ইংরেজি উচ্চারণে ভিনদেশী টান। এসব টুরিস্টদের আসলে মনে মনে করুণাই করে ক্লার্ক। এদেরকে তার মনে হয় মাথা। মোটা, যাদের কাজ সারাক্ষণ ক্যামেরায় হাবিজাবি ছবি তুলে রাখা, চোখের সামনে যা পড়ে তা-ই দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাওয়া। ক্লার্ক দেখেছে এরা অত্যন্ত স্বার্থপর স্বভাবের হয়, গরীব মানুষদের প্রতি বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ নেই, পাশ্চাত্য এবং পুবের মাঝে সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রতিও এতটুকু আগ্রহ নেই।

সবকিছুর প্রতি উন্নাসিক একটা ভাব, নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা। এদের কথা ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে ব্যালকনির রেলিং শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছিল ক্লার্ক, খেয়াল হতে ছেড়ে দিল। পাশ্চাত্যে জন্ম নিলেও মন-মানসিকতায় নিজেকে প্রাচ্যের ভাবধারায় গড়ে তুলছে বলেই হয়তো আমেরিকানদের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে। সে নিচে, এয়ার ফিল্ডের দিকে তাকাল। রুপোর মত চকচকে বিশাল এয়ারলাইনারটা স্থির হয়ে থাকা পাম গাছগুলোর মাথায় চক্কর দিচ্ছে। এসে গেছে তার মক্কেলের উড়ুক্কু বাহন।

অ্যারাইভালো লাউঞ্জের বাইরে এসে দাঁড়াল রিচার্ড ক্লার্ক, আয়না বসানো জানালা দিয়ে দেখল কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনের ভিড় ঠেলে যাত্রীদের স্রোত আসছে। নানা চেহারার,নানা আকৃতির প্রচুর মানুষ। তবে ভিড়ের মধ্যে ওয়েন। হ্যারিসনকে চিনে নিতে সমস্যা হলো না ক্লার্কের। পাসপোর্ট হাতে যাত্রীদের দঙ্গল থেকে সামান্য দূরে সরে দাঁড়িয়েছে সে; ফর্সা, থলথলে চেহারায় শিশুর সারল্য ফুটিয়ে তুলে ইতিমধ্যে ক্যামেরার শাটার টিপতে শুরু করেছে। নিজের কাছে যা-ই একটু অদ্ভুত বা আশ্চর্যের মনে হচ্ছে, খটাখট ছবি তুলে নিচ্ছে। এক মিনিটের ভেতরে সে তিনজন কাস্টমস অফিসার, চারটি ভাষায় লেখা ওয়েলকাম টু সিঙ্গাপুর সাইন এবং নিজের প্লেনের বেশকিছু যাত্রীর স্ন্যাপ নিয়ে নিল। ওয়েন হ্যারিসন বেশ লম্বা, মাংসল শরীর, মাথায় পাতলা চুল টাকের আভাস দিচ্ছে। তার পরনে পুরানো কিন্তু অত্যন্ত দামী গাঢ় নীল রঙের সুট, ঢোলা ট্রাউজার, পায়ের বাদামী জুতো জোড়া চকচক করছে। গলার উজ্জ্বল হলুদ রঙের টাইটা কড়া ভাঁজের সাদা শার্টের সাথে মন্দ লাগছে না। বোঝাই যায় দুধ-ঘি খাওয়া মানুষ, বেশ মালদার পার্টি, তবে করোনারি থ্রম্বসিসের শিকার হতেও বোধহয় বেশি দেরি নেই।

ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকল রিচার্ড ক্লার্ক নিজের জায়গায়। ফর্মালিটিজ সেরে, সুটকেস নিয়ে ওয়েন হ্যারিসন লাউঞ্জে এলে ওর দিকে এগিয়ে গেল সে। যথাসাধ্য। চেষ্টা করল চেহারায় অমায়িক ভাবটা ধরে রাখতে।

মি, হ্যারিসন?-আমি রিচার্ড ক্লার্ক, নিজের পরিচয় দিল ও। আশাকরি যাত্রা পথে কোন বিঘ্ন ঘটেনি। আমেরিকানটার দুঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, যেন অনেক। দিনের জানি দোস্তের সঙ্গে দেখা, এমন ভাব করে হাসি মুখে সে মোটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল ক্লার্কের দিকে।

আপনি তো, ভাই, খুব পাংচুয়াল দেখছি! একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির। লোকটার হাতের নখ সুন্দরভাবে কাটা, লক্ষ করল ক্লার্ক। আর গলার স্বরটাও গমগমে, বিশাল দেহের সাথে মানানসই।

ক্লার্ককে বেশিক্ষণ হাত ঝাঁকাবার সুযোগ দিল না হ্যারিসন, চট করে ক্যামেরাটা তুলে ধরল মুখের সামনে, বিল্ডিং-এর কোণায় সারং-কেবায়া পরা সুন্দরী, মালয়ী মেয়েটি অদৃশ্য হবার আগেই তার একটি ছবি তুলে রাখল। তারপর বোকা বোকা ভাব নিয়ে ঘুরল ক্লার্কের দিকে, যেন সঠিক সময়ে তরুণীর ছবি নিতে পেরে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছে। লোকটার ঢং দেখে গা জ্বালা করে উঠল ক্লার্কের।

হ্যারিসন জরুরী গলায় বলল, বেশ বেশ। এখন তবে যাত্রা শুরু করা যাক। মাত্র তিনদিন থাকব এখানে, তারপর ব্যবসার কাজে হংকং দৌড়াতে হবে। আশা করি, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনি আমাকে এমন সব জিনিস দেখাতে পারবেন, বাড়িতে যার গল্প করে বাহবা নিতে পারব।

একটা ট্যাক্সি নিল ওরা শহরে ফেরার জন্য। সারা রাস্তা হ্যারিসন ক্রমাগত ক্যামেরার বোম টিপে গেল। বর্ণাঢ্য চাইনিজ শব মিছিলের ছবি তুলল সে, ভাবগম্ভীর বুদ্ধ মন্দির এমনকি ঘামে ভেজা শ্রমিকের চেহারাও বাদ গেল না। গুড উড হোটেলে পৌঁছার আগ পর্যন্ত ক্লিক চলতেই থাকল। হ্যারিসন ড্রাইভারকে আমেরিকান ডলারে ভাড়া মেটালে লোকটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট কর। জবাবে ক্লার্কও একই কাজ করল। কোন মন্তব্য করল না। শত হলেও, ট্যাক্সির ড্রাইভার এবং তার কাজ একই।

ক্লার্কের ধারণা ছিল, হ্যারিসন লম্বা ভ্রমণের ধকল সামলাতে আজকের দিনটা অন্তত হোটেলে বিশ্রাম নেবে। কিন্তু কোথায় কি? ঘণ্টা তিনেক পরেই দেখা গেল সে ক্লার্ককে নিয়ে ব্লাকাং মাটি আইল্যাণ্ডে চলে এসেছে, সাম্পানে চড়ে মাছ ধরবে। কিন্তু মাছের বদলে তার বঁড়শিতে শুধু বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ ধরা পড়ল। ক্লার্ক এবং সাম্পানের জেলে অনেক কষ্টে তাকে ডেকে সাপ ওঠানোর প্রবল ইচ্ছে থেকে নিবৃত্ত করল। শেষে হতাশ হয়ে হ্যারিসন গলুইতে চিৎ হয়ে শুয়ে বড় স্ট্র হ্যাট দিয়ে মুখ ঢেকে হেঁড়ে গলায় হোম

অন দা রেঞ্জ গাইতে লাগল। সূর্যের খরতাপ যে তার রংধনু রঙের শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বারমুডা শর্টস পুড়িয়ে দিচ্ছে সেদিকে খেয়ালই নেই।

ওই দিন সন্ধ্যায় ওরা দুজন ট্রোইকা রেস্টুরেন্টে পেট পুরে ডিনার সেরে ফিলে এল হোটেলে। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে প্ল্যান করতে বসল পরদিন কোথায় কোথায় যাবে।

আগামীকাল, ব্রাণ্ডির গ্লাসের মুখে আলতোভাবে তর্জনী স্পর্শ করতে করতে ক্লার্ক বলল, আপনাকে থাইপুসামে নিয়ে যাব।

থাই পু...কি বললেন? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যারিসন, আরেকটু হলেই সিগারটা গিলে ফেলেছিল।

ক্লার্ক মনে মনে ভাবল গাড়লটাকে সব কথা ব্যাখ্যা না করলে কিছুই বুঝবে না।

সে বলতে শুরু করল, সিঙ্গাপুরে বিশ লাখেরও বেশি মানুষের বাস। এদের বেশিরভাগ চাইনিজ। এদেরও আবার ভাগ আছে, যেমন- হোক্কাইন, টিও চিউ, ক্যান্টোনিজ, হাইনানিজ, হাক্কা ইত্যাদি। এরা নানা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে এ ছাড়া ভারতীয় সিলোনিজ এবং মালয়ীদের সংখ্যাও প্রচুর।

থাইপুসাম হলো একটা হিন্দু উৎসবের নাম। ভারতীয় পূজারীরা রাস্তায় রাস্তায় এই উৎসবটি পালন করে তাদের প্রায়শ্চিত্তের নামে। কাল ওদের উৎসব মিছিল দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ভয়ও পেতে পারেন। কারণ তারা প্রায়শ্চিত্ত করে শরীর ধারাল পুঁই ফুটিয়ে, কখনও পায়ে স্রেফ নগ্ন পেরেকের স্যাণ্ডেল পরে। আবার কেউ কেউ তাদের নাক, জিভ, থুতনি বা শরীরের আলগা চামড়া বঁড়শি দিয়ে কুঁড়ে রাখে।

বিরতি দিয়ে চামড়ার আর্ম চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ক্লার্ক, লক্ষ করছে গল্প শুনে আমেরিকানটার কি প্রতিক্রিয়া হয়। বিরক্তি লাগল, কারণ হ্যারিসন ওর প্রতি তেমন। আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তবু সে বলে চলল।

কাবাডি হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের আরেক ধরন। জিনিসটা ভারী কাঠ দিয়ে তৈরি, তাতে ক্ষুরের মত ধারাল ব্লেড ঢোকানো। প্রায়শ্চিত্তকারীর দুকাঁধে কাঠের ফ্রেমটা বসানো হয়।

হ্যারিসন ক্লার্কের গল্প শুনছে না। তার সমস্ত মনোযোগ চাইনিজ ওয়েট্রেসের দিকে। মেয়েটির পরনে চিওংসাম। সে মদের বোতল নিয়ে ওদের টেবিলে আসছে, প্রতিটি পা ফেলার সময় বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত ধবধবে সাদা ঊরু দেখা যাচ্ছে কাটা পোশাকটার আড়াল থেকে। হ্যারিসন ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মেয়েটি যেন ইচ্ছে করে আরও বেশি নিতম্ব দোলাল। মদের বোতল রেখে মেয়েটি চলে যাচ্ছে, ওর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমেরিকান। তরুণী দৃষ্টির আড়াল হলে ফিরল সে ক্লার্কের দিকে।

চাইনিজদের সম্পর্কে যে সব গল্প শুনি সব কি সত্যি? হেসে উঠে জানতে চাইল হ্যারিসন।

খুব রাগ হলো লোকটার ওপর। শালার আমেরিকান জাতটাই এমন! দাঁতে দাঁত চাপল ক্লাক। তবে চেহারা স্বাভাবিক করে বলতে লাগল, চাইনিজদের সম্পর্কে যে যাই বলুক বা কেন, ওরা কিন্তু বেশ অদ্ভুত প্রজাতির মানুষ। ওদের সংস্কৃতি, রীতি-নীতিগুলোও ভারি অদ্ভুত। আবার হেলান দিল সে চেয়ারে, অপেক্ষা করছে হ্যারিসন তার টোপটা গেলে কিনা। মুখের সামনে ধোয়ার মেঘ জমেছে, আমেরিকানটার চেহারা দেখা যাচ্ছিল না, সে অধৈর্যভঙ্গিতে হাত নেড়ে ধোয়া সরাল, এবার আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল, যেমন? মাছ টোপ গিলেছে। ক্লার্ক প্রস্তুত হলো ওকে নিয়ে খেলতে।

যেমন, কিছু চীনা সম্প্রদায়ের লোক সংফিশের মাথাটাকে খুব সুস্বাদু মনে করে। কাঁটা বাদ দিয়ে পুরো অংশটাই খেয়ে ফেলে, পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, নয় কি?

এক পাশের ভুরু কপালের দিকে উঠে গেল হ্যারিসনের, ঠোঁটে শুকনো হাসি ফুটল, তবে কোন মন্তব্য করল না। ক্লার্ক তার গল্পটাকে আরও ফাঁপিয়ে তুলল।

তারপর ধরুন, এখানে, মানে সিঙ্গাপুরে, এক শ্রেণীর চীনা আছে, এরা সবসময় অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু এরা এমন এক ধরনের উৎসব করে যা নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না।

হ্যারিসন তার চেয়ারের এক কোণে কাত হয়ে বসেছিল, তার চেহারায় প্রবল আগ্রহের ভাব ফুটে উঠতে দেখে তৃপ্তি বোধ করল রিচার্ড ক্লার্ক। মনে মনে ভাবল, ব্যাটাকে বড় রকমের একটা ধাক্কা দিতে হবে।

সে আবার শুরু করল, এ চীনারা বিশ্বাস করে বানরের মগজ খেতে পারলে শুধু বুদ্ধি আর জ্ঞানই বাড়বে না, বৃদ্ধি পাবে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা, নিশ্চয়তা দেবে দীর্ঘ জীবনের। তবে মগজটা খেতে হবে জ্যান্ত বানরের মাথা থেকে, তাৎক্ষণিকভাবে, নইলে কাজ হবে না। ওরা করে কি, হতভাগ্য বানরটাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলে, তারপর মাথার খুলি ফাটিয়ে ভেতর থেকে মগজ বের করে এনে খায়। বানরটা মারা যাবার আগেই কাজটা করতে হয়। মানে যতক্ষণ জানোয়ারটা যন্ত্রণায় মোচড় খেতে থাকে, সেই সময়ের ভেতরে চীনারা খুবলে নেয় মগজ। সে দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। মগজ খুবলে নেয়ার সময় আহত বানরটা এমন ভয়ঙ্কর চিৎকার দিতে থাকে, এর চে ভয়াবহ ব্যাপার আর হয় না।

হ্যারিসনের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

এসব গল্প বলেই আপনি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করেন, না? চোখে না দেখলে আমি সত্যিই আপনার গল্প বিশ্বাস করব না। এ তো সাংঘাতিক অমানবিক কাণ্ড!

হাসল ক্লার্ক। ব্যাপারটা মানবিক না অমানবিক সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কোন পরিবেশে আপনি বড় হয়ে উঠেছেন তার ওপর। সত্যি বলতে কি, সবার মূল্যবোধও এক নয়। যারা এই কাজটা করে তাদের কাছে কিন্তু এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দুজনে। হ্যারিসনের এখনও সন্দেহ দূর হচ্ছে না। সে ক্লার্কের গল্পটা নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। আবার যখন কথা বলতে শুরু করল, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল সে।

তিনশো ডলার দেয়ার কথা ছিল আপনাকে। হিপ-পকেটের পেট মোটা মানিব্যাগ থেকে এক তাড়া নোটা বের করল সে, তিনশো ডলারের বেশিই হবে, টাকাটা টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল ক্লার্কের দিকে। আপনাকে অ্যাডভান্স দিলাম পুরোটাই। অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশ ডলার রাখুন। আশা করি আমাকে স্পেশাল কিছু জিনিস দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন।

টাকাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রিচার্ড ক্লার্ক, সিদ্ধান্ত নিল স্পেশাল কিছু জিনিস আমেরিকানটাকে দেখাবে সে। হ্যারিসন বিশেষ কিছু দেখার অধিকার রাখে। এমন কিছু যা সারা জীবন মনে থাকবে।

পরদিন সকালে একটা গাড়ি ভাড়া করে ক্লার্ক গুড উড হোটেলে চলে এল। হ্যারিসন যে জিনিস দেখতে চেয়েছে তার ব্যবস্থা সে করে এসেছে। গত রাতে, ক্লার্ক হোটেল থেকে চলে আসার পরে, হ্যারিসন নিজেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে রাতের শহরে বেরিয়ে পড়ে এবং এক প্রমোদবালাকে ভাড়া করে। লোকে চীনাদের সম্পর্কে যে গল্প বলে তা আদৌ সত্যি নয়, এই ব্যাপারটি হ্যারিসন আবিষ্কার করে ঠিকই, তবে যে জিনিসটি ওকে সবচে অবাক করেছে তা হলো, মাত্র বিশ ডলারের সে মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে মেয়েটির কাছ থেকে। তার রাতের অভিযানের গল্প শুনে ক্লার্ক মৃদু হাসল শুধু, মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করল না। তার মন পড়ে আছে অন্য জায়গায়। সে হ্যারিসনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সকালের বেশিরভাগ সময় কেটে গেল থাইপুসাম উৎসব দেখে। বলাই বাহুল্য, এই সময়ে এক মুহূর্তের জন্যেও হ্যারিসনের ক্যামেরা থেমে থাকেনি। উৎসাহ নিয়ে ছবি তুললেও তার চেহারা দেখে ক্লার্ক বুঝতে পারছিল আমেরিকানটা উৎসব দেখে খুব একটা মজা পাচ্ছে না। অথচ ক্লার্কের নিজের এই উৎসবটি খুবই পছন্দ। যতবার সে থাইপুসাম উৎসব দেখেছে ততবার মুগ্ধ বিস্ময়ে ভেবেছে ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলো কি করে এমন শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করছে। ওদের প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছে তার। এরকম মহান একটা ব্যাপারকে হ্যারিসন অবজ্ঞা করছে দেখে মনে মনে খুবই রুষ্ট হলো ক্লার্ক।

ওই দিন বিকেলে হ্যারিসনকে নিয়ে মাউন্ট ফেবারে উঠে দ্বীপ দেখাল ক্লার্ক, নিয়ে গেল টাইগার বাম গার্ডেনের ভৌতিক মূর্তিগুলোর কাছে, হাউস অভ জেড-এর নয়নাভিরাম সবুজ পৃথিবীও দেখাল। প্রতিটি জিনিস দেখানোর সময় সেগুলোর প্রাসঙ্গিক ইতিহাসও বর্ণনা করে চলল ক্লার্ক তার মক্কেলকে খুশি রাখতে।

রাতের বেলা রাগিস স্ট্রীটের একটি বার-এ ঢুকল ক্লার্ক হ্যারিসনকে নিয়ে। বসল কাঠের বেঞ্চিতে। এটা কুখ্যাত একটা জায়গা। দুনিয়ার মাতাল, চোর, বেশ্যা, ভিক্ষুক, পকেটমার, ফেরিঅলা আর বিকৃত রুচি লোকদের বাস এখানে। এখানে পয়সা দিয়ে পিপ কেনা যায়, যে কাউকে ইচ্ছে করলেই করা যায় শয্যাসঙ্গিনী। এই অন্ধকার জগতে দেখার মত অনেক কিছু আছে। হ্যারিসন বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল রঙমাখা একজোড়া বিচিত্র প্রাণীর দিকে। ওরা একদল ব্রিটিশ নাবিকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ক্লার্ক ঝাড়া বিশ মিনিট কসরতের পরে হ্যারিসনকে বোঝাতে সমর্থ হলো যে ওই মেয়েদুটো আসলে পুরুষ। একথা শুনে ওদের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল হ্যারিসন।

আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে দেখাতে পারি, ঠাণ্ডা বিয়ারের মগে চুমুক দিতে দিতে বলল ক্লার্ক, এ জায়গার সবচে সুন্দরী মেয়েটিও আসলে পুরুষ।

শুনে হ্যারিসনের সে কি হাসি! মদে ধরেছে ওকে। অতিরিক্ত মদ্য পানে অভ্যস্ত নয় সে। ঝোঁকের মাথায় তরুণ এক মালয়ীর সাথে জুয়ো খেলতে গিয়ে হেরে গেল। ক্লার্ক পাশে

বসে রইল চুপচাপ। ফুরফুরে বাতাস বইছে। ম ম করছে মসলার ঘ্রাণ। নাক টানল ও। ভালো লাগে ক্লার্কের অতি সাধারণ এই জীবন যাত্রা। এখানে এলে ও যেন মানবতার গন্ধ খুঁজে পায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার পুরানো প্রসঙ্গটা টেনে আনল ক্লার্ক।

আরও খানিকটা উত্তেজনার খোরাক পেতে চান? জিজ্ঞেস করল সে হ্যারিসনকে।

মানে? জড়ানো গলায় প্রশ্ন করল আমেরিকান। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে মুখ, নেশায় ঢুল ঢুলু চোখ। হাতে ধরা মদের পাত্রে চুমুক দিল। নীল ছবি দেখাবেন না?

না, জবাব দিল ক্লার্ক।

অনেক কষ্টে চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল হ্যারিসন, হাসল। অঃ, সেই বানরের মগজ খাওয়ার কথা বলছেন?

হ্যাঁ। যদি আপনার দেখার ইচ্ছে হয়, বলল ক্লার্ক, দম বন্ধ করে রইল জবাবের অপেক্ষায়।

বেশ! কখন? জানতে চাইল হ্যারিসন।

যেতে চাইলে এখনই।

মিনিট দশেক পরে ওরা আলোকিত শহর পেছনে ফেলে যাত্রা শুরু করল অন্য আরেক জায়গার উদ্দেশে।

.

মেইন রোড ছেড়ে গাড়ি নেমে পড়ল এবড়োখেবড়ো এক রাস্তায়, দুপাশে রাবার আর পাম গাছের সারি, মাঝখানে ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলল ওরা। নিকষ অন্ধকার চিরে দিচ্ছে হেডলাইটের আলো। মাঝে মাঝে সবুজ খেত দেখা গেল, গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড়ে পালাল এস্ত ইঁদুর। মেঠোপথ ধরে চলতে প্রচণ্ড আঁকি লাগছে বলে স্পীড কমিয়ে দিয়েছে ক্লার্ক, কাছের ডোবা বা জলা থেকে ভেসে এল কোলা ব্যাঙের কোরাস। পেছনের সিটে দলা মোচড়া হয়ে পড়ে আছে হ্যারিসন। মেঘ গর্জনের মত নাক ডাকছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতেও ঘুম ভাঙছে না। ক্লার্ক চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল একটা বাদুড় উড়ে গেল, পান্না সবুজ রঙের একটা সাপ দ্রুত রাস্তা পার হলো।

মাইল দুয়েক রাস্তা ড্রাইভ করার পরে ক্লার্ক গাড়ি ঢোকাল ছোট্ট একটি গ্রামের ভেতরে। বেশ কিছু ছোট কুটির দিয়ে ঘেরা গ্রামটা। গাড়ি থেকে নামতে বুড়ো এক চীনা হাতে তেলের প্রদীপ নিয়ে ক্লার্কের দিকে এগিয়ে এল। প্রদীপটা উঁচু করে ধরল, আগন্তুককে

চেনার চেষ্টা করছে। পরিচিত মানুষ দেখে তোবড়ানো গালে হাসির রেখা ফুটল। দপ দপ করে জ্বলছে প্রদীপ, তেল ফুরিয়ে এসেছে বোধহয়, বুড়োর লম্বা ছায়া পড়েছে মাটিতে, আলোতে ভৌতিক লাগছে চেহারাটা। বুড়োর হাসিতে উদ্ভাসিত মুখটা যেন একটা গুহা, কালো, বিনুনি করা চুল ঝুলছে থুতনির কাছে। অসংখ্য ভাঁজ আর রেখায় ভর্তি মুখটা চাষ করা জমির কথা মনে করিয়ে দিল, কোটরে ঢোকা কালো চোখ জোড়া ফাঁকা লাগছে। তবে সে যখন ঝুঁকে এসে গাড়িতে বাঁকা হয়ে শুয়ে থাকা হ্যারিসনকে দেখতে পেল, নিস্তেজ দৃষ্টিতে ঝিলিক। দিল আলো।

বেশ, বেশ মি. ক্লার্ক। আপনি আমাদের জন্যে একজন দর্শনার্থী নিয়ে এসেছেন!

বুড়োর খনখনে কণ্ঠ শুনে বা অন্য যে কোন কারণে হোক, ঘুম ভেঙে গেল হ্যারিসনের। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল সে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ঝিমঝিম ভাবটা কাটছে না কিছুতেই। অনেক কসরত করে গাড়ির দরজা খুলে পা রাখল মাটিতে, সিধে হতেও রীতিমত হিমশিম খেতে হলো। শেষে খোলা দরজার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কোনমতে।

আসল জায়গায় এসে পড়েছি নাকি? আধ বোজা চোখে একবার চারপাশে দেখল হ্যারিসন, গলা থেকে কোলা ব্যাঙের ডাক বেরিয়েছে।

হ্যাঁ, জবাব দিল ক্লার্ক। লিম চং আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। আমি এখানে আছি। ওসব জিনিস আগেও দেখেছি। আর দেখতে চাই না।

বিড়বিড় করে কি বলল হ্যারিসন বোঝা গেল না, বুড়ো চাইনিজকে অনুসরণ করল। কাছের একটা কুটিরের দিকে হাঁটছে লিম চং, তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে হ্যারিসনের। ঘরের ভেতর সে ঢুকতেও পারল না, তার আগেই মেঝের ওপর পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে।

জ্ঞান ফিরে পাবার পরে ওয়েন হ্যারিসন প্রথমেই নিজেকে ধিক্কার দিল কেন বোকার মত সে স্থানীয় চোলাই মদকে পাত্তা দিতে চায়নি। এগুলোর সাংঘাতিক তেজ বোঝাই যাচ্ছে। হ্যাংওভার কাটেনি এখনও। তালুটা ফেটে যেতে চাইছে। সে একটা হাত তুলে কপালটা চেপে ধরতে চাইল, পারল না। অজানা একটা ভয়ে গায়ে কাঁটা দিল। ভয়টাকে দূর করতে হ্যারিসন ভাবতে লাগল সে কোথায়। এসেছে। মাথাটা কাজ করছে না ঠিকমত, আর চোখেও ভালো দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকারে ডুবে আছে ও, নিজের হাত-পাও ঠাহর হচ্ছে না। দোরগোড়ায় একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে বটে কিন্তু ওটার আয়ু প্রায় শেষ। কারণ একেবারে মিটমিটে আলো। হঠাৎ বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে উঠল হ্যারিসনের প্রদীপটাকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। কেউ একজন প্রদীপটা হাতে তুলে নিয়েছে, যদিও দেখা যাচ্ছে না তাকে। অবশ্য একটু পরেই লোকটাকে দেখা গেল আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে। তেল দেয়া হয়েছে প্রদীপে। সেই বুড়ো লিম চং। বুড়ো

সলতেটা উস্কে দিল, লাফিয়ে উঠল আগুন, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ কুঁচকে গেল হ্যারিসনের।

এসব হচ্ছেটা কি? চেঁচিয়ে উঠল ও। ক্লার্ক কোথায়?

লিম চং প্রদীপটাকে কাঠের একটা পায়ার ওপর রেখে দিল, তারপর এগিয়ে গেল হ্যারিসনের দিকে।

মি. ক্লার্ক কাছে পিঠেই আছেন, বলল সে নরম গলায়।

বুড়োর মুখ থেকে বিকট গন্ধ আসছে, মুখ ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল হ্যারিসন। পারল না। পরমুহূর্তে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। সাথে সাথে জমে গেল আতঙ্কে। ওকে ভারী একটা কাঠের নেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, মাথাটা ঢোকানো হয়েছে কাঠেরই তৈরি সঁশির মত একটা যন্ত্রের ভেতরে। যন্ত্রটা এমনভাবে ওর মাথা চেপে আছে, ডানে বা বায়ে ফিরে তাকানোর উপায় নেই। একটা ঘোরের ভেতর এতক্ষণ ছিল বলে হ্যারিসন বুঝতে পারেনি আসলে সে কাঠের চেয়ারটাতে বন্দী হয়ে আছে। কিন্তু কেন? কারণটা বুঝতে না পারলেও অজানা সেই ভয়টা আবার ফিরে এল ওর মাঝে।

তোমরা কি চাও আমার কাছে? টাকা? তাহলে যা আছে নিয়ে যাও। দয়া করে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করে দাও! চিৎকার করে উঠল হ্যারিসন, তবে কাজ হলো কোন।

লিম চং ঘুরে ওর পেছনে চলে এল, মুখ খুলতে সেই পচা গন্ধটা নাকে ধাক্কা মারল হ্যারিসনের।

না, স্যার। আপনার টাকার দরকার নেই আমাদের।

একটু পরেই ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল হ্যারিসন। বুড়ো ক্ষুরের মত ধারাল কিছু একটা জিনিস বসিয়ে দিয়েছে ওর কপালের পাশে, হেয়ার লাইনের ঠিক নিচে। পাগলের মত ধস্তাধস্তি করল ও, লাভ হলো না। বাধন ছিঁড়ল না। সাহায্যের আশায় চিৎকার করে ক্লার্ককে ডাকল সে, কিন্তু কেউ ওর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না। তবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে হ্যারিসন।

ব্যাথটা অসহ্য। কোন কিছুর সাথে তুলনা দেয়া যায় না। হ্যারিসন টের পেল তার খুলি থেকে মাংসসহ চুল কেটে নেয়া হচ্ছে, ঘাড় এবং মুখ বেয়ে গরম রক্ত নামতে শুরু করল, চোখে আঠালো ধারাটা পড়তে আচ্ছন্ন হয়ে এল দৃষ্টি, লালচে কুয়াশার একটা আবরণ সৃষ্টি হলো সামনে। গলার সমস্ত রগ ফুলে উঠল হ্যারিসনের চিৎকার দিতে গিয়ে, বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা পাজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে। ভীষণ আতঙ্ক ওকে প্রায় অবশ করে দিল। শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে যেন প্রতিবাদ করেও লাভ

হবে না জেনে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হ্যারিসনের। এখন আর চিৎকার করছে না, গোঙাচ্ছে অস্ফুটে আর ওকে দয়া করতে বলছে। শেষের দিকে কর্কশ, ফেঁপানোর মত আওয়াজ বের হতে লাগল গলা থেকে। শিশুর মত কাঁদতে শুরু করল হ্যারিসন, লবণাক্ত জলের সাথে রক্ত ঢুকে গেল মুখে।

উখা বা করাত ঘষার খরখরে শব্দ শুনতে পেল হ্যারিসন হঠাৎ। লিম চং জিনিসটা দিয়ে ওর খুলি কাটতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড ভয়ে কেঁপে উঠল হ্যারিসন, বিস্ফারিত চোখে দেখল ওর খুলির ছোট ছোট সাদা হাড় মেঝের ওপর ছিটকে পড়ছে।

গোঙাতে গোঙাতে চোখ তুলে চাইল হ্যারিসন। ওর সামনে হলদে রঙের ভৌতিক কয়েকটা মুখ, প্রদীপের কাঁপা আলোতে দেখা গেল শয়তানী হাসি সব কটার ঠোঁটে। ওদের ভেতরে রিচার্ড ক্লার্কও আছে। কেমন জব্দ! নিঃশব্দে হেসে যেন বলছে ও। হ্যারিসন দেখল উপস্থিত দর্শকদের সবাই সাগ্রহে থাবার মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার খুলি লক্ষ্য করে। পরক্ষণে মাথায় ভয়ঙ্কর একটা ব্যথার অনুভূতি ওর সারা শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আঁধার হয়ে এল দুনিয়া, শেষ মুহূর্তে, বহু কষ্টে চোখ মেলে তাকাল হ্যারিসন। দেখল ওদের দুজন রক্ত মাখা, স্পঞ্জের মত ধূসর একটা জিনিস মুখে পুরে কচমচ করে চিবুতে শুরু করেছে। তার পরপরই নিঃসীম আঁধার আবার গ্রাস করল হ্যারিসনকে।

ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে নিজের বাংলোয় ফিরে এল রিচার্ড ক্লার্ক। এখন ভালো করেই জানে এই জীবনে আর ইংল্যাণ্ডে ফেরা হবে না তার। অবশ্য তাতে অসুবিধে নেই কোন। গাইডের ব্যবসাটা ভালোই জমে উঠেছে, আর প্রাচ্যের রহস্যময়তা তাকে এমন মুগ্ধতায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে যে এখান থেকে কোথাও যাবার ইচ্ছেও তার নেই।

বিশ্বাসঘাতিনী

ব্রিটানির এক প্রাসাদে বাস করত তরুণ এক ব্যারন। দেশের রাজা তাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ব্যারন। ব্যারনের স্ত্রী ছিল খুবই সুন্দরী। তবে তার মনটি সুন্দর ছিল না। সে তার স্বামীর সঙ্গে হেসে হেসে অনেক ভালোবাসার কথা বলত। কিন্তু আদপেই ব্যারনকে পছন্দ করত না সে। মহিলা তার হৃদয় উৎসর্গ করে রেখেছিল এক নাইটকে। সে শুধু ভাবত কবে স্বামীকে ছেড়ে নাইটের কাছে পাকাপোক্ত ভাবে চলে যাওয়া যাবে। নাইটকে বিয়ে করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য।

প্রতি হপ্তায় পালা করে তিনদিন ব্যারন প্রাসাদে অনুপস্থিত থাকত। তার স্ত্রী কিংবা কেউ জানত না সে কোথায় গেছে বা কী করছে। মহিলা খালি চিন্তা করত কীভাবে জানা যায় হপ্তায় তিনদিন তার স্বামী কোথায় যায়। একদিন স্বামীকে অনেক আদর টাদর করার পর সে জিজ্ঞেস করল, যদি সাহস দাও তো তোমাকে একটি অনুরোধ করতে চাই, মাই লর্ড।

হাসল ব্যারন। তুমি জানো তোমার অনুরোধ আমি ফেলতে পারব না। তো শুনি কী চাও তুমি।

প্রতি হপ্তায় তিনদিন তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় যেন চলে যাও। তোমাকে ছাড়া এ বিশাল প্রাসাদে আমার খুবই একা লাগে। তোমাকে অনুরোধ, আমাকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যেয়ো না।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ব্যারন। ঠোঁট থেকে মুছে গেছে হাসি। কথা বলার সময় বিরক্তি প্রকাশ পেল কণ্ঠে।তোমার সঙ্গে সবসময় থাকতে পারলে তো ভালোই হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

তাহলে তুমি কোথায় যাও এটুকু অন্তত বলল। তাতেও খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারি। কিন্তু জবাব দিল না ব্যারন। তার স্ত্রী নাকি সুরে ঘ্যানঘ্যান করেই যেতে লাগল। বালিশ ভিজিয়ে ফেলল চোখের জলে। কাঁদতে কাঁদতে বলল ব্যারন আসলে তাকে ভালোবাসে না। তাই বলতে চায় না সে কোথায় যায়। বৌকে ভালোবাসত ব্যারন। তার আকুল কান্নায় বিচলিত বোধ করল সে। শেষে বাধ্য হলো মুখ খুলতে। তবে আগে স্ত্রীকে কসম খাইয়ে নিল গভীর গোপন ব্যাপারটি যেন কেউ জানতে না পারে।

আমি আসলে এক ওয়্যারউলফ, বলল সে। তবে ঘটনাচক্রে আমি ওয়্যারউলফে পরিণত হয়েছি। তাতে আমার কোনও হাত ছিল না। প্রতি হপ্তায় তিনটি দিন আমাকে মায়া নেকড়ের রূপ ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়।

তুমি কীভাবে ওয়্যারউলফে পরিণত হও? জানতে চাইল স্ত্রী।

জঙ্গলে ঢুকে আমি পরনের সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলি। তারপর একটি বিশেষ জায়গায় ওগুলো লুকিয়ে রাখি যাতে পরে ওগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর নেকড়েতে রূপান্তর ঘটে আমার। তিনদিন পরে গায়ে পোশাক চড়াতেই আমি আবার মানুষ হয়ে যাই। মাই লর্ড, তুমি নেকড়ে হওয়ার সময় জামাকাপড় কোথায় লুকিয়ে রাখ? সতর্কতার সাথে প্রশ্ন করল ধূর্ত স্ত্রী।

সে কথা কাউকে বলা যাবে না। কারণ তিনদিন পার হয়ে গেলে আমি যদি জামাকাপড় পরতে না পারি, চিরদিনের জন্য নেকড়ে বনে যাব আমি। ওই পোশাক আবার না পরা পর্যন্ত নেকড়ে হয়েই থাকতে হবে আমাকে।

স্বামীর গোপন রহস্য জেনে খুশিতে বাগ বাগ মহিলা। তবে ওই মুহূর্ত থেকে সামান্যক্ষণের জন্যও সে শান্তি দিল না ব্যারনকে। বারবার একই প্রশ্ন করতে লাগল। বলল স্বামীর ভালোর জন্যই সে জানতে চায় ওয়্যারউলফে পরিণত হওয়ার সময় ব্যারন কোথায় লুকিয়ে রাখে পোশাক। ব্যারন স্ত্রীকে ভালোবাসত, বিশ্বাসও করত। শেষে বলল, জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা একটি চ্যাপল আছে। ওটার কাছে একটি ঝোঁপের আড়ালে রয়েছে ফাঁপা একখণ্ড পাথর। আমি ওই পাথরের ফাঁকে লুকিয়ে রাখি আমার জামা-কাপড়।

মহিলা স্বামীকে চুমু খেয়ে বলল, ব্যারন তাকে বিশ্বাস করে সবচেয়ে গোপন কথাটিও বলে দিয়েছে দেখে সে অভিভূত। সে কথা দিচ্ছে ব্যারনের গোপন রহস্য কোনদিন ফাস করবে না।

কিন্তু ব্যারন যে-ই একা একা প্রাসাদ থেকে রওনা হলো জঙ্গলের উদ্দেশে, তার স্ত্রী ছুটে গেল প্রেমিক নাইটের কাছে। তাকে খুলে বলল সব। অনুরোধ করল ভাঙা চ্যাপেলে গিয়ে ফাঁকা পাথর থেকে স্বামীর পোশাক নিয়ে আসতে। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজটি করল নাইট। ব্যারনের স্ত্রী স্বামীর জামাকাপড় একটি সিন্দুকে লুকিয়ে রাখল।

তিনদিন পরে মায়ানেকড়েরূপী ব্যারন ফাঁপা পাথরের কাছে এসে দেখে তার জামাকাপড় গায়েব। বুঝতে পারল তার স্ত্রী তার সঙ্গে বেঈমানী করেছে। কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। কারণ জঙ্গলের বাইরে গেলেই লোকের চোখে পড়লে তারা শিকারী কুকুর খেপিয়ে দেবে, ছুঁড়ে মারবে পাথর, মুগুরপেটা করবে। বনে লুকিয়ে না থাকলে তার জীবন সংশয় হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

কয়েক হপ্তা পার হয়ে গেল। বাড়ি ফিরল না ব্যারন। তার স্ত্রী খানিক চোখের জল ফেলল তবে চেঁচামেচি করল কয়েকগুণ বেশি। চিৎকার করে অভিযোগ করল তার স্বামী তাকে ফেলে রেখে গেছে। তারপর সে প্রেমিক নাইটকে বিয়ে করল। সব ভালোয় ভালোয় মিটে যাওয়ায় দুজনেই সন্তুষ্ট।

এদিকে নেকড়ে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে। বেঁচে থাকার জন্য প্রাণী হত্যা করে ক্ষুধা মেটায়। আর মনে মনে শুধু আফসোস করে কেন বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে গোপন কথাগুলো বলতে গিয়েছিল।

এভাবে একটি বছর কেটে গেল। একদিন রাজা ওই জঙ্গলে এলেন শিকারে। শিকারী কুকুরের দল মাটিতে নেকড়ের পায়ের ছাপ দেখে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। তাদেরকে ধরে রাখে কার সাধ্য। তারা নেকড়ের পিছু নিল। সারাটি দিন কুকুরগুলো ধাওয়া করল নেকড়েকে। রাজা তার পরিবারবর্গ নিয়ে ছুটলেন। কুকুরের পেছন পেছন। সন্ধ্যা নাগাদ, ক্রমাগত ধাওয়া খেয়ে ক্লান্ত, কাঁটার আঘাতে আহত এবং বিপর্যস্ত নেকড়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ল। সে নিশ্চিত আজই মৃত্যু ঘটবে তার শিকারী কুকুরের হাতে। হঠাৎ রাজাকে দেখতে পেল সে। মনে পড়ল এই রাজা একসময় তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শরীরে যতটুকু শক্তি ছিল, কুকুরগুলোর সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে, তাদের ধারাল দাঁত এবং থাবার আঘাত উপেক্ষা করে সে ছুটে গেল রাজার কাছে। একটা থাবা রাখল রাজার ঘোড়ার রেকাবে এবং রাজার পায়ের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। খ্যাকখ্যাক করতে করতে তেড়ে এল হাউণ্ড বাহিনী। রাজা চাবুক মেরে ওগুলোকে সরিয়ে দিলেন। ভৃত্যদের আদেশ দিলেন কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখতে।

এই বেচারী বুনো জন্তুটি আমার কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়েছে, বললেন রাজা। ওকে আমি দয়া করব। ওকে আমি ছেড়ে দেব। ও মুক্তভাবে জঙ্গলে চলাফেরা করুক। ঘোড়া নিয়ে ঘুরলেন তিনি। চললেন প্রাসাদে। কিন্তু নেকড়ে তাকে ছেড়ে গেল না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে

রাজার ঘোড়ার পাশে হাঁটতে লাগল। এভাবে প্রাসাদের ফটক পর্যন্ত চলে এল সে। সবাই দৃশ্যটি দেখে আশ্চর্য।

নেকড়েটি আমার কাছে আশ্রয় চাইছে, বললেন রাজা। আমি ওকে আশ্রয় দেব। সে যতদিন ইচ্ছে আমার প্রাসাদে থাকতে পারবে।

তিনি সবাইকে বলে দিলেন কেউ যেন নেকড়েটির কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা না করে। নেকড়ের জন্য প্রতিদিন তাজা মাংসের বন্দোবস্ত করা হলো। নেকড়ে থেকে গেল প্রাসাদে। সে প্রাসাদের কারও কোনও ক্ষতি করে না। সবার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করে। আর রাজাকে অত্যন্ত ভক্তি করে। রাজা যেখানে যান, তাঁর সঙ্গী হয়। নেকড়ে। দিনের বেলাটা সে রাজার পাশে থাকে, রাতে রাজার পায়ের কাছে ঘুমায়। রাজা তার কুকুর বাহিনীর চেয়েও বেশি ভালোবাসেন এই নেকড়েটিকে।

কিছুদিন পরে রাজা তাঁর রাজ্যের সকল জমিদারকে দাওয়াত দিলেন দরবারে। জমিদারদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করলেন, পেটপুরে শাহী ভোজ খাওয়ালেন। এই জমিদারদের মধ্যে সেই নাইটও ছিল যে ব্যারনের স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। সে যখন তার সহকারীদের নিয়ে দরবারে ঢুকল, রাগে গরগর করে উঠল নেকড়ে, পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাইটের গায়ে। তাকে যেন গেঁথে ফেলল মাটির সঙ্গে। আশপাশের লোজন সাহায্যের জন্য এগিয়ে না এলে নেকড়ের কামড়ে সেদিন মারাই যেত নাইট। তারা বহু কষ্টে নেকড়ের কবল থেকে উদ্ধার করল নাইটকে।

রাজা এ দৃশ্য দেখে খুবই অবাক। কারণ এর আগে নেকড়েটিকে কারও ওপর হামলা করতে শোনেননি তিনি, দেখা দূরে থাক। তবে শুধু একবার নয়, অন্তত তিনবার নেকড়ে নাইটের ওপর হামলার চেষ্টা করল। নাইটের বন্ধুরা প্রতিবারই তাকে পিটিয়ে খেদাল। নাইট অথবা নেকড়ে, দুজনের যে কেউ মারাত্মক আহত হতে পারে আশংকা করে রাজা নাইট না যাওয়া পর্যন্ত নেকড়েকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন। নাইট নেকড়েকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে দেখে মনে মনে স্বস্তি পেল। নেকড়েটি হঠাৎ তার উপর কেন এমন খেপে উঠল এর সদুত্তর না পেয়ে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের প্রাসাদে রওনা হলো সে।

এর কয়েক মাস পরের ঘটনা। রাজা আবার সেই জঙ্গলে শিকারে বেরিয়েছেন। তিনি রাতের বেলা জঙ্গলের ধারে, ব্যারনের প্রাসাদের অদূরে তাঁবু খাটালেন। ব্যারনের সাবেক স্ত্রী নিজের এবং তার নাইট স্বামীর জন্য রাজ-অনুগ্রহ পাবার আশায় পরদিন সকালে ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো রাজার তাঁবুতে। সে রাজার জন্য প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে এসেছে। কিন্তু রাজার কাছে আসামাত্র বিকট গর্জন ছেড়ে তার ওপর হামলে পড়ল নেকড়ে। ভয়ে আর্তনাদ ছাড়ল মহিলা। রাজা চট করে দাঁড়িয়ে গেলেন মহিলার সামনে। ফলে নেকড়ের হামলা ব্যর্থ হলো। রাজা না থাকলে মহিলার লোকজন তক্ষুণি মেরে ফেলত নেকড়েকে। রাজার ভয়ে কিছু বলল না।

রাজা নেকড়েকে জড়িয়ে রাখলেন দুহাতে যাতে সে ছুটে যেতে না পারে। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, এই মহিলা ব্যারনের স্ত্রী ছিল। ব্যারন ছিল আমার বন্ধু। সে হঠাৎ করে কোথায় গায়েব হয়ে গেছে কেউ জানে না। যে নাইটকে আমার নেকড়ে হামলা করেছিল সে এই মহিলার দ্বিতীয় স্বামী। সে এখন আমার বন্ধুর জমিদারি শাসন করছে।

রাজা মহিলা এবং নাইটকে রশি দিয়ে বেঁধে মাটির নিচে একটি ঘরে বন্দি করে রাখলেন। অন্ধকার, শীতল ওই ঘরে না খেয়ে থাকতে থাকতে ভয়ে, দুশ্চিন্তায় মহিলার প্রাণ যায় যায়। অবশেষে নিজের অপরাধ স্বীকার করল সে, বলল ব্যারনের জামাকাপড় কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। নেকড়ের সামনে রাখা হলো কাপড়গুলো। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কী ঘটে দেখার জন্য। কিন্তু নেকড়ে শুধু জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়েই রইল, নড়াচড়া করল না।

ও আসলে সাধারণ একটি নেকড়ে ছাড়া কিছু নয়, মন্তব্য করল এক পরিষদ। আমরা আমাদের ব্যারনকে কোনদিনই ফিরে পাব না। রাজা মৃদু গলায় বললেন, এত লোকের সামনে নেকড়ে থেকে ব্যারনে রূপ নিতে ও লজ্জা পাচ্ছে। তিনি জামাকাপড়গুলো নিয়ে নিজের শোবার ঘরের দিকে কদম বাড়ালেন। পেছন পেছন চলল নেকড়ে। রাজা কাপড়গুলো বিছানার ওপর রেখে চলে এলেন। ভেতরে। নেকড়েকে রেখে বন্ধ করে দিলেন দরজা। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। দেখলেন বিছানায়

শুয়ে আছে তরুণ ব্যারন। ঘুমাচ্ছে। রাজা তখন যে কী খুশি হলেন তা লিখে বোঝানো যাবে না।

ব্যারনের সাবেক স্ত্রী এবং নাইটকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন রাজা। ব্যারন ফিরে পেল নিজের প্রাসাদ এবং জমিদারি। তবে সে তার বেশিরভাগ সময় মানুষ অথবা নেকড়ের বেশে কাটিয়ে দিল রাজার দরবারে।

ভুডু

সেদিন যদি বৃষ্টি না হত, এসব কিছুই ঘটত না। বেলাল চাচা বেঁচে থাকতেন আর আমার বোনেরও অমন দশা হত না।

চিলেকোঠায় হানা দেয়ার মতলব ছিল তিতলি আপুর। ওর বয়স পনেরো আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। আর আমি ওকে খুব ভয় পাই। ও যা বলে বিনাবাক্যব্যয়ে সব পালন করি।

বেলাল চাচা কিংবা মলি চাচীকে একবার বলা উচিত ছিল না? জিজ্ঞেস করলাম তিতলিকে।

আরে, গাধা ওরা কি বাসায় আছে নাকি যে অনুমতি চাইবি? খেঁকিয়ে উঠল তিতলি আপু যেন পাঁচ বছরের একটা মেয়েকে চোখ রাঙাচ্ছে। বড় বোনদের নিয়ে এই-ই সমস্যা- তারা ভাবে তারা সবজান্তা, আসলে সবকিছু জানে না। চাচা-চাচী বাসায় থাকলেই কী না থাকলেই কী, বলে চলল আপু। আমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি চিলেকোঠায় টু দেব, দেবই। তোর ইচ্ছে হলে আসবি না হলে নাই।

তিতলি আপুর সঙ্গে আমি পারতপক্ষে তর্ক করি না মার খাওয়ার ভয়ে। অবশ্য চিলেকোঠায় উঁকি দেয়ার ইচ্ছে আমারও কম নয়। বাবা-মা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পরে চাচা-চাচীর বাড়িতে এসেছি মাস ছয় হতে চলল। চিলোকোঠার ঘরটির প্রতি আমাদের দুবোনেরই দুর্দমনীয় আকর্ষণ। কিন্তু ও ঘর দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত পড়ে আছে বলে ওখানে আমাদের যাওয়া বারণ। শহরের উপকণ্ঠে বেলাল চাচার এই বিশাল বাড়িটির বয়স নাকি প্রায় শতাব্দী ছুঁই ছুঁই। আমাদের জমিদার প্রপিতামহ এ বাড়ি বানিয়েছেন। বংশের শেষ প্রদীপ নিঃসন্তান বেলাল চাচা তার স্ত্রীকে নিয়ে এ বাড়িতে এখন বাস করছেন। বাড়ির সামনে বিরাট একটি বাগানও আছে। তবে বর্ষা চলছে বলে আমরা বাগানে তেমন খেলতে যাই না। আজ ছুটির দিন, চাচা-চাচী জরুরী কী একটা কাজে বাইরে গেছেন, অবসর কাটানোর মত তেমন কিছু নেই, তাই চিলোকোঠায় উঁকি দেয়ার পরিকল্পনা করেছে। তিতলি আপু।

মই বেয়ে চিলোকোঠার ঘরে উঠে এল আপু, পেছন পেছন আমি। যেন আলাদিনের গুহায় ঢুকেছি। বড় বড় ট্রাংক, বাক্স, আসবাব। একটা মস্ত কাঠের সিন্দুকও আছে। ধুলো পুরু হয়ে জমে রয়েছে ওগুলোর ওপর। জিনিসগুলো দেখে প্রথমদিকে উত্তেজনাবোধ করলেও একটু পরেই হারিয়ে ফেললাম আগ্রহ। ভেবেছিলাম গুপ্তধন-টন পেয়ে যাব। জমিদার বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে কাঠের সিন্দুকে গুপ্তধনের ম্যাপট্যাপ থাকে, গল্পে পড়েছি। কিন্তু এ ঘরের সিন্দুকে হাবিজাবি বোঝাই। আবর্জনার বর্ণনা দিয়ে আপনাদের মেজাজ খারাপ করতে চাই না। তবে আমার মেজাজ খারাপ হলো চিত্তাকর্ষক

কিছু দেখতে না পেয়ে। আপুকে বললাম এই আধা-অন্ধকার, গুমোট ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি নিচে যাচ্ছি।

দাঁড়া, এই ট্রাঙ্কটা একটু খুলে দেখি, আমাকে বাধা দিল তিতলি আপু। পুরানো একটা ট্রাঙ্ক খুলছে ও।ট্রাঙ্কের মাথায় কালো, বড় বড় অক্ষরে লেখা J.C.

J.C. মানে জামিল চৌধুরী। আমাদের বড় চাচা। আমাদের জন্মেরও আগে। মারা গেছেন। বাবার কাছে বড় চাচার অনেক গল্প শুনেছি। উনি ছিলেন বিশ্ব পর্যটক। পৃথিবীর এমন দেশ নেই যেখানে ঘুরতে যাননি। শুনেছি বোর্নিওতে জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা গেছেন জামিল চাচা। চাচার ট্রাঙ্কের ভেতরে হয়তো রহস্যময় কিছু পাওয়া যাবে ভেবে আমরা উৎসাহী হয়ে উঠলাম। কিন্তু পুরানো জামা-কাপড় আর ভ্রমণ সংক্রান্ত মোটামোটা ইংরেজি বই ছাড়া আর কিছু নেই। না, আছে আপু কাপড়ের স্তূপের নীচ থেকে বের করে আনল জিনিসটা।

একটা পুতুল।

কাপড়ের পুরানো একটা পুতুল। ভুল বললাম কাপড় নয়, কতগুলো পালক দিয়ে বানানো হয়েছে পুতুলটাকে। গায়ে কাপড়ের পরিমাণ খুবই অল্প। চোখের জায়গায় সাদা বৃত্ত একে কালো কালি দিয়ে চোখের মণি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কদাকার দেখতে।

জানিস এটা কী? জিজ্ঞেস করল তিতলি। ডান-বামে মাথা নাড়লাম আমি। জানি না। এটা হলো ভুডু পুতুল। বলে পুতুলটা আমার মুখের সামনে এনে হাউ করে উঠল ও।

ফাজলামি কোরো না তো! মুখ সরিয়ে নিলাম আমি। ভুডু কী জিনিস?

কালো যাদু। ক্যারিবিয়ানের লোকজন ব্লাক ম্যাজিক বা কালো যাদুর চর্চা করে। জামিল চাচা নিশ্চয় ওখানে গিয়েছিল। ভূতের ওঝারা এসব ভুডু পুতুলের গায়ে পিছনের খোঁচা মেরে মানুষজনকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলে। আরও কতকিছু করে!

তুমি এতসব জানলে কী করে? ভুডু পুতুলের এত ক্ষমতা বিশ্বাস হতে চাইল না আমার।

কেন, বইতে পড়েছি, বলল তিতলি আপু। সেবার হরর লেখক অনীশ দাস অপুর ভুডুর ওপর একটা বই আছে। ওতে ভুডু নিয়ে বিস্তারিত সব লেখা আছে, ছবিসহ।

তিতলি আপু হাতের পুতুলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওর চাউনিটা কেমন অদ্ভুত। আমার গা শিরশির করে উঠল।

আমার দিকে চোখ তুলে চাইল আপু। জানিস, ওই বইটা পড়ার পরে আমার বহুবার মনে সাধ জেগেছে। ইস, ওরকম একটা পুতুল যদি সত্যি পেতাম! স্বপ্নটা আজ পূরণ হলো।

লেখকরা বানিয়ে অনেক কিছু লেখে। তা কখনও সত্যি হয় নাকি? ঠোঁট ওল্টালাম আমি।

তুই ভুডু পুতুল সম্পর্কে কিছুই জানিস না। তাই গাধার মত কথা, বলছিস, দাবড়ি দিল আপু। ভুডু সত্যি নাকি মিথ্যা তার প্রমাণ তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

পুতুল নিয়ে নিচে নেমে এল তিতলি আপু। ওর পড়ার টেবিলের পিন কুশন থেকে একটা পিন নিল। বিড় বিড় করে বলল, এটা কার ওপর ব্যবহার করা যায় ভাবছি। হঠাৎ চোখ পড়ল বুড়ো মালী বারেক দাদুর ওপর। শুনেছি এ বাড়িতে বহুদিন ধরে আছে মানুষটা। তার একমাত্র কাজ বাগানের যত্ন নেয়া। মাঝে মধ্যে বাড়ির ফাইফরমাশও খাটে। তবে বেশিরভাগ সময় তাকে দেখি নাক ডেকে ভোসভোস করে ঘুমাচ্ছে। লোকটা অলস এবং ফাঁকিবাজ।

বারেক দাদুকে দিয়েই এক্সপেরিমেন্টটা হয়ে যাক! উৎসাহী গলায় বলল তিতলি আপু।

বুড়ো লোকটাকে আমার তেমন পছন্দ হয় না। কাজেই তাকে দিয়ে আপু ভুডু এক্সপেরিমেন্ট করবে শুনে আমি সোৎসাহে আপুর কথায় সায় দিলাম। তাছাড়া সত্যি এতে কাজ হয় কিনা দেখার কৌতূহলও হচ্ছিল বেশ।

বারেক দাদু বারান্দার কাঠের টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল। তিতলি আপু বলল, আমাদের শুধু যা করতে হবে তা হলো এ পুতুলটাকে ভাবতে হবে বারেক দাদু। পণ্ডিতি ভঙ্গিতে আমার ওপর লেকচার ঝাড়ছে ও। পুতুলের গায়ে যে-ই পিনের খোঁচা দেব, দেখবি দাদু বাবারে মারে করে চিৎকার দিয়ে উঠেছে।

আমরা পুতুলটার দিকে তাকিয়ে এক মনে ভাবতে লাগলাম, এটা বারেক দাদু। তারপর তিতলি পুতুলের পিঠে ঢুকিয়ে দিল পিন।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

বলেছিলাম না এসব ভুয়া, হি হি করে হেসে উঠলাম আমি।

চুপ! এটা ভুয়া না, ঠোঁট কামড়াল আপু, এটা দিয়ে তো কাজ হবার কথা ছিল। হয়তো আমি কোনও ভুল করে ফেলেছি।

আমার বড় বোনের মাথায় একবার কোনও মতলব ঢুকলে ওটা সে হাসিল করে ছাড়বেই।

আয় আমার সঙ্গে, হুকুম দিল আপু। ওর পেছন পেছন চললাম চাচার লাইব্রেরিতে। চাচা বইয়ের সাংঘাতিক পোকা। হাজার হাজার বই আছে তাঁর। আমি অবশ্য গল্পের বইটই

তেমন পড়ি না। তিতলি আপু পড়ে। তবে বেশিরভাগ হরর গল্প। এজন্যই বোধহয় ওর মাথায় সবসময় হরর চিন্তা গিজগিজ করে।

চাচার বিশাল লাইব্রেরির একটা আলমারি বোঝাই শুধু সেবা প্রকাশনীর বই। মাসুদ রানা, অনুবাদ, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা। আরও কত কী! তিতলি আপু আলমারি খুলে একটা বই বের করল।

বইয়ের নাম ভুডু লেখক অনীশ দাস অপু। আপু বইয়ের পাতা খুলে মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ল কিছুক্ষণ। তারপর লাফিয়ে উঠল, ইয়েস! পেয়ে গেছি!

কী পেয়েছো?

এখানে লিখেছে ভুডু পুতুল দিয়ে ভূতের ওঝারা যার ক্ষতি করতে চাইত, আগে ওই লোকের শরীর থেকে কিছু একটা সংগ্রহ করে নিত।

কী রকম?

ধর চুল-টুল জাতীয় কিছু।

আমরা চলে এলাম বারান্দায়। এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না। বেশ ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইছে। শীতল বাতাসে বারেক দাদু রীতিমত নাক ডাকতে লেগেছে।

বুড়োর মাথা থেকে কীভাবে চুল আনা যায় বল তো?

ফিসফিস করল আপু।

গিয়ে বলব নাকি দাদু তোমার এক গাছি চুল দেবে? আমাদের খুব দরকার।

আরে ছাগল, ভৎর্সনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল তিতলি। তাহলে তো বুড়ো সন্দেহ করে বসবে। হঠাৎ কী দেখে যেন ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পেয়ে গেছি।!।

কী পেয়েছে?

বুড়োর টুপি। ওর টুপিতে নিশ্চয় চুল লেগে আছে। আঙুল বাড়িয়ে বারেক দাদুর মাথার টুপিতে ইঙ্গিত করল আপু। যা, টুপিটা খুলে নিয়ে আয়! আদেশ করল ও।

আমি পারব না বাপু! সভয়ে এক কদম পিছিয়ে গেলাম। যদি জেগে যায়?

যতসব ভীতুর ডিম, আমার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তিতলি আপু। তারপর পা টিপে টিপে এগোল বারেক দাদুর দিকে। পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মিনিটখানেক। আমি দশ হাত দূরে দাঁড়িয়েও বুড়োর নাসিকা গর্জন শুনতে। পাচ্ছি। মনে হচ্ছে বোমা ফাটালেও এ ঘুম ভাঙবে না। দেখলাম আপু আলগোছে দাদুর মাথা থেকে সাদা টুপিটি খুলে নিল। টুপির ভিতরে চালিয়ে দিল আঙুল। তারপর আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল টুপি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল আপু। তারপর বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এল। মুঠো খুলে দেখাল। কয়েক গোছ সাদা চুল হাতে।

টেপ দিয়ে চুলের গোছা ভুডু পুতুলের গায়ে লাগিয়ে দিল তিতলি আপু। ফিরে এলাম বারান্দায়। দাঁড়ালাম একটা থামের আড়ালে। হাতে আলপিন নিয়ে আপু বলল, নে, এবার আবার আগের মত ভাবতে শুরু কর।

আমরা আবার ভাবতে লাগলাম পুতুলটা অন্য কেউ নয়, স্বয়ং বারেক দাদু। তারপর ওটার নিতম্বে পিন ফুটিয়ে দিল আপু।

বিকট একটা চিৎকার দিয়ে টুল থেকে লাফিয়ে উঠল বুড়ো, পাছায় হাত ঘষছে। চেহারায় যন্ত্রণা এবং হতবিহ্বল ভাব।

হিসহিস করে উঠল আপু, কাজ হয়েছে!

এটা কাকতালীয়ভাবেও ঘটতে পারে, বললাম আমি।

ঘটনা দেখে অবাক হলেও আমি বিস্ময়ের ভাবটুকু গোপন করেছি। কারণ চাই না আপু বুঝে ফেলুক তার কর্মকাণ্ডে আমি মুগ্ধ এবং তাজ্জব।

তোর বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ঠিক আছে, দ্যাখ! বলতে বলতে পিনটা এবার পুতুলের পায়ে ঢুকিয়ে দিল তিতলি। আরেকটা আর্তনাদ ছাড়ল দাদু, এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাগল। যে পায়ে খোঁচা খেয়েছে সেই ঠ্যাঙটা হাত দিয়ে ধরে লাফাচ্ছে।

তিতলি আপু এবার পুতুলের অপর পায়ে পিন ফোঁটাল। বাবারে মারে! বলে বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ধপাশ।

বারেক দাদুকে কোলা ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। আপু আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে দ্রুত বারান্দা থেকে টেনে নিয়ে এল পাছে বুড়ো আমার হাসি শুনতে পায়।

দেখলি তো কী জিনিস আমরা পেয়ে গেছি, বিজয় উল্লাস আপুর চোখে। সত্যিকারের একটি ভুডু পুতুল!

.

চাচা-চাচী বাসায় ফিরলেন বিকেল পাঁচটায়। তিতলি আপু আমাকে বলল, চল, একটু মজা করে আসি। পুতুল নিয়ে নিচে নেমে এলাম আমরা। চাচা-চাচী বাগানে চেয়ার পেতে বসেছেন। বারেক দাদু তাঁদের জন্য চায়ের আনজামে ব্যস্ত। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে বেচারা। যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারা।

আপনার কী হয়েছে, বারেক চাচা? উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন মলি চাচী। খোঁড়াচ্ছেন কেন?

জানি না, আম্মা... দুপুরবেলা একটু ঝিমুনির মত আইছিল... হঠাৎ পায়ে এমন বেদনা হইল... লাফ মাইরা উঠলাম, চেহারা করুণ করে বলল বারেক দাদু।

বাতের ব্যথা নয়তো? জানতে চাইলেন বেলাল চাচা। তোমার তো মাঝে মধ্যেই বাতের ব্যথা ওঠে।

বাতের বেদনা নয় গো, ছোট সাব। বাতের বেদনা এত ব্যথা দেয় না। মনে হইল কেউ আমার পায়ে গরম লোহার পেরেক ঢুকাইয়া দিছে।

আমরা রান্নাঘরে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে খিকখিক করে হাসলাম। এখান থেকে বাগান দেখা যায় পরিষ্কার, লোকজনের কথাও শোনা যায় স্পষ্ট।

আমাকে পুতুলটা একটু দাও না, ফিসফিস করে বললাম তিতলি আপুকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার হাতে পুতুলটা দিল ও। আমি পুতুলের হাঁটুতে ঘঁাচ করে ঢুকিয়ে দিলাম পিন।

বারেক বুড়ো লাফ মেরে হাঁটু চেপে ধরল, তার সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মলি চাচীর গায়ে। চাচী পট থেকে চা ঢালছিলেন কাপে। হাত থেকে ছিটকে গেল। পট। মাটিতে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল। চাচা হাত বাড়িয়ে চাচীকে না ধরলে পটের সঙ্গে তাঁরও পপাত ধরণীতল হত।

আয় হায় আম্মা। এইডা কী হইল। মাফ করেন গো, আম্মা। আমারে মাফ কইরা দেন। হাঁটুর ব্যথা ভুলে গিয়ে চাচীর কাছে হাত জোর করে মাফ চাইতে লাগল মহা বিব্রত বারেক দাদু।

না, না। ঠিক আছে, নিজেকে সামলে নিয়েছেন চাচী।

বেলাল চাচা বুড়োকে বললেন, বারেক চাচা, তোমার আসলে ডাক্তার দেখানো উচিত। কল্লোল সাহেবকে ফোন করে দিচ্ছি। তুমি তার চেম্বারে চলে যাও।

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল আমাদের হাউজ ফিজিশিয়ান। কাছেই তাঁর চেম্বার। রিকশা করে যাওয়া যায়।

.

সে রাতে শুতে যাবার সময় তিতলি আপুকে বললাম সে যেন পুতুলটা জামিল চাচার ট্রাঙ্কে ভরে রেখে আসে। কারণ এমন অশুভ শক্তির একটা জিনিস নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভালো। কখন কী অঘটন ঘটে যায় কে জানে! পুতুল দিয়ে মজা করা এক জিনিস আর মানুষের ক্ষতি করা আরেক জিনিস, আপুকে বলেই ফেললাম শংকার কথা।

রাখ তোর পণ্ডিতি, ঝংকার দিয়ে উঠল তিতলি আপু। কারও যদি আমি ক্ষতি করিই তো তোর কী? আমার যারা ক্ষতি করেছে আমি তাদের এবারে মজা টের পাইয়ে দেব। আর শোন- হঠাৎ আমার হাতটা জোরে মুচড়ে দিল ও। ভুডু পুতুলের কথা আমরা ছাড়া কেউ জানে না। তুই যদি কাউকে বলেছিস তো আরেকটা মোচড় দিল হাতে।-এ পুতুল দিয়ে তোর বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব।

পরদিন পুতুল নিয়ে স্কুলে গেল তিতলি। ও আর আমি একই স্কুলে পড়ি। আপু নাইনে, আমি সিক্সে।

হস্তিনী জাহেদার আজ খবর আছে, স্কুলে ঢুকতে ঢুকতে বলল তিতলি আপু। জাহেদা ওর ক্লাসমেট। ইয়া মোটা। কমপক্ষে ৯০ কেজি হবে ওজন। আপুর সঙ্গে তার প্রায়ই খিটিমিটি লাগে।

লাঞ্চ ব্রেকের আগে আর তিতলি আপুর সঙ্গে দেখা হলো না। ওকে খুশি খুশি লাগছে।

হস্তিনীটাকে আজ উচিত শিক্ষা দিয়েছি, হেসে উঠল ও। তারপর ঘটনাটা বলল।

জাহেদার পাশে আপু আজ সেধে গিয়ে বসেছিল। জাহেদা ক্লাস চলার সময় টয়লেটে গেলে সে চট করে ওর ব্যাগ খুলে চিরুনি বের করে। চিরুনিতে জাহেদার চুল লেগে ছিল। আপু চুলগুলো লাগিয়ে দেয় ভুডু পুতুলের মাথায়।

ভূগোল ক্লাসে বসে ওকে শায়েস্তা করেছি, খিক খিক হাসল তিতলি আপু। তুই তো জানিস আমাদের ভূগোলের প্রাকটিকাল আলাদা ক্লাসে হয়। আমি সবার পেছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিলাম। তারপর চুপিসারে পুতুলটা বের করে আনি ব্যাগ খুলে। না, আজ পিন ব্যবহার করিনি। পুতুলটার মাথাটা শুধু একটু মুচড়ে দিয়েছিলাম। তাতেই হস্তিনীর অবস্থা যদি তুই দেখতি, তুলি! মাথা চেপে ধরে। মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে খেতে বাচ্চাদের মত চিৎকার করছিল আর গোঙাচ্ছিল!

জাহেদার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সবাই। টিচার স্কুলের এক বুয়াকে দিয়ে তক্ষুনি জাহেদাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। হস্তিনী কাল আবার আসুক। আরেকটা ডোজ দেব ওকে। ওর মাথা যন্ত্রণা ইহ জীবনে যাতে না ছাড়ে সে ব্যবস্থা আমি করছি।

আপুর চেহারাটা হঠাৎ করুণ দেখাল। তবে দুঃখ কী জানিস, ওকে বলতে পারব না এসব কাণ্ড আমিই ঘটাচ্ছি। ও জীবনেও জানতে পারবে না আমার সঙ্গে ঝগড়া করার শোধ নিচ্ছি এভাবে। বললেই তো পুতুলের কথা জেনে যাবে।

আমার দিকে তাকাল আপু, চাউনিতে স্পষ্ট হুমকি। আমাদের গোপন কথাটা কেউ জানবে না, তাই না, তুলি?

পরদিন জাহেদা স্কুলে এসে আবার তিতলি আপুর প্রতিহিংসার শিকার হলো। ভয়াবহ মাথা ব্যথা নিয়ে আজও তাকে স্কুল ছাড়তে হলো। তারপরের দিনও একই ঘটনা ঘটল। আসলে আমার বোনটা সাংঘাতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ। একবার কারও ওপর রেগে গেলে তার চরম সর্বনাশ না করে ছাড়ে না।

মুটকি জাহেদাকে আমারও পছন্দ নয়। কিন্তু দিনের পর দিন ওকে এভাবে নির্যাতিত হতে দেখে ওর জন্য শেষে খারাপই লাগছিল। কিন্তু আমি কী করব? আমি আপুকে একবার অনুরোধ করেছিলাম জাহেদাকে আর কষ্ট না দিয়ে রেহাই দিতে। সে আমার

দিকে এমন হিমদৃষ্টিতে তাকাল যে আমার বুকের রক্ত জমে বরফ। বলল আমি যেন নিজের চরকায় তেল দিই নইলে আমারও নাকি জাহেদার মত অবস্থা হবে।

যতই দিন যাচ্ছে, তিতলি আপুকে ততই যেন গ্রাস করে নিচ্ছে অশুভ ভুডু পুতুল। কোনও কারণ ছাড়াই সে বারেক দাদুর পেছনে লেগে রয়েছে। নানানভাবে ত্যক্ত করছে মানুষটাকে। বেচারাকে এখন প্রায়ই দৌড়াতে হচ্ছে ডাক্তার কল্লোলের কাছে কখনও হাত, কখনও পিঠ কখনও বা পেটে ব্যথা নিয়ে।

তিতলির কবল থেকে যেন কারও রেহাই নেই। সেদিন ওর ঘরে গিয়ে দেখি বিছানায় বসে চাচার পুরানো সিগার বক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বক্সটা বেশ ফুলো ফুলো দেখাচ্ছে।

কী আছে এর ভেতরে? জানতে চাইলাম আমি।

গর্বভরে ভেতরের জিনিসগুলো বের করে আমাকে দেখাল ও। অনেকগুলো দেশলাইয়ের বাক্স। গায়ে হিজিবিজি হস্তাক্ষরে নানাজনের নাম লেখা। বেশিরভাগ ওর ক্লাসের সহপাঠীদের নাম, দুএকজন শিক্ষকেরও নাম আছে।

তুমি এদের সবার চুল জোগাড় করে এসব বাক্সে রেখেছ? জানতে চাইলাম আমি।

শুধু চুল না-আরও অনেক কিছু আছে, জবাব দিল আপু। রিদওয়ান রহমান লেখা একটি দেশলাইয়ের বাক্স খুলল ও। মি. রহমান ওদের ম্যাথ টিচার। বাক্সের ভেতর রক্তমাখা পুরানো তুলল।

রহমান সারের আঙুল কেটে গিয়েছিল টেবিলের ধারালো কোনায় লেগে। জানাল তিতলি আপু। রক্ত মুছে তুলোটা তিনি ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন। আমি ওটা কুড়িয়ে এনেছি।

রক্ত দিয়েও কাজ হয়?

অবশ্যই। যে কোনও কিছু-লোকের শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকলেই হলো।

আরেকটা বাক্স খুলল তিতলি। ভেতরে দুতিনটে কাটা নখ।

এ নখগুলো কার?

বেলাল চাচার। শয়তানি হাসি ফুটল আপুর মুখে। আঁতকে উঠলাম আমি। কিন্তু এগুলো দিয়ে কী করবে তুমি?

তোর কী ধারণা, ছাগল? দ্যাখ-আমি মলি চাচীও এক গোছা চুল জোগাড় করেছি।

কি-কিন্তু কেন? তুমি নিশ্চয় ওদের কোনও ক্ষতি করবে না?

না, এখনই সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই। তবে বাধ্য হলে করব।

কাজটা ঠিক হচ্ছে না, আপু, বললাম আমি। এ জিনিসগুলো এক্ষুনি ফেলে দাও। নইলে–

নইলে কী?

আমি তোমার ভুডু পুতুলের কথা সবাইকে বলে দেব।

আরেকটা দেশলাইয়ের বাক্স বের করল তিতলি। ওতে আমার নাম লেখা। খবরদার কাউকে এ কথা বলবি না। বললে তোর দশা কী হবে বুঝতে পারছিস?

বাক্স খুলল ও। ভেতরে আমার দুধ দাঁত। জীবনের প্রথম দুধ দাঁত। যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম নিজের টেবিলের ড্রয়ারে। তিতলি আপু কখন ওটা হাতিয়ে নিয়েছে টেরও পাইনি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে! ভয় পেয়ে গেলাম আমি।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ভয়ে শুকিয়ে গেছে কলজে। যে সব জিনিস জোগাড় করেছে তিতলি আপু ও দিয়ে অনেক লোকের ক্ষতি করতে পারবে ও। আমাকেও যে ছেড়ে কথা কইবে না তা তো বুঝিয়েই দিল। অবশ্য যদি আমার আপন বোন হত তা হলে নিশ্চয় আমার ক্ষতি করার হুমকি দিত না। ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই বলেই আমার ক্ষতি করতে দ্বিধা করবে না তিতলি। দিন দিন যেভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠছে, আমার মন বলছে শীঘ্রি খুব খারাপ কিছু হয়তো ঘটবে।

এক হপ্তা পরে সত্যি ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ঘটল। ভুডু পুতুল নিয়ে দিনরাত মেতে থাকা তিতলি আপু স্কুলের পড়ায় একটুও মন দিচ্ছিল না। সাপ্তাহিক পরীক্ষাগুলোয় বেশিরভাগ সাবজেক্টে ফেল করছিল ও। শাস্তি হিসেবে হেড মিস্ট্রেস ওকে নাচের দল থেকে বহিস্কার করলেন। বললেন সাপ্তাহিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না করা পর্যন্ত ওকে নাচের দলে নেয়া হবে না। ওর জায়গায় শারমিন দীপা নামে একটি মেয়ে সুযোগ পেয়ে গেল। দীপার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে কারণ তিতলি আপু এ মেয়েটির একগুচ্ছ চুল তার সিগার বক্সে সযত্নে রেখে দিয়েছে।

ঘটনাটা যখন ঘটাল আপু, আমি তখন ওর সঙ্গে ছিলাম। আমরা স্কুলের মূল সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের স্কুলটা বিশাল। তিনতলা। নাইন এবং টেনের ক্লাস নেয়া হয় তিনতলায়। তিতলি তার ইউনিফর্মের পকেটে ঢুকিয়ে এনেছে ভুডু পুতুল। শাস্তি দেবে শারমীন দীপাকে। শারমীন দীপার অপরাধ সে আপুর জায়গা দখল করার

পরে নাকি মশকরা করে বলেছিল, তোমার কপাল ভালোই পুড়েছে, তিতলি। মনে হয় না নৃত্যাঞ্জলিতে নাচার সুযোগ তুমি আর কোনদিন পাবে।

নৃত্যাঞ্জলি নামে চ্যানেল আইতে একটি নাচের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আমাদের স্কুল ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। আগামী সোমবার অনুষ্ঠানটির রেকর্ডিং। আপুর খুব শখ ছিল টিভিতে নাচবে। কিন্তু শখটা আর পূরণ হলো না। শারমীন দীপার নাম ছিল ওয়েটিং লিস্টে। তিতলি আপু দল থেকে বাদ পড়ায়। টিভিতে চেহারা দেখানোর সুযোগ পেয়ে গেছে ও। এমনিতেই অপমানে জ্বলছিল আপু, তার ওপর দীপার বক্রোক্তি ছিল ওর জন্য কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। রাগে ওর ফর্সা মুখ লাল। আমি ভেবেছি শারমীন দীপাকে হয়তো হালকা শাস্তি দেবে আপু। কিন্তু ওর প্রতিহিংসা যে কত ভয়ানক চাক্ষুস প্রমাণ পেলাম সেদিন। ক্রুদ্ধ ঘোড়ার মত মেঝেতে পা ঠুকছিল আপু। আর ও রেগে গেলে উন্মাদ হয়ে ওঠে। এবং উন্মাদ হয়ে উঠলে যা খুশি তাই করতে পারে তিতলি আপু।

ওই যে আসছে ইঁদুরটা, সাপের মত হিসহিস করে উঠল আপু। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নামছে শারমীন দীপা। আপু পকেট থেকে পুতুলটাকে বের করেই বা পায়ে দিল এক মোচড়।

প্রাণঘাতী আর্তনাদ বেরিয়ে এল দীপার মুখ থেকে। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম ওর বাঁ পা অদ্ভুতভাবে বাঁকা হয়ে গেছে, পরমুহূর্তে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল দীপা। ডিগবাজি খেতে

খেতে সিঁড়ি বেয়ে ছিটকে মেঝেতে হাঁটু ভাঙা দ-এর মত পড়ল। পড়েই থাকল। আর নড়াচড়া করছে না। পতনের চোটে নাক-মুখ ফেটে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সবাই ছুটে এল। ক্লাসে যাচ্ছিলেন আমাদের এক টিচার, মি. শামসুদ্দীন। তিনিও ছুটে এলেন। তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন রক্তাক্ত দীপাকে দেখে। ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনা হলো। দীপাকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

শারমীন দীপার এমন অবস্থা দেখে আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল। তিতলি আপুর খুবই অন্যায় হয়েছে কাজটা। তার বদলে দীপাকে তার নাচের দলে নেয়া হয়েছে এটা নিশ্চয় মেয়েটার দোষ নয়। আর দীপা যদি আপুকে নিয়ে একটু মশকরা করেই থাকে তাই বলে এত বড় শাস্তি দিতে হবে? দীপার নিশ্চয় পা ভেঙে গেছে। কিন্তু আমার বোনের কোনও বিকার দেখলাম না। সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওখান থেকে। মুখে তৃপ্তির হাসি।

এবার দেখব শারমীন দীপা কীভাবে টিভিতে নাচে! কণ্ঠে বিষ ঢেলে বলল আপু।

পরদিন স্কুলে এসে শুনলাম দীপাকে ভাঙা পা নিয়ে কমপক্ষে পনেরো দিন হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে। আরও একমাসের আগে তার হাঁটাচলার জো নেই। তিতলি আপুকে আবার নাচের দলে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে শারমীন দীপা দেড়মাস স্কুলে আসতে পারবে না শুনে সে দুঃখ প্রকাশ তো করলই না বরং মুচকি হেসে আমাকে বলল, আমার সঙ্গে লাগতে এলে এখন থেকে সবার দশা এরকম করব। কাউকে ছেড়ে দেব না।

তিতলি আপুকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। দিন দিন ও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। ওকে কী করে ঠেকাব বুঝতে পারছি না।

একদিন সকালে বেলাল চাচার কাছে একটি চিঠি এল। লিখেছেন আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। চিঠি পড়ে রেগে আগুন চাচা।

তিতলি কোথায়? গর্জন ছাড়লেন তিনি।

ওর ঘরে, বললাম আমি।

ঝড় তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন চাচা। আমার চাচার স্বভাবটা শান্ত। তবে রেগে গেলে তিনি বাঘ। আমি চাচার পেছন পেছন ওপরে চলে এলাম। তবে আপুর ঘরে ঢোকার সাহস হলো না। দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার পাশে। ভয়ে ধড়ফড় করছে বুক। চাচা যেরকম রেগেছেন আপুর কপালে কী আছে আল্লাই জানেন...।

এর মানে কী! বেলাল চাচার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ভেসে এল। তোমার হেডমিস্ট্রেস কমপ্লেন লেটার পাঠিয়েছেন। বলছেন তুমি নাকি পড়াশোনায় একদম মনোযোগী নও। সাপ্তাহিক সবগুলো পরীক্ষায় ফেল মেরে বসে আছ। আর শিক্ষকদের সঙ্গেও নাকি ভালো ব্যবহার

করছ না। তুমি জানো কত কষ্ট করে ওই স্কুলে তোমাদের দুবোনকে ভর্তি করিয়েছি? হেডমিস্ট্রেস যদি এখন তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দেন?

জবাবে বিড়বিড় করে কী যেন বলল তিতলি আপু ঠিক বোঝা গেল না।

তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলি, তিতলি, শোনো, গরগর করে উঠলেন চাচা। এখন থেকে প্রতিদিন স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে সোজা হোমওয়ার্ক নিয়ে বসবে। আমি নিজে তোমার পড়া নেব। আমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমার ছুটি নেই।

তাই নাকি? ভেসে এল তিতলি আপুর চিৎকার, তুমি আমাকে জোর করলেই হলো? আমাকে তোমার শাসন করার অধিকার নেই। কারণ তুমি আমার বাবা নও! চটাস করে চড় মারার শব্দ হলো। সাথে সাথে আপু গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল।

আবার যদি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেছ? ভেসে এল চাচার গমগমে কণ্ঠ। তারপর খুলে গেল দরজা। থমথমে চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলেন চাচা।

আমি আপুর ঘরে ঢুকলাম। বিছানায় বসে কাঁদছে ও। ফর্সা ডান গাল লাল হয়ে আছে। আঙুলের দাগ পড়ে গেছে। আমাকে দেখে মুখ তুলে তাকাল ও।

ও কে যে আমার গায়ে হাত তোলে? ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল তিতলি আপু, তোর বাবা-মা পর্যন্ত কোনদিন আমার গায়ে একটা টোকা পর্যন্ত দেয়নি। আর ওই লোকটা আমাকে এভাবে মারল! ঠিক আছে, আমিও দেখাচ্ছি মজা।

লাফ মেরে বিছানা ছাড়ল আপু। ছুটে গেল ওয়াড্রোবের সামনে। ওর রাতের পোশাকের নিচে লুকানো সিগার বক্স। বের করল ওটা। বক্স খুলে বের করল বেলাল চাচার নাম লেখা দেশলাইয়ের বাক্স।

ক-কী করছ তুমি? আঁতকে উঠলাম আমি।

দ্যাখ না কী করি!

তিতলি আপু বেলাল চাচার একটা কাটা নখ পুতুলের গায়ে সেঁটে দিল সেলোটেপ দিয়ে। তারপর মুখটা বিকৃত করে ধাই করে পিন ঢুকিয়ে দিল পুতুলের বুক বরাবর।

নিচে, লাইব্রেরি ঘর থেকে ভেসে এল বেলাল চাচার চিৎকার।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে ছুটলাম। ভয়ে শুকিয়ে গেছে কলজে। জানি না কী দেখব!

বেলাল চাচা লাইব্রেরি ঘরের মেঝেতে বুক চেপে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখ, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। গলা দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ বেরুচ্ছে।

আমি ঘর ফাটিয়ে চিৎকার দিলাম, চাচীইই!

.

স্কয়ার হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স চলে এল। ডা. কল্লোল ফোন পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছেন। চাচাকে পরীক্ষা করে বললেন হার্ট-অ্যাটাক। রক্তশূন্য মুখে মলি চাচী চাচাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠলেন। কল্লোলও গেলেন সঙ্গে। আমি ছোট বলে সঙ্গে নিলেন না। আর তিতলি আপু ঘর থেকেই বেরুল না। বারেক দাদু দেশের বাড়ি। অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতলে রওনা হবার পরে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে ওপরে চলে এলাম। সোজা ঢুকলাম তিতলির কামরায়। সে বিছানায় বসে কুৎসিত চেহারার পুতুলটাকে আদর করছে। পুতুলের বুকে তখনও গেঁথে আছে আলপিন।

তুমি মানুষ নও, ডাইনি! তিতলির দিকে তাকিয়ে গলা ফাটালাম আমি। পর যে আপন হয় না তুমি আজ আবার প্রমাণ করলে। বাবা-মা যে কী কুক্ষণে তোমার মত মেয়েকে দত্তক নিয়েছিলো! চাচা যদি মরে যায়!

শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল তিতলির চোখ।তোরা কেউ আমার আপন নোস্ তা তো ভালো করেই জানিস তা হলে আবার প্যাচাল পাড়ছিস কেন? তোর চাচা মরে গেলে আমার কী? আমার গায়ে হাত তুলেছে। এখন তার ফল ভোগ করুক।

আমি কটমট করে তাকিয়ে থাকলাম তিতলির দিকে। তোমাকে আমার আপু ডাকতেও ঘৃণা হচ্ছে! বলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

রাত নটার দিকে মলি চাচী হাসপাতাল থেকে ফোন করলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন মারা গেছেন বেলাল চাচা। এটা তাঁর দ্বিতীয় হার্ট স্ট্রোক। ডা, কল্লোল নাকি চাচার প্রথমবার স্ট্রোকের সময়ই বলেছিলেন দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হলে চাচাকে বাঁচানো মুশকিল হবে। চাচা সাবধানতা অবলম্বন করে চলতেন। কিন্তু তিতলি তাকে বাঁচতে দিল না।

.

চাচী বাসায় ফিরলেন রাত একটার সময়, লাশ দাফন করে। জানালেন ডা. কল্লোলই সব ব্যবস্থা করেছেন। আমাদেরকে গোরস্তানে যেতে দেয়া হয়নি যদি ভয় পাই! ঢাকায় চাচীর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। পরম আত্মীয়ের কাজ করেছেন কল্লোল চাচা। তার স্ত্রী, ওয়ানাইজা চাচী সর্বক্ষণ ছিলেন মলি চাচীর সঙ্গে। রাতে আমাদের সঙ্গে থাকতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু মলি চাচী বললেন দরকার নেই।

ওয়ানইজা চাচী চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন মলি চাচী। তার সঙ্গে আমিও কাঁদলাম। একবার ভাবলাম চাচীকে বলে দিই ভুডু পুতুলের কথা। কিন্তু বিশ্বাস করবেন না বলে চুপ করে রইলাম। বেলাল চাচাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি আমাদেরকে বাবার আদর দিয়ে পিতা-মাতার মৃত্যু শোক অনেকটাই ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ তিতলিটা এরকম একজন মানুষের ভালোবাসার প্রতিদান দিল এভাবে!

কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন চাচী। আমি একটা কথা দিয়ে তার গা ঢেকে দিলাম। তারপর চলে এলাম তিতলির ঘরে। তিতলি নাইটি পরে আছে তবে ঘুমায়নি এখনও। ভুডু পুতুলটাকে দোল খাওয়াচ্ছে আর গুনগুন করে গান গাইছে। আমার ওর দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করছিল না। ঘেন্না লাগছিল। চলে আসছি, পেছন থেকে খপ করে আমার হাত চেপে ধরল তিতলি। ঘুরলাম আমি। তিতলির চোখ উন্মাদের মত চকচক করছে।

পুরো ঘটনাটার জন্য মলি চাচী আমাকে দোষারোপ করবে জানি আমি, খসখসে গলায় বলল ও। পুতুলটার কথা অবশ্য সে জানে না, তবে বেলাল চাচার সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি তো শুনেছে। সে ধরেই নেবে আমার কারণে হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে চাচার।

ঠিকই তো, তোমার জন্যই মারা গেছে চাচা। এই পুতুলটা তোমাকে একটা ডাইনি বানিয়েছে, আপু।

আপু বলতে চাইনি, কিন্তু মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে।

আমি ডাইনি না, হিসিয়ে উঠল তিতলি, ডাইনি তোর মলি চাচী। সে তোকে যতটা ভালোবাসে তার সিকিভাগও আমাকে বাসে না। বাসবেই বা কেন আমি তো তোর আপন বোন নই। এখন আমার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়বে। কিন্তু আমি সে সুযোগ তাকে দেব না।

কেন? কী করবে তুমি তার? আমার মুখ শুকিয়ে গেল। প্লীজ, চাচীর কোন ক্ষতি কোরো না।

এ বাড়িতে শুধু তুই আর আমি থাকব, শীতল হাসল তিতলি। তোকে আমি যতই বকঝকা করি না কেন তোকে আমি যথেষ্ট ভালোবাসি, তুলি। এ বাড়িতে শুধু আমরা দুজন থাকলে কেউ আমাদেরকে চোখ রাঙাতে পারবে না, কিছু বলতে পারবে না।

তিতলির হাসি আমার সমস্ত শরীরে ঢেলে দিল বরফ জল। ওকে তো আমি চিনি। ও যখন প্ল্যান করেছে ঠিকই খুন করে ফেলবে মলি চাচীকে। ওকে আমার থামাতেই হবে...!

আমি হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসলাম। করজোড়ে বললাম, প্লীজ, আপু, চাচীকে মেরো না। মলি চাচী তোমাকে কম ভালোবাসে কথাটা ঠিক না। সে তোমাকে আমার মতই ভালোবাসে।

আরে যা ছাগল! ঠোঁট ওল্টাল তিতলি।

তাহলে কাল সকাল পর্যন্ত অন্তত চাচীকে বেঁচে থাকতে দাও, আকুতি করলাম আমি। এখন তুমি রাগের চোটে উল্টোপাল্টা বলছ। কাল সকালে হয়তো তোমার গরম মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। তখন আর এসব খুন খারাবীর চিন্তা করবে না।

আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার নড়চড় হবে না, নিষ্ঠুর গলায় বলল তিতলি। আমার পা ধরে কান্নাকাটি করলেও লাভ নেই। তোর চাচীকে মরতেই হবে। সে আজ রাতে হোক আর কাল সকালেই হোক।

আমি থ হয়ে গেলাম। পনেরো বছরের একটা মেয়ে কী অবলীলায় বলছে সে একজন মানুষকে খুন করবে। এটা কি সত্যি তিতলি নাকি ওই শয়তান ভুডু পুতুলটা ওর ওপর ভর করেছে, ওকে সম্মোহন করে এসব কাজ করাচ্ছে? আমি ভুডু বইটা পড়েছি তিতলির কাছ থেকে নিয়ে। কোনও কোনও ভুডু পুতুলের ওপর নাকি পৈশাচিক আত্মা ভর করে। তারা ভুডু পুতুলের মালিককে সম্মোহন করে তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করায়। তিতলির ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটেনি তো?

তিতলি আবার তার পুতুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঢুকলাম নিজের ঘরে। শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু ঘুম আসছে না। ভাবছি তিতলি মলি চাচীর কোনও ক্ষতি করার আগেই ওর কাছ থেকে কীভাবে পুতুলটাকে বাগিয়ে আনা যায়।

কিন্তু তিতলি পুতুলটাকে কখনও কাছ ছাড়া করে না। এমনকী ঘুমায়ও ওটাকে বুকে জড়িয়ে। পুতুল চুরি করতে গেলে ও নির্ঘাত জেগে যাবে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। কাজটা ভয়ঙ্কর কিন্তু এ ছাড়া তিতলিকে থামাবার কোনও উপায় নেই।

আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম বিছানায়। মোটামুটি যখন নিশ্চিত হলাম এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে তিতলি, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম নিজের কামরা থেকে। আমার পাশের ঘরটাই তিতলির বেডরুম। ওর ঘরে ঢুকলাম বুকে হৃৎপিণ্ডের ধড়াশ ধড়াশ নিয়ে। সোজা চলে গেলাম তিতলির ওয়াড্রোবের সামনে। লুকানো জায়গা থেকে বের করে নিলাম সিগার বক্স।

চাঁদের আলোয় মলি চাচী লেখা দেশলাইয়ের বাক্সটি তুলে নিলাম। বাক্সের ভেতরে মলি চাচীর কয়েক গাছি চুল।

আমি নিঃশব্দ পায়ে চলে এলাম আমার ঘুমন্ত বোনের শিয়রে। ড্রেসিং গাউনের পকেটে আগেই নিয়ে আসা ছোট, ধারালো কাঁচিটি বের করে অত্যন্ত সাবধানে তিতলির এক গোছা চুল কেটে নিলাম। চাচী এবং তিতলি দুজনের চুলই কুচকুচে কালো। খুব ভালোভাবে লক্ষ না করলে বোঝা যাবে না কার চুল কোটা।

চাচীর চুল দেশলাই বাক্স থেকে বের করে ফেলে দিলাম। ওখানে ভরে রাখলাম তিতলির চুল। তারপর চুপচাপ সিগার বক্স যথাস্থানে রেখে বেড়ালের পায়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। সে রাতে আর ঘুম হলো না আমার। সারারাত কাঁদলাম চাচার জন্য এবং তিতলির জন্য। আমি এরকম কিছু করতে চাইনি। কিন্তু মলি চাচীকে বাঁচাতে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

পরদিন সকালে উঠে তিতলির পায়ে ধরলাম যেন সে মলি চাচীর কোনও ক্ষতি না করে। কিন্তু আমার কথা কানেই তুলল না। সে ইতিমধ্যে পুতুলের গায়ে সেলোটেপ দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছে চুল।

আয়, বলল তিতলি, এক সঙ্গে উপভোগ করি মজা।

মলি চাচী ডাইনিং টেবিলে বসে আছেন। তাকিয়ে আছেন দেয়ালের একটি বাঁধানো ফটোগ্রাফের দিকে। চাচী আর চাচার বিয়ের রঙিন ছবি। আমাদের দিকে পেছন ফেরা। তবে থেকে থেকে পিঠটা কেঁপে উঠছে বলে বোঝা যায় চাচী কাঁদছেন।

তিতলি পিন ঠেকাল ভুডু পুতুলের মাথায়।

প্লীজ, আপু...প্লীজ, ফিসফিস করলাম আমি, আমাকে গ্রাহ্য করল না তিতলি। মলি চাচীর দিকে তাকিয়ে অশুভ, ভয়ঙ্কর একটা হাসি ফুটল মুখে।

তারপর সে পিনটা আমূল বসিয়ে দিল পুতুলের মাথায়।

বিস্মিত, যন্ত্রণাকাতর একটা দৃষ্টি ফুটল তিতলির চোখে। হাত থেকে খসে পড়ে গেল পুতুল। গগনবিদারী একটা চিৎকার দিল তিতলি। তারপর পুতুলের মত সে-ও চেয়ার থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। বাঁকা-তেড়া হয়ে শুয়ে রইল।

আমি লাফ মেরে মেঝে থেকে তুলে নিলাম পুতুল, একটানে খুলে নিলাম পিন।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে...

.

স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো তিতলি আপুকে। ও বেঁচে আছে। তবে ডাক্তাররা বলেছেন ওর ভয়ানক ব্রেন হ্যাঁমারেজ হয়েছে। বাকি জীবনটা হাসপাতালেই কাটাতে হবে। মেশিনের সাহায্যে বেঁচে থাকবে ও, তবে মানুষ হিসেবে নয়। একটা ভেজিটেবল হয়ে।

আমি মলি চাচীর সঙ্গে আছি। বড্ড নিষ্প্রাণ আমাদের জীবন। চাচাকে হারিয়ে চাচীর মুখ থেকে সেই যে নিভে গেছে হাসি, ফিরে আসেনি আর।

আমরা প্রতি বিষুদবার তিতলি আপুকে দেখতে হাসপাতালে যাই। ও আমাদেরকে চিনতে পারে না।

আর ভুডু পুতুল? ওটা এখন আমার জিম্মায়। ওটা মানুষের যে ক্ষতি করেছে, আমি চাই না ওকে অন্য কেউ আবার ব্যবহার করার সুযোগ পাক... শুধু আমি ছাড়া!

ভৌতিক মুখচ্ছবি

ঘটনাটি ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯১০-১১ সালে জার্মানির লাইপজিগ শহরতলীর এক লোহার কারখানায়। গ্রামের সীমানা যেখানে প্রায় শেষ হয়েছে, সেখানে এক ছোট নদীর ধারে ছিল এই কারখানা। এখানে ঢালাইয়ের কাজ হত। লোহা গলিয়ে তা থেকে স্ক্রু, বল্টু, কেটলি প্রভৃতি তৈরি করা হত। আশপাশের শত শত লোক কাজ করত এই কারখানায়। যে ঘরে লোহা গলানো হত সেই ঘরটি ছিল এই কারখানার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক জায়গা। রাবণের চিতার মত দিনরাত সেখানে আগুন জ্বলত দাউ দাউ করে। সেই আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যেত। বিরাট কড়ার মধ্যে টগবগ করে ফুটত গলন্ত ধাতু। তার রক্তাভায় সারা ঘরের রঙ লাল হয়ে থাকত। সে-চুল্লি কখনও নিভত না।

কারখানার সেই ফার্নেস-ঘরের ধ্বময় কর্তা ছিল লস্ স্ নামে বুড়ো কারিগর। কাছেই এক গ্রামে তার বাড়ি, কিন্তু বুড়ো কখনও বাড়ি যেত না। এখানেই দিনরাত থাকতে হত তাকে। কারখানার মধ্যে গালাই-ঘরের কাছেই ছোট একটি ঘরে সে থাকত। বুড়োর বয়স প্রায় আশি বছর। কিন্তু এ বয়সেও ছিল যেমন অসুরের মত চেহারা, তেমনি গায়ের জোর। সেজন্যে কারখানার মালিকরা ঐ গালাই-ঘরের হেফাজতেই রেখে দিয়েছিল তাকে। এই ভয়াবহ জায়গার গুরুত্বও খুব বেশি বলে, যে কোন নতুন লোককে সেখানে রাখা যেত না। তাছাড়া কারখানার গোড়া থেকেই সে এখানে কাজ করছিল। এর প্রতি

তার আসক্তি ছিল দারুণ। কর্তব্যনিষ্ঠা আর দুর্জয় সাহস নিয়ে দিনের পর দিন আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলত বুড়ো। আগুনের তাপে তার সারা গায়ের রঙ ঝলসে খয়েরের মত হয়ে গিয়েছিল।

কারখানার মালিকরা তাকে মাসিক ভাতা দিয়ে অবসর গ্রহণের জন্য বহুবার বলেছিল, কিন্তু লস্ তাতে রাজী হয়নি। সে বলত, এ কাজ না করে বসে থাকলে সে মরে যাবে। অগ্নিদেব তার বন্ধু, আর এই আগুনই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যিই মাঝে মাঝে আগুনের সঙ্গে যেন খেলা করত বুড়ো! বিড়বিড় করে কি-সব বকত, হাসত, ভেংচি কাটত ফার্ণেসটার দিকে তাকিয়ে। সবাই বলত, এই রে, বুড়োর এবার ভীমরতি ধরেছে! মরবে!

হলও তাই। যে রক্ষক সেই একদিন ভক্ষক হলো! নেশার ঘোরে অসাবধানতাবশতঃ বুড়ো একদিন লোহা গালাইয়ের জ্বলন্ত ধাতুপাত্রের মধ্যে পড়ে নিমেষে কর্পূরের মত উবে গেল। হ্যাঁ করে একটা শব্দ হলো কেবল। আর ফার্নেসের উপর থেকে খানিকটা ধোয়া চিমনীর ভেতর দিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। হাঁ হাঁ করে উঠল তার ঘরের অন্যান্য লোকেরা। সারা কারখানায় খবর ছড়িয়ে পড়ল চক্ষের নিমেষে। খবর পেয়ে মালিক নিজেই ছুটে এলো গালাই-ঘরে, কিন্তু তখন সেখানে লসের বাষ্প পর্যন্ত নেই!

এতদিনের পুরোনো কর্মচারী বুড়ো লসের এই অপঘাত-মৃত্যুতে সবাই মর্মাহত হলো। কারখানায় ছুটির বাঁশি বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মালিক তার সম্মানে কারখানা তখনি বন্ধ

করে দিল। চারিদিকে নানা গল্প চলতে লাগল লসকে নিয়ে। ছুটির পর পথ চলতে চলতে কারিগরদের মধ্যে একজন বলল, মৃত্যুই ওর ভালো হয়েছে–যার সঙ্গে ওর সারাজীবনের সম্বন্ধ সেই ফার্নেসের মধ্যেই ও মিশে গেছে!

একজন বলল, এই বেশ, এ বয়সে পেটের অসুখে ভুগে মরার চেয়ে এ মৃত্যু অনেক ভালো- নায়কোচিত মৃত্যু!

দুতিন দিন ধরে এমনি সব বলাবলি চলতে লাগল পুরোনো কারিগরদের মধ্যে। বুড়ো লসের জয়গানে সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

আসলে বুড়ো একটু-আধটু নেশা-ভাঙ করলেও মানুষ হিসাবে ছিল খাঁটি। বৌ মরে যাবার পর বুড়ো আর গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়নি। এই কারখানায় ঢুকে কারখানাকেই ঘরবাড়ি করে নিয়েছিল। বাড়িতে যদিও তার এক বোম্বেটে ধরনের ছেলে ছিল, তার সঙ্গে বুড়োর এক তিল বনত না। অবসর-সময় কারখানার ছোকরাদের সঙ্গে গল্প করেই বুড়ো কাটিয়ে দিত, তাদের অনেককেই সে ভালোবাসত নিজের ছেলের মত। কিছু কিছু নিজের মাইনে থেকে লুকিয়ে দান ধ্যানও সে করত। সবসুদ্ধ এখানে লস্ কাজ করেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। এইসব কারণে কারখানায় শুধু তার সহকর্মীদের নয়, মালিকের পর্যন্ত তার মৃত্যুতে দুঃখের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

কদিন এইভাবে কাটবার পর শোকের বেগ একটু কমলে কারখানার কারিগররা সকলে মিলে তার মৃত-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য কারখানার ভিতরকার খোলা ময়দানে জড় হলো। এ সব সভায় সাধারণতঃ যেমন সব হয়, তেমনি এখানেও অনেকে লসের গুণাবলী নিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি নিয়ে বক্তৃতা করল। কজনের বক্তৃতা হয়ে যাবার পর কারখানার মালিক যখন বক্তৃতা করতে উঠে তার স্মৃতিরক্ষার জন্যে বেশ কিছু টাকা দিয়ে একটি প্রস্তরমূর্তি তৈরি করাবার কথা ঘোষণা দিল, তখন ঘটল এক বিপদ। উপস্থিত জনতার ভিতর থেকে লসের ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে বলল, আমার বাবার কোন ছবি বা ফটোগ্রাফ নেই, কাজেই প্রস্তরমূর্তি করায় অসুবিধা আছে। এই টাকাটা এভাবে খরচ করে বরং আমাদের দরিদ্র সংসারে দিলে খুব উপকার করা হবে?

এ কথায় আশপাশের অনেকেই আপত্তি তুললো, কারণ তারা ছেলের চরিত্র জানত এবং বাপের সঙ্গে ছেলের যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তাও অজানা ছিল না তাদের কাজেই তার হাতে একেবারে এ টাকা তুলে দিতে অনেকেই আপত্তি জানাল। কিন্তু অনেকে আবার সায় দিল ছেলের কথায়। সম্ভবতঃ লসের ছেলের কাছ থেকে ঐ টাকার কিছু অংশ পাবে বলে তারা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

এই নিয়ে সভায় বেশ বাদানুবাদ এবং গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো। একপক্ষ বলল, লসের চেহারা আমরা কল্পনা থেকে আঁকিয়ে নিয়ে তা থেকে তার স্ট্যাচু করব। সেই ষ্ট্যাচু এই

কারখানার মধ্যে থাকবে, এবং প্রতি বছর তার মৃত্যু-দিবসে সকলে আমরা একসঙ্গে সমবেত হব এখানে।

অপর পক্ষ বলল, যেহেতু কোন ফটো নেই, কাজেই কল্পনা থেকে যা-তা একটা কিছু করা ঠিক হবে না, তার চেয়ে টাকাটা তার গরীব ছেলেকে দিয়ে সাহায্য করাই ভালো।

দুদলের মধ্যে এই বাদানুবাদ যখন বেশ তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তখন এক অলৌকিক অভূতপূর্ব ঘটনায় সকলেই বিস্ময়াভিভূত হলো। সকলের দৃষ্টি গেল। আকাশের দিকে। নির্মল নীলাম্বরের বুকের উপর দিয়ে কারখানার চিমনী থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে যে ধোঁয়া উঠছিল, তারই মধ্যে ভেসে উঠেছে বুড়ো লসের মুখ! হাওয়ার বেগে ধোয়ার রাশ যেমন ভেসে ভেসে যাচ্ছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে তেমনি মুখখানাও এক একবার ভেঙে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে, আবার জোড়া লাগছে এসে! সে মুখ ঠিক জীবন্ত লসের মুখের মত না হলেও, তা থেকে চেনা যায় লসকে। মাংস পুড়ে জড়িয়ে গেলে যেমন হয়, মুখের চেহারা তেমনি পোড়া বীভৎস ভয়াবহ!

সকলে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে- সেই ধূম্রকুণ্ডলীর মধ্যে ভৌতিক মুখচ্ছবির দিকে!

কারখানার মালিক ওয়াগনার প্রস্তাব দিল, এখনি ঐ মুখের একটা ফটো তুলে নেওয়া হোক, ঐ থেকেই মর্মরমূর্তি তৈরি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে তাই করা হলো। আকাশে আলো ছিল তখনও, ছবি তুলতে অসুবিধা হলো না। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে গ্রামের আশপাশ থেকে লোক এসে হাজির হলো সেখানে। সকলেই আকাশের গায়ে ঐ অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ভৌতিক দৃশ্য দেখে একেবারে থ! তারপর রাত্রের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বুড়ো লসের ঐ বিকৃত মুখ!

Unknown Worlds নামক মাসিক-পত্রিকায় বুড়োর মুখের ছবি বেরিয়েছিল।

এরপর প্রতি বছরই তার স্মৃতি-বার্ষিকীর দিনে ঐ মুখ আজও নাকি ভেসে ওঠে আকাশের বুকে ঐ চিমনীর ধোঁয়ার মধ্যে! সেদিন হাজার হাজার লোক দূর-দূরান্ত থেকে দেখতে আসে এই দৃশ্য- আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে তারা! তারপর হঠাৎ একসময় সকলকে আশ্চর্য, ভীত, সচকিত করে ভেসে ওঠে লসের মুখ সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিঃসাড়ে চেয়ে থাকে সে মুখের দিকে! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না সেখানে।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

ভ্যাম্পায়ার

রক্তলাল রঙ ছড়িয়ে পাহাড়ের ওপারে ডুব দিচ্ছে সূর্য। ধারাল বাতাসের তাড়া খেয়ে ঝরে পড়া শুকনো পাতাগুলো পশ্চিমে এমনভাবে ধেয়ে যাচ্ছে, যেন সূর্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাচ্ছে ওগুলো।

নিজেকে জড়বুদ্ধির লোক বলে তিরস্কার করল হেনডারসন। থমকে দাঁড়িয়ে মগ্ন হলো ভাবনায়। আঁধার নামতে আর বেশি দেরি নেই। সস্তা কল্পনায় গা ভাসিয়ে কী লাভ?

মাথামোটা? আবার বলল হেনডারসন।

চিন্তাটা সম্ভবত দিনের বেলায়ই তার মাথায় আসে, এবং তখন থেকেই সে আনমনা। হ্যালোইনের ভয়াল রাত আজ। পৃথিবীর সব গোরস্থানে জেগে উঠবে মৃতেরা। আত্মাগুলো বেরিয়ে আসবে কবর ছেড়ে।

অন্যান্য দিনের মতই আরেকটা ঠাণ্ডা, পচা দিন আজ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেনডারসন। এমন একটা সময় ছিল, আপনমনে ভাবল সে, যখন এ রাত আসা মানেই ছিল ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। অশুভ আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠত গোটা অন্ধকার ইউরোপ। অজানা ক্রুর হাসির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হত এই সন্ধে। অশুভ দর্শনার্থীদের ভয়ে রুদ্ধ হত

একটার পর একটা দরজা, একান্ত প্রার্থনায় বিভোর হত অগণিত মানুষ, ঘরে ঘরে জ্বলে উঠত লক্ষ লক্ষ মোম। চিন্তাভাবনায় জাকাল একটা ব্যাপার ছিল তখন, গভীরভাবে উপলব্ধি করল হেনডারসন। রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ ছিল সেই জীবন। মধ্যরাতের পথচারীরা সিটিয়ে থাকত আতঙ্কে, না জানি কী আছে সামনের বাঁকটায়। ভূত-পিশাচ আর অপদেবতার জগতে বাস করে আত্মাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করত তারা। সে সময় বিশেষ একটা তাৎপর্য ছিল মানুষের আত্মার। এখন দিন বদলেছে। নাস্তিক্য এসে দূরে ঠেলে দিয়েছে আগের সেই ধারনাকে। মানুষ আগের মত আর শ্রদ্ধা করে না তার আত্মাকে। তবু এই বিংশ শতাব্দীতেও ছাড়া ছাড়া কিছু ঠুনকো বিশ্বাস আঁকড়ে আছে মানুষ, যেগুলো তাদের কল্পনার ডানা মেলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খায়।

বেকুব! সম্পূর্ণ অজান্তেই আবার বলে উঠল হেনডারসন। আসলে তার মানব সত্তাকে হটিয়ে দিয়ে ভিন্ন একটা সত্তা ঠাঁই নিয়েছে মাথায়। পাছে প্রেতলোকের ওই জীবগুলো তার গোপন পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলে, এই ভয়ে বার বার নিজেকে ভর্ৎসনা করছে সে। ওদের রক্তচক্ষু ফাঁকি দেয়ার একটা প্রাণপণ চেষ্টা আর কী।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কসটিউমের একটা দোকান খুঁজছে হেনডারসন। জমকালো একটা পোশাক চাই তার। আজ রাতের ছদ্মবেশ-উৎসবে পরতে হবে। দেরি হলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্যে হ্যালোইন নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে রাজি নয় সে।

সরু গলির দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়ানো দালানগুলোতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনুসন্ধান করছে হেনডারসন। আঁধার ক্রমশ ছায়া ফেলছে দালানগুলোর গায়ে। ফোন-বুকে টানা হাতে লেখা ঠিকানাটার দিকে আবার তাকাল সে। কিন্তু আলোর স্বল্পতায় পড়তে পারল না। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল হেনডারসন। সন্ধে নামা সত্ত্বেও হতচ্ছাড়ার দল দোকানগুলোতে আলো দিচ্ছে না কেন? এই দরিদ্র ঘিঞ্জি এলাকায় খোঁজাখুঁজি করতে আসাটাই একটা ঝক্কির ব্যাপার, কিন্তু তবু

হঠাৎ করেই সেই দোকানটা পেয়ে গেল হেনডারসন। রাস্তার ঠিক ওপারেই। রাস্তা পেরিয়ে দোকানের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল সে। উঁকি দিল ভেতরে। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো এসে দালানের কপালে তির্যকভাবে পড়ে সড়াৎ করে নেমে এসেছে জানালা আর ডিসপ্লেতে। চেপে রাখা ধারাল শ্বাসটুকু টেনে নিল হেনডারসন।

একটা কসটিউমের দোকানের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে সে-নরকের কোন ফাটল দিয়ে নয়। তা হলে ডিসপ্লেটা অমন গনগনে লাল দেখাচ্ছে কেন? থরে থরে সাজানো মুখোশগুলো কী ভীষণ দেখাচ্ছে এই আলোতে! যেন একদল পিশাচ দাঁত বের করে হাসছে।

গোধূলির রঙ, নিজেকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল হেনডারসন। আসলে মুখোশগুলোর সাজানোর ঢঙই এরকম। তবু গা ছমছম করতে থাকে কল্পনাপ্রবণ লোকটার। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে সে।

জায়গাটা অন্ধকার এবং নীরব। ঘরের বাতাসে একাকীত্বের গন্ধ-যে গন্ধ নিরন্তর বিরাজ করে পৃথিবীর সব সমাধি, গভীর অরণ্য, আর দুর্গম পাহাড়ের গুহায় গুহায়। এবং-ধুশ-শালা! নিজের ওপর আবার রুষ্ট হলো হেনডারসন। আজ কী হয়েছে তার? ফাঁকা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে হাসল সে। নিজেকে সান্তনা দিল, এটা আর কিছু নয়, কসটিউম-শপের গন্ধ। গন্ধটা তাকে কলেজের সেই শখের নাটকের দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এই ন্যাপথালিন, জীর্ণ পশম, তেল আর রঙের গন্ধের সাথে তার পরিচয় অনেকদিনের। হ্যামলেট নাটকে অভিনয়ের সেই দৃশ্যগুলো মনে করতে করতে অজান্তেই একটা দাঁত কেলানো মাথার খুলি তুলে নিল সে।

সংবিৎ ফিরতেই খুলিটা তার মাথায় চমকপ্রদ একটা ফন্দি যোগাল। এই হ্যালোইনের রাতে অন্য সবার মত রাজা, তুর্কীবীর কিংবা জলদস্যু সেজে উৎসবে যাবার ইচ্ছে নেই তার। সাধারণ ছদ্মবেশে লিস্ট্রোমের ওখানে গেলে কেউ তাকে পাত্তাই দেবে না। তাছাড়া লিওস্ট্রোমও মনঃক্ষুণ্ণ হবে। কারণ তার সোসাইটির বন্ধুরা আসবে দামী পোশাকে ছদ্মবেশ নিয়ে। হেনডারসন অবশ্যি লিওস্ট্রোমের ওই কৃত্রিম বন্ধুদের তেমন একটা তোয়াক্কা করে না। আসবে তো সব মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ, আর মণি-মুক্তোখচিত ভারি গয়না পরা ঘোড়াটা রমণীরা। তাদের ভড়কে দিয়ে হ্যালোইনের প্রাণসঞ্চার করতে ভয়ঙ্কর একটা কিছু সাজবে না কেন সে?

.

অপেক্ষায় থেকে হাঁপিয়ে উঠল হেনডারসন। পেছনের ঘর থেকে আলো নিয়ে আসছে না কেউ। মিনিট কয়েক পর ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে। কাউন্টারে সজোরে হাত চাপড়ে চেঁচাল, কে আছ! এদিকে এসো!

প্রথমে নীরবতা, তারপর অস্পষ্ট একটা নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল পেছনে। কী বিচ্ছিরি! একটু পরেই নিচের সিঁড়িতে পৌঁছুল শব্দটা। থপ্ থপ্ থপ্ করে ভারি পা ফেলে উঠে আসছে কেউ। সহসাই হাঁ করে শ্বাস টানল হেনডারসন। কালোমত কী একটা বেরিয়ে আসছে মেঝে খুঁড়ে!

আসলে ওটা বেসমেন্টের ট্র্যাপডোর। এইমাত্র খুলল। ল্যাম্প হাতে এক লোক বেরিয়ে এসে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ল্যাম্পের আলোয় হলদেটে দেখাচ্ছে মুখ। ঘুম জড়ানো চোখে পাতা পড়ছে ঘন ঘন।

লোকটা মৃদু হেসে নরম কণ্ঠে বলল, দুঃখিত, একটু ঘুমোচ্ছিলাম। তা আপনার জন্যে কী করতে পারি, স্যার?

হ্যালোইনের কসটিউম খুঁজছি আমি।

ও, আচ্ছা। তা কী ধরনের কসটিউম চাই আপনার?

কণ্ঠস্বরটা ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত। হলুদ চেহারায় নিস্তেজ একটা ভাব। চোখ দুটোতে ঘুমের রেশ কাটেনি এখনও।

প্রচলিত সাইজের বাইরে একটা ছদ্মবেশ নিতে চাই আমি। মানে উৎসবে গিয়ে সবাইকে একটু ভড়কে দিতে চাই আর কী।

কিছু মুখোশ দেখাতে পারি আপনাকে।

আরে না, নেকড়ে মানব সাজার কোন শখ নেই আমার। আমি চাই এমন একটা পোশাক, যা দেখে লোকে ছদ্মবেশটাকেই আসল রূপ মনে করে ভয় পাবে।

তা হলে সত্যিকারের পোশাক চাইছেন আপনি!

হ্যাঁ। হেনডারসনের মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। সত্যিকারের পোশাক বলতে কী বোঝাতে চাইছে মাথামোটা লোকটা?

সেরকম একটা পোশাক বোধহয় দিতে পারব, সার। চোখ পিট পিট করে বলল সে। তার ঠোঁট জোড়ার ভাঁজে হাসির রেখা। জিনিসটা শুধু হ্যালোইনের জন্যেই।

কী রকম?

রক্তচোষা পিশাচের কথা ভেবেছেন কখনও?

ড্রাকুলার মত?

জ্বী, জ্বী ড্রাকুলা।

আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু আমাকে ওই পোশাকে মানাবে তো?

আঁটো হাসি ফুটল লোকটার মুখে। হেনডারসনের আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, খুব মানাবে।

বেঢপ প্রশংসা! বিদ্রুপের ভঙ্গিতে হাসল হেনডারসন। তা কোথায় সেই সাজ-পোশাক?

সাজ-পোশাক? এটা তো শুধুই একটা পোশাক। তাও রাতের।

রাতের?

জ্বী, এজন্যেই তো দিচ্ছি।

কী সেটা?

একটা আলখেল্লা। একেবারে আসল!

একটা আলখেল্লা-ব্যস, এই?

জ্বী, সার। শুধুই একটা আলখেল্লা। কিন্তু ওটা পরলে মনে হবে শবের কাফন। দাঁড়ান, নিয়ে আসছি।

নড়বড়ে পা দুটো টেনে টেনে আবার দোকানের পেছনে চলে গেল লোকটা। ট্র্যাপোর খুলে নেমে গেল নিচে। হেনডারসন দাঁড়িয়ে রইল অপেক্ষায়। নিচে আগের চেয়ে আরও বেশি খুটখাট দুমদাম্ হচ্ছে।

শিগগিরই ফিরে এল বুড়ো। হাতে একটি আলখেল্লা। অন্ধকারে ঝাঁকুনি দিয়ে আলখেল্লা থেকে ধুলো ঝাড়ল সে। তারপর বলল, এই নিন-আসল জিনিস।

আসল?

গায়ে দিলেই টের পাবেন। আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে এটার-বিশ্বাস করুন!

ঠাণ্ডা, ভারি কাপড়টা কাঁধে চাপল হেনডারসনের। পেছনে এসে আয়নায় নিজেকে দেখার সময় ছত্রাকের পুরানো একটা অস্বস্তিকর গন্ধ পেল সে। আলখেল্লা থেকে আসছে। মৃদু আলো, তবু নিজের চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন নজর এড়াল না হেনডারসনের। তার লম্বাটে মুখটা আরও সরু দেখাচ্ছে, ফ্যাকাসে চেহারার মাঝে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। সমস্তই এই কালো পোশাকের জাদু। একটা বড়সড় কালো কাফন এটা।

নিখুঁত ছদ্মবেশ! বিড়বিড় করে বলল বুড়ো। আয়নায় কোন প্রতিবিম্ব পড়েনি বুড়োর। নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকায় ব্যাপারটা টের পেল না হেনডারসন।

এটা নেব আমি, বলল হেনডারসন। বলল, কত দেব?

আমি নিশ্চিত, এই পোশাকে উৎসবে গেলে দারুণ মজা পাবেন।

আরে, দেব কত তাই বলল।

তা ডলার পাঁচেক দিলেই চলবে।

এই নাও।

ডলার পাঁচটা নিয়ে আলখেল্লাটা হেনডারসনের গা থেকে খুলে নিল বুড়ো। পোশাকটা কাঁধ থেকে নেমে যেতেই আবার স্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভব করল হেনডারসন। দীর্ঘদিন বেসমেন্টের শীতল গহ্বরে ছিল বলেই হয়তো কাপড়টা অমন বরফের মত ঠাণ্ডা-ভাবল সে।

পোশাকটা ভাঁজ করে সহাস্যে হেনডারসনকে বুঝিয়ে দিল বুড়ো।

কালকেই এটা ফিরিয়ে দেব, প্রতিশ্রুতি দিল হেনডারসন।

দরকার নেই। এখন থেকে ওটা আপনার।

মানে?

খুব শিগগিরই ব্যবসা গোটাচ্ছি আমি। কাজেই পোশাকটা রেখে দিলে আমার চেয়ে আপনিই বেশি কাজে লাগাতে পারবেন।

কিন্তু–

কোন কিন্তু নয়, হেনডারসনকে থামিয়ে দিল বুড়ো। বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে বলল, সন্ধেটা আপনার জন্যে আনন্দময় হয়ে উঠুক।

মনে একরাশ জড়তা নিয়ে রওনা হলো হেনডারসন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে বুড়োকে বিদায় জানাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। বুড়োর চোখের পাতা ধীরে লয়ে খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। কাউন্টারের ওপাশ থেকে আরেক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হেনডারসনের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সে দৃষ্টির আঁচ অনুভব করল না হেনডারসন। সে বুড়োকে শুভরাত্রি জানিয়ে দরজাটা ঝট করে ভিজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামল। যেতে যেতে অবাক হয়ে ভাবল, এ কোন্ পাগলামো করতে যাচ্ছে সে!

.

রাত আটটায় হেনডারসন টেলিফোনে লিণ্ডস্ট্রোমকে জানাল, পৌঁছুতে একটু দেরি হবে তার। আলখেল্লাটা গায়ে চাপাতেই আবার সেই ঠাণ্ডা ভাবটা চলে এল। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার জন্যে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। তার দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে এল বার বার। আবছা একটা কায়া ছাড়া কিছু দেখতে পেল না আয়নায়। অল্প একটু ড্রিংক করার পর খানিকটা চাঙা বোধ করল হেনডারসন। গরম হয়ে উঠল গা। ড্রিংকস ছাড়া আর কিছু মুখে দিল না সে। ফ্লোর জুড়ে রক্তচোষা পিশাচের মহড়া দিয়ে বেড়াল কিছুক্ষণ। বাদুড়ে রূপান্তরিত হবার ভঙ্গিতে বার বার আলখেল্লার নিচের দিকটা ঝটকা মেরে কাঁধে তুলল ভ্রুকুটিপূর্ণ ভয়াল মূর্তিতে। এই ভয়ঙ্কর খেলায় প্রচুর আনন্দ পেল হেনডারসন। সত্যিই তাহলে একটা পিশাচ হতে যাচ্ছে সে!

কিছুক্ষণ পর লবিতে গিয়ে একটা ক্যাব ডাকল হেনডারসন। এগিয়ে এল ক্যাব। আলখেল্লা গুটিয়ে অপেক্ষা করছিল হেনডারসন, ক্যাবের চালক সেটা দেখামাত্র কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ভাড়া যাবে? নিচু কণ্ঠে শুধোল হেনডারসন।

কো-কো কোথায়? ভয়ে গলা থেকে বেসুরো স্বর বেরোল তার।

প্রচণ্ড হাসি পেল হেনডারসনের। কিন্তু ছাড়ল না হাসিটা। বহু কষ্টে চেপে গিয়ে ভুরু কুঁচকে তীর্যক কটাক্ষ হানল লোকটার দিকে। আলখেল্লার নিচের প্রান্ত ঝটকা মেরে পেছনে তুলল।

যা-যা-যা-যাব! আসুন!

যেন পালাতে পারলে বাঁচে ড্রাইভার। হেনডারসন বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল।

কোথায় যাব, ব-বস্-মানে, সা-সার? তোতলাতে তোতলাতে জানতে চাইল সে।

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব ফাসাসে বানিয়ে ঠিকানাটা বলল হেনডারসন। তারপর গাড়ির পেছনে গিয়ে বসল। ভীত ড্রাইভার ভুলেও আর তার দিকে তাকাল না।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল ক্যাব। ড্রাইভারের ভয়চকিত ভাব দেখে। হাসি আর চেপে রাখতে পারল না হেনডারসন। তার অট্টহাসি শুনে আরও ঘাবড়ে গেল ড্রাইভার। সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ গতিতে গাড়ি ছোটাল সে। তার কাণ্ড দেখে হেনডারসনের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার যোগাড়। আর ওদিকে ড্রাইভার বেচারা রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছে। হেনডারসনকে জায়গামত পৌঁছে দিয়ে হাঁফ ছাড়ল সে। ভাড়া না নিয়েই কেটে পড়ল দ্রুত।

যাক, খাসা হয়েছে ছদ্মবেশটা! মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করল হেনডারসন। উৎসবে বেশ সাড়া জাগানো যাবে। ফুরফুরে মেজাজে এলিভেটরে গিয়ে উঠল সে। এগিয়ে চলল লিণ্ডস্ট্রোমের ঢালু ছাদের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

এলিভেটরে হেনডারসন একা নয়, আরও তিন-চারজন আছে। লিণ্ডস্ট্রোমের অ্যাপার্টমেন্টে এর আগেও এদের দেখেছে সে। কিন্তু একজনও তাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। উৎসাহ বেড়ে গেল হেনডারসনের। তার মেকি মুখভঙ্গি এবং অদ্ভুত আলখেল্লাটা আমূল বদলে দিয়েছে তাকে। আর এদের দেখো। দামী জবড়জঙ্গ পোশাকে একেকজনের ছদ্মবেশের কী বাহার! স্প্যানিশ ব্যালেরিনা সেজেছে এক মহিলা, এক লোক পরেছে বুল-ফাইটারের পোশাক, অন্য দুজন পুরুষ-মহিলারও ভিন্নরকম সাজ। তা যে বেশই ধরুক তারা, আসল চেহারা ঢাকতে পারেনি কেউ। হেনডারসন ভালো করেই জানে, ছদ্মবেশটা আসলে তাদের কাছে তেমন কিছু নয়। উৎসবে হাজির হওয়াটাই বড়।

বেশিরভাগ মানুষই কসটিউম পার্টিতে আসে তাদের অবরুদ্ধ ক্ষুধার্ত বাসনাগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে। মেয়েরা আসে তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখাতে, পুরুষেরা দেখাতে চায় পৌরুষ-বুল-ফাইটার কিংবা সার্কাসের ভাড়েরা যেমন দেখায়। এসব একদম বিচ্ছিরি লাগে হেনডারসনের। বাপুরা, বীরগিরী দেখাবে ভালো কথা। তা ঘরের ভেতর কেন? সাহস থাকে তো রাস্তায় নামো। তখন অত ভয় কীসের?

সবার ওপর একপলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল হেনডারসন। প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে দেখতে সুন্দর। চমৎকার স্বাস্থ্য এবং প্রাণ প্রাচুর্যেরও কমতি নেই। তাদের আছে উপযুক্ত সতেজ গলা এবং ঘাড়। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির পেলব হাত দুটির দিকে তাকাল হেনডারসন। কোন কারণ ছাড়াই একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর সবিৎ ফিরতেই দেখে এলিভেটরের আরোহীরা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এককোণে। যেন তার সাজ পোশাক আর অভিব্যক্তি দেখে তারা আতঙ্কিত। তাদের কথাবার্তা বন্ধ। সবাই কেমন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু যেন বলতে চায় সে। কিন্তু তার আগেই এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। একে একে বেরিয়ে এল সবাই।

একধরনের অস্বস্তি খচখচ করছে হেনডারসনের মনে। কোথাও ভুল হচ্ছে না তো। প্রথমে ড্রাইভার তরস্ত হলো, তারপর এরা। পানের মাত্রাটা কি বেশি হয়ে গেছে?

কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না হেনডারসন। মার্কাস লিস্ট্রোম তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির। হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিতে চাইছে সে।

আমরা তাহলে এই করতে এসেছি? হালকা সুরে বিদ্রূপ করল হেনডারসন। আরে, তুমি তো টলছ!

লিণ্ডস্ট্রোম যে মদের নেশায় চুর, একবার তাকিয়েই যে কেউ বুঝবে। মোটা মানুষটা অ্যালকোহলে সাঁতার কাটছে।

ড্রিংক নাও, হেনডারসন। আমি আর নেব না। তবে তোমার সাজগোজ দেখে চমকে গেছি ভাই। কোত্থেকে এমন মেক-আপ নিলে?

মেক-আপ? আমি তো মুখে কিছুই মাখিনি।

ওহ্, তাই তো। কী বোকা আমি!

লিণ্ডস্ট্রোমও ঘাবড়ে গেল নাকি? তার চোখ দুটোও কি শঙ্কায় পরিপূর্ণ? অবাক হয়ে গেল হেনডারসন-এতই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাকে!

দাঁড়াও, ওদিকে একটু ঘুরে আসি, খানিকটা ইতস্তত করে দ্রুত সটকে পড়ল লিস্ট্রোম। ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে। তার ঘাড়ের পেছনটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল হেনডারসন। কী পুরু আর সাদা! চামড়ার ভাঁজ ঝুলে পড়েছে। কলারের ওপর দিয়ে। একটা নীল শিরা ফুটে আছে ভীত লিণ্ডস্ট্রোমের ঘাড়ে।

হেনডারসন বাইরের ঘরে একাকী দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে গান-বাজনা আর হাসির শব্দ আসছে। বেশ কোলাহলমুখর উৎসব। ভেতরে ঢুকতে একটু দ্বিধা হচ্ছে হেনডারসনের। হাতের গ্লাসটাতে চুমুক দিল সে। বাকর্ডি রাম। কড়া পানীয়। সহজেই নেশা ধরে যায়। চুমুক দিতে দিতে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখল হেনডারসন। সে ভয়াল একটা রূপ ধরতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সবাই এভাবে আতঙ্কে সিঁটিয়ে যাক-এতটা চায়নি। সত্যিই এই পোশাকের বিশেষ কোন ক্ষমতা আছে? পিশাচের আসল রূপ ফুটে উঠেছে তার মাঝে? লিওস্ট্রোম পর্যন্ত চমকে উঠে মেক-আপের কথা বলেছে। আচ্ছা, চেহারাটাই আগে দেখা যাক।

হলঘরের লম্বা প্যানেল মিররের দিকে এগোল হেনডারসন। একটু উঁকিঝুঁকি মেরে সোজা হয়ে দাঁড়াল চৌকোনা আয়নার সামনে। পেছন থেকে আসা উজ্জ্বল আলোয় আয়নার কাঁচের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল সে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

আয়নার সামনে সে জলজ্যান্ত বিদ্যমান, অথচ প্রতিবিম্ব পড়েনি! এটা কী করে সম্ভব?

চোখ দুটো ডলে নিয়ে আবার তাকাল সে। ফল একই। প্রতিবিম্ব নেই।

চাপা গলায় হেসে উঠল হেনডারসন। তার কণ্ঠের গভীর থেকে বেরোল এই খলখলে হাসি। ফাঁকা আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমেই উঁচুতে চড়ল হাসি। হাসিতে কুটিল আনন্দ।

ভালো নেশা ধরেছে, অস্ফুটে বলল হেনডারসন। একটু আগে তবু ঝাপসা প্রতিবিম্ব দেখেছি, আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছি না। নেশার জন্যেই চেহারাটা ভীষণ হয়েছে। ভয় পাচ্ছে সবাই।

প্লিজ, একটু সরে দাঁড়াবেন!

একটা সুরেলা কণ্ঠে চমক ভাঙে হেনডারসনের। ঝট করে পেছনে ফেরে সে। তার মতই কালো পোশাক মেয়েটির। ফর্সা গর্বিত মুখ। মাথায় ঝিকমিকি করছে রেশমের মত চুলগুলো। নীল চোখে অপার্থিব দ্যুতি। ঠোঁট জোড়া টুকটুকে লাল। স্বর্গের দেবী সেজেছে মেয়েটি।

হেনডারসন নরম কণ্ঠে শুধোল, কে আপনি?

শীলা ডারলি। দয়া করে সরে দাঁড়ালে নাকে একটু পাউডার ঘষতাম।

স্টিফেন হেনডারসন অবশ্যই সরে দাঁড়াবে, হাসল সে। পিছিয়ে এসে জায়গা ছেড়ে দিল মেয়েটিকে।

হেনডারসনকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি মুখ টিপে হেসে বলল, এর আগে কাউকে পাউডার নিতে দেখেননি?

দেখেছি, তবে প্রসাধনীর প্রতি স্বর্গ-সুন্দরীদের এরকম আসক্তির কথা জানতাম না। অবশ্যি স্বর্গের দেবীদের সম্পর্কে খুব কমই জানি। এখন থেকে বিশেষভাবে জানতে চেষ্টা করব তাদের। এই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। হয়তো উৎসবের পুরোটা সময়ই আপনার পেছনে নোটবুক হাতে দেখতে পাবেন আমাকে।

ভ্যাম্পায়ারের হাতে নোটবুক!

হ্যাঁ, আমি খুব বুদ্ধিমান ভ্যাম্পায়ার-সেকেলে ট্রানসিলভেনিয়ানদের মত নই। এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমার সঙ্গ ভালো লাগবে আপনার।

হুঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু স্বর্গের দেবীর সাথে রক্তচোষা-জুটিটা কেমন বেমানান হয়ে যাচ্ছে না!

সে আমরা মানিয়ে নেব, ভরসা দিল হেনডারসন। তা ছাড়া আপনার মাঝেও তো অশুভ ছায়া রয়েছে। ধরুন এই কালো আলখেল্লাটা। এটার জন্যেই আপনাকে মনে হচ্ছে ডার্ক-অ্যানজেল। যেন স্বর্গের বদলে আমার জায়গা থেকে এসেছেন।

রসালাপে মজে গেলেও হেনডারসনের মাথায় ঝড়োবেগে অন্য চিন্তা চলছে। অতীতের সেই বিতর্কের দিনগুলোকে স্মরণ করছে সে। গ্রীসের প্রাচীন দর্শনে কী প্রচণ্ড বিশ্বাস না ছিল তার!

একসময় হেনডারসন বন্ধুমহলে ঘোষণা দিয়েছিল, শুধু নাটক-নভেল ছাড়া বাস্তবে প্রথম দর্শনে প্রেম বলে কিছু নেই। সে বলে বেড়াত, নাটক-নভেল থেকে মানুষ প্রেম সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেই অনুসারে সবার মনে প্রথম দর্শনে প্রেম নিয়ে একটা বিশ্বাস জন্মে, যখন সম্ভবত কামনাকে অনুভব করা যায়।

এবং এ মুহূর্তে শীলা-এই স্বর্ণকেশী সুন্দরী তার মন থেকে সব অসুস্থ চিন্তা, মদের নেশা, আয়নার ভেতরে বোকার মত উঁকিঝুঁকি একই সঙ্গে ঝেটিয়ে বিদেয় করেছে। তার চোখে এখন রঙিন স্বপ্ন। এক জোড়া লাল ঠোঁট, দ্যুতিময় নীল চোখ এবং পেলব দুটি বাহু উতলা করে তুলেছে তাকে।

হেনডারসনের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের খবর পেয়ে গেল মেয়েটা। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে, এখন থেকে আমরা দুজন একে অন্যের কাছে আর আপনি নই। তুমি!

এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! তবে আমি চাই আরেকটু কাছে যেতে। স্বর্গের দেবী কি নাচবে আমার সাথে?

চতুর ভ্যাম্পায়ার! চলল, ও ঘরে যাই।

হাতে হাত রেখে পার্লারে ঢুকল ওরা। হাসি-আনন্দে ভরপুর উৎসব। ঘর জুড়ে নেশার তরলের ছড়াছড়ি। তবে নাচের প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না কারও। জোড়া জোড়া নারী-পুরুষ ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে খোশগল্পে মশগুল। উৎসবের রীতি অনুযায়ী ছদ্মবেশধারীরা ঘরের কোণে নানান রঙঢঙে মত্ত। হেনডারসন ঘরে ঢোকা মাত্রই ভারি হয়ে উঠল আনন্দমুখর পরিবেশ।

হেনডারসন যখন ভরা আসরের মাঝখানে গিয়ে আলখেল্লার প্রান্ত ঝটকা মেরে কাঁধে তুলল, অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সবার মাঝে। ধ্যান-গম্ভীর নীরবতা নেমে এল ঘরে। বড় বড় পা ফেলে এগোতে এগোতে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। হেনডারসনের জাকুটিপূর্ণ চেহারা। শীলাকে দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটাকে বিরাট একটা তামাশা হিসেবে নিয়েছে সে।

ওদের দেখিয়ে দাও, ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে! ফিক করে হাসল শীলা। শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল হেনডারসনের বাহু। উৎসাহে প্রভাবিত হলো হেনডারসন। যুগলদের দিকে শ্যেনদৃষ্টি হানতে হানতে এগিয়ে গেল সে। বিশেষ করে মেয়েদের। বিকট মুখভঙ্গি করে ভয় দেখাল। অতিথিদের ঝটিতি ঘাড় ফেরানো, তাৎক্ষণিক মৃদু আর্তনাদ-এসব বুঝিয়ে দিল হেনডারসনের উদ্দেশ্য কতটা সফল। মূর্তিমান বিভীষিকার মত লম্বা ঘর জুড়ে বিচরণ করছে সে। পেছন থেকে ক্রমাগত ফিসফাস্ আসছে তার কানে।

লোকটা কে?

আমাদের সাথেই এলিভেটরে এসেছে, এবং সে...

তার চোখ দুটো দেখেছ...

সাক্ষাৎ রক্তচোষা!

হ্যালো, ড্রাকুলা! মার্কাস লিণ্ডস্ট্রোম এবং ক্লিওপেট্রার বেশধারী এক গোমড়া মুখো শ্যামলা মেয়ে এগিয়ে এল হেনডারসনের দিকে। দুজনেই বেসামাল। ক্লাবে যখন লিণ্ডস্ট্রোম স্বাভাবিক থাকে, লোকটাকে তখন ভালোই লাগে হেনডারসনের। কিন্তু পার্টি বা উৎসবে লোকটাকে সহ্য করা মুশকিল। যেমন-এ মুহূর্তে তাকে আর যাই হোক দ্র বলা যাবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ, ঘোষণা দেয়ার ভঙ্গিতে চেঁচাল লিগুস্ট্রোম। এই হ্যালোইনের রাতে আমার অত্যন্ত প্রিয় এক বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সাথে। কাউন্ট ড্রাকুলা এবং তার মেয়েকে দাওয়াত করেছিলাম। তারাই এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত। কাউন্টের দাদীকেও আসতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি জেমিমা ফুপুকে নিয়ে আরেকটা পার্টিতে গেছেন। আসুন, কাউন্ট, আমার ছোট্ট খেলার সাথীটির সাথে কথা বলুন।

ওহ, ড্রাকুলা! অবাক হবার ভান করল মেয়েটি। কী বড় বড় চোখ আপনার! কত বড় বড় দাঁত! ও-ওহ

অন্য কোন সময় হলে লিওস্ট্রোমের চোয়ালে ধাই করে একটা ঘুসি মেরে বসত হেনডারসন। কিন্তু এই হাসিখুশি পরিবেশে এতগুলো লোকের সামনে এমন কাজ করাটা মোটেও সমীচিন হবে না। তাছাড়া শীলা আছে পাশে। এরচে উজবুক লোকটার স্থূল রসিকতায় তাল দেয়াই ভালো। হ্যাঁ, সে পিশাচই একটা!

মেয়েটার দিকে ফিরে মুচকি হাসল হেনডারসন। তারপর ঋজুভঙ্গিতে সমবেত অতিথিবৃন্দের দিকে তাকিয়ে কুটি করল সে। হাত দুটো ঘষল আলখেল্লায়। আশ্চর্য, কাপড়টা এখনও ঠাণ্ডা! নিচের দিকে তাকাতেই প্রথমবারের মত তার নজর পড়ল, আলখেল্লার শেষ প্রান্তে ময়লা লেগে আছে। জমাট ধুলো কিংবা কাদা। ভালো করে দেখার জন্যে আলখেল্লার নিচের দিকটা লম্বা একটা হাত দিয়ে দিয়ে। টেনে তুলল সে।

কিন্তু বুক পর্যন্ত তোলার পর পিছল ঠাণ্ডা সিল্ক হাত ফস্কে পড়ে গেল। বেশ অনুপ্রাণিত দেখাল তাকে। তার চোখ দুটো আরেকটু বড় এবং জুলজুলে হলো। ফাঁক হয়ে গেল মুখ। অদ্ভুত একটা ইন্দ্রিয়শক্তি ভর করল তার ওপর। মার্কাস লিণ্ডস্ট্রোমের নরম, মোটা গলার দিকে তাকাল সে। সাদা চামড়ায় নীল শিরা ফুটে আছে। ঘর-ভর্তি লোক তাকিয়ে আছে তার দিকে। অনুভূতিটা এবার পুরোপুরি গ্রাস করল তাকে। ভজ ভাঁজ চামড়ার গলার ওপর চোখ দুটো স্থির হলো। একজন মোটা মানুষের তুলতুলে গলা!

হেনডারসনের হাত দুটো বেরিয়ে এসেছে। লিস্ট্রোম ভীত ইঁদুরের মত চি চি করে উঠল। তেল চচ্চকে নাদুসনুদুস হঁদুরের মত লাগছে লোকটাকে। রক্তে ঠাসা শরীর। পিশাচেরা রক্ত পছন্দ করে। কিচমিচ্ করা ধাড়ি ইঁদুরের গলার শিরা থেকে বের হওয়া রক্ত!

উষ্ণ রক্ত! মনের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিল হেনডারসন। কণ্ঠের গভীর থেকে বেরোল কথাটা।

হাত দুটো ইতিমধ্যে লিস্ট্রোমের গলায় গিয়ে পৌঁচেছে। কী উষ্ণ গলা! পাগলের মত শিরা খুঁজে বের করল সে। মুখটা এগিয়ে যাচ্ছে গলার দিকে। নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল লিস্ট্রোম। কিন্তু হেনডারসনের বজ্রমুঠি আরও চেপে বসল গলায়। লালচে হয়ে গেল লিস্ট্রোমের চেহারা। রক্ত সব উঠে আসছে। মাথায়। এই তো চাই। রক্ত!

মুখটা আরও বড় হলো হেনডারসনের। শিরশির করে উঠল দাঁত। মোটা গলাটা স্পর্শ করল মুখ। তারপর

থামো! যথেষ্ট হয়েছে! শীতল কণ্ঠ শীলার। হেনডারসনের হাত ধরে টানছে সে। মাথা তুলে তাকাল হেনডারসন। নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই হতবাক। লিণ্ডস্ট্রোমকে ছেড়ে দিল সে। হাঁ করে হাঁপাচ্ছে বেচারা। বিস্ময়ে গোল হয়ে গেছে দর্শকদের মুখ।

হেনডারসনের কানের কাছে ফিসফিস করল শীলা, এটা কী করলে! ভয়ে তো বেচারা আধমরা!

নিজের মাঝে ফিরে আসার চেষ্টা করল হেনডারসন। সবার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে হাসল। বলল, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের উৎসবের আয়োজক আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার ছোট্ট একটা প্রমাণ দেখালাম আপনাদের। আমি সত্যিই একটা রক্তচোষা। তবে আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, দ্বিতীয়বার আর এমন দৃশ্য দেখতে হবে না। এখানে যদি কোন ডাক্তার থাকেন, তা হলে অবশ্যি রক্ত বদলের একটা আয়োজন করতে পারি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সবাই। গোল মুখগুলোতে হাসির হুল্লোড় উঠল। বেশিরভাগই হাসল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত। হেনডারসন তৃপ্ত। কিন্তু মার্কাস লিওস্ট্রোমের মুখে হাসি নেই। সে ভয়-বিহ্বল চোখে হেনডারসনের দিকে তাকিয়ে। হেনডারসন ভালো করেই জানে, তার ভয়টা কীসের।

জটলা ভেঙে যে যার মত ছড়িয়ে পড়ল আবার। এলিভেটর থেকে এক তাড়া খবরের কাগজ নিয়ে বেরিয়ে এল একজন। রঙ মেখে চেহারাটা ঢেকে ফেলেছে সে। মাথায় ক্যাপ আর গায়ে অ্যাপ্রোন চাপিয়ে নিউজ-বয় সেজেছে। পত্রিকা হাতে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল সে, গরম খবর! তাজা খবর! পড়ুন সবাই। হ্যালোইনের বড় চমক! বাড়তি আকর্ষণ!

কলহাস্যরত অতিথিরা কিনতে লাগল পত্রিকা। এক মহিলা এগিয়ে এল শীলার দিকে। শীলাকে যেতে বলল তার সাথে। বিমূঢ় একটা ভাব নিয়ে তার সাথে এগোল শীলা। হেনডারসনকে শুধু বলল, যাই, আবার দেখা হবে।

শীলার অবজ্ঞা গায়ে জ্বালা ধরাল হেনডারসনের। মেয়েটা মনে মনে খেপে গেছে তার ওপর। কিন্তু সে নিজেই তো বুঝতে পারছে না, লিস্ট্রোমকে ওভাবে চেপে ধরেছিল কেন! উঃ, কী ভয়ানক সেই অনুভূতি! কেন এমন হয়েছিল?

নকল নিউজবয় সামনে দিয়ে যাবার সময় অনেকটা অজান্তেই একটা পত্রিকা কিনে ফেলল হেনডারসন। দেখাই যাক, হ্যালোইনের বড় চমকটা কী?

প্রথম পৃষ্ঠায় আঁতিপাতি করে খুঁজেও কোন চমক আবিষ্কার করতে পারল না হেনডারসন। পাতা উল্টে শেষ পৃষ্ঠায় চলে এল সে। পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত শিরোনাম।

শুধু চমকই নয়, খবরটা হেনডারসনের জন্যে একটা রোমহর্ষক ব্যাপার। পড়তে পড়তে আতঙ্কের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছুল সে।

... আজ এক কসটিউম-শপে আগুন লাগে... আটটার পরপরই দমকলবাহিনী সেখানে পৌঁছে... আগুন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়... সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত... ক্ষতির পরিমাণ... ভীষণ অদ্ভুত, মালিকের পরিচয় জানা যায়নি... কঙ্কালটা পাওয়া গেছে–

না! সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠল হেনডারসন।

খবরটা আরেকবার পড়ল সে। আবার কঙ্কালটা পাওয়া গেছে দোকানের নিচে, সেলারে, একটা মাটির বাক্সে। আর বাক্সটা একটা কফিন। আরও দুটো বাক্স ছিল সেখানে। দুটোই খালি। কঙ্কালটা একটা আলখেল্লায় মোড়ানো ছিল। আগুন কোন ক্ষতি করতে পারেনি ওটার।

খবরের শেষে একটা বক্স এঁকে তাতে মোটা কালো কালো অক্ষরের শিরোনামসহ প্রত্যক্ষদর্শীদের মন্তব্য ছাপা হয়েছে। পড়শীরা বড় ভয় পেত জায়গাটাকে। তাদের ধারণা হাঙ্গেরীর ওদিকে দোকানের মালিকের বাড়ি। অজানা অচেনা সব লোক আসত দোকানটায় ডাকিনী-বিদ্যার চর্চা, প্রেত-পূজা-এসব নাকি চলত ওখানে। প্রণয়োদ্দীপক পানীয়, জাদু-টোনার তাবিজ, রহস্যময় ভূতুড়ে পোশাক-কুসংস্কারমূলক বিভিন্ন জিনিসই ছিল দোকানটার পণ্য।

ভূতুড়ে পোশাক-পিশাচ-আলখেল্লা-একে একে সবই ধরা পড়ল হেনডারসনের চোখে। মনে পড়ে গেল বুড়োর সেই কথাগুলো একটা আলখেল্লা। একেবারে আসল!

তা ছাড়া বুড়ো আলখেল্লাটা ফেরতও নিতে চায়নি। বলেছে-দরকার নেই। এখন থেকে ওটা আপনার।

কথাগুলো ঘাই মারল হেনডারসনের মগজে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। সেই প্যানেল মিররের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্ত মাত্র স্থির রইল সে। তারপরই আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা হাত উঠে গেল চোখের সামনে। প্রতিবিম্ব পড়েনি আয়নায়। সহসাই ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল, ভ্যাম্পায়ারদের কোন প্রতিফলন ঘটে না।

কোন সন্দেহ নেই কিছু একটা ভর করেছে তার ওপর। এই অশুভ শক্তি তাকে কোমল হাত আর মাংসল গলার দিকে টানছে। এজন্যেই লিস্ট্রোমকে জাপটে ধরেছিল সে। হায় ঈশ্বর!

ছাতলা পড়া এই কুচকুচে কালো আলখেল্লাটাই যত নষ্টের গোড়া। কোন সাধারণ মাটি নয়, কবরখানার মাটি লেগে আছে এটার সাথে। হিমশীতল এই পোশাকটাই তার মাঝে একটা খাঁটি রক্তচোষাকে জাগিয়ে তুলেছে। এখন ভাবতেই কেমন ঝিঁঝিম্ করছে মাথা-

একসময় সত্যিকারের এক পিশাচের সম্পত্তি ছিল অভিশপ্ত পোশাকটা! এটার আস্তিনে যেমরচে-রঙা দাগ দেখা যাচ্ছে, নির্ঘাত শুকনো রক্ত।

রক্ত! দেখতে কী সুন্দর এই জিনিস! রক্তের উষ্ণতায় আছে প্রাণ, আছে প্রবহমান জীবন।

দূর, উন্মত্ত মাতালের মত কী যা তা ভাবছে সে!

ও, আমার ভ্যাম্পায়ার বন্ধুটি তাহলে এখানে! শীলা কখন যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পায়নি হেনডারসন। বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয় তার। শীলার উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকাতেই সে টের পায়, মেয়েটির টুকটুকে ঠোঁট তাকে নীরব আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। উষ্ণ একটা ঢেউ অনুভব করে হেনডারসন। ঝলমলে কালো পোশাক ভেদ করে উঁচু হয়ে থাকা শীলার ধবধবে গলার দিকে তাকায় সে। আরেকটা উষ্ণতা জেগে ওঠে তার মাঝে। এই উষ্ণতায় রয়েছে ভালোবাসা, কামনা এবং একটি ক্ষুধা।

হেনডারসনের চোখের ভাষা বুঝে নেয় শীলা। তার চোখেও যে ওই আগুন। সেও ভালোবেসে ফেলেছে সামনে দাঁড়ানো পুরুষটিকে।

আবেগের তাড়নায় চট করে আলখেল্লাটা খুলে ফেলে হেনডারসন। বরফ শীতল ভার নেমে যায় গা থেকে। সে এখন অভিশপ্ত পোশাকটার নাগপাশ থেকে মুক্ত। শীলাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার তীব্র একটা ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু জড়তা এসে বাধা দেয়।

কী, ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? শুধোয় শীলা। একই শিহরণ তাকেও দোলা দিচ্ছে। সেও খুলে ফেলে তার আলখেল্লা-অশুভ আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে সত্যিকারের দেবী। অ্যানজেলের পোশাকে দারুণ লাগছে শীলাকে। সোনালি চুল এবং গর্বিত ভঙ্গিমার মাঝে ফুটে উঠেছে তার পূর্ণাঙ্গ নারীসত্তা। অজান্তেই প্রশংসা-ধ্বনি বেরোয় হেনডারসনের কণ্ঠ থেকে। সে ফিসফিস করে বলে, আমার স্বর্গ-সুন্দরী!

শীলাও সাড়া দেয়, আমার শয়তান!

পরমুহূর্তে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয় দুজন। শীলার আলখেল্লাটা চলে আসে হেনডারসনের হাতে। দুরন্ত আবেগে একাকার হয়ে যায় দুজোড়া ঠোঁট।

লিণ্ডস্ট্রোম এবং তার কজন সঙ্গীর আকস্মিক আগমন দুজনের দুর্বার ভালোবাসায় ছেদ ঘটাল। গল্প করতে করতে ঢুকে পড়েছে তারা।

হেনডারসনকে দেখেই কুঁকড়ে গেল লিণ্ডস্ট্রোম। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, তু-তুমি এখনও আছ!

ভয় নেই, হাসল হেনডারসন। এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

শীলাকে জড়িয়ে ধরে খালি এলিভেটরের দিকে এগোল হেনডারসন। তরাস খাওয়া লিগুস্ট্রোমের ছাই-বরণ মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা।

আমরা কি চলে যাচ্ছি? হেনডারসনের কাঁধে মাথা রেখে জানতে চাইল শীলা।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে মাটির ধরায় নয়। নিচে আমার জগতে না গিয়ে যাচ্ছি। ওপরে-তোমার ভুবনে।

ছাদের বাগানে?

হ্যাঁ গো, আমার স্বপ্নের রানী। স্বর্গের বাগানে বসে গল্প করব আমরা। মেঘের চুড়োয় বসে চুমু খাব তোমাকে। তারপর

শীলার ঠোঁট দুটো কথা শেষ করতে দিল না হেনডারসনকে। এলিভেটর উঠতে লাগল আপন গতিতে।

একসময় বিচ্ছিন্ন হলো দুজন। হেনডারসন বলল, দেবীর সাথে শয়তান। এ কেমন জুটি!

আমিও তাই বলেছি, মনে করিয়ে দিল শীলা। আমাদের সন্তানেরা স্বর্গীয় মহিমা, না শয়তানের শিঙ নিয়ে জন্মাবে?

দুটোই থাকবে ওদের সাথে। দেখে নিয়ো।

খোলা নির্জন ছাদে বেরিয়ে এল দুজন। হেনডারসন আবারও অনুভব করল, আজ হ্যালোইনের রাত। নিচে লিণ্ডস্ট্রোম এবং তার সোসাইটি-বন্ধুরা আমোদ-ফুর্তি আর মদ্য পানে মগ্ন। আর এখানে আলো নেই, শব্দ নেই, পানাহার নেই। নিস্তব্ধ বিষণ্ন একটি রাত। অন্যান্য রাতের মতই সাধারণ। তবু এ রাতের আলাদা একটা মর্ম আছে।

আকাশটা এ মুহূর্তে নীল নয়, কালো। কমলা চাঁদের চারদিকে ঘুরে বেড়ানো ধূসর মেঘগুলোকে দৈত্যের থোকা থোকা দাড়ির মত লাগছে। সাগরের ওদিক থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে মৃদু গুঞ্জন।

শীতও পড়েছে বটে!

আমার কাপড়টা দাও, মৃদুকণ্ঠে বলল শীলা।

পোশাকটা ফিরিয়ে দিল হেনডারসন। পাক খেয়ে ঝলমলে কালো কাপড়টার ভেতর ঢুকে পড়ল শীলা। তার ঠোঁট দুটো আবারও তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। হেনডারসন। উপেক্ষা করতে পারল না। জোড়া লেগে গেল দুজোড়া ঠোঁট।

শীতে মৃদু কাঁপছে হেনডারসন। শীলা দেখে বলল, আলখেল্লাটা পরে নাও।

হেনডারসনও আলখেল্লা গায়ে দেয়ার কথা ভাবছে। এটা পরে মেয়েটার দিকে তাকালে কামনা জেগে উঠবে তার। তারপর তৃষ্ণা। প্রথমে সে চুমু খাবে শীলাকে, তারপর ধীরে ধীরে পৌঁছুবে তার মসৃণ গলায়। ভালোবাসায় ভাসতে ভাসতে সানন্দে গলাটা এগিয়ে দেবে শীলা। তারপর

এটা পরো, ডার্লিং-কথা শোনো। শীলার অধৈর্য চোখে তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে।

উত্তেজনায় কেঁপে উঠল হেনডারসন। সত্যিই সে আঁধারের প্রতীক আলখেল্লাটা পরবে? কবরের গন্ধমাখা মৃত্যুর পোশাক গায়ে দিয়ে সাজবে রক্তচোষা?

দেখি, একটু ঘোয়রা তো।

শীলার শীর্ণ হাত দুটো আলখেল্লাটা কাঁধে চাপাল হেনডারসনের। মেয়েটা গভীর মমতায় হাত বোলাল তার গলায়। তারপর আটকে দিল আলখেল্লার বোতাম।

হেনডারসন টের পেল, বরফ-শীতল সেই পরশটা ক্রমেই ভয়ানক রকম উষ্ণতার দিকে যাচ্ছে। নিজেকে আগের চেয়ে আরও বেশি অনুভব করতে পারছে সে। চেহারার পরিবর্তন স্পষ্ট বুঝতে পারছে। এর নাম শক্তি। একটা অশুভ শক্তি!

সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির চোখে চাপা কৌতুক, প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ। তার হাতির দাঁতের মত সাদা সরু গলাটার দিকে তাকাল হেনডারসন। একটু পরেই ওখানে পৌঁছুবে তার ঠোঁট। তারপর

না-এটা হতে পারে না। মেয়েটাকে সে ভালোবাসে। তার ভালোবাসা অবশ্যই এই পাগলামোকে জয় করবে। হ্যাঁ, এই পোশাক পরেই, এটার শক্তিকে হটিয়ে দিয়ে, শীলাকে বুকে টানবে সে। শয়তানের মত নয়, একজন মানুষের মত নিজের প্রেমিকাকে গ্রহণ করবে। এটা তার জন্যে একটা পরীক্ষা।

তোমাকে একটা ঘটনা বলব, শীলা।

চোখ বড় বড় করে শুনতে উন্মুখ হলো মেয়েটা।

আজ রাতের পত্রিকাটা পড়েছ?

হ্যাঁ।

আমি-আমি ওই দোকান থেকে এই আলখেল্লাটা কিনেছি। অদ্ভুত একটা আসুরিক শক্তি আছে এটার। তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। লিগুস্ট্রোমকে কেমন ঠেসে ধরেছিলাম, তুমি তো দেখেছই। ওটা আসলে কিন্তু অভিনয় ছিল না। আমি সত্যিই দাঁত ফুটিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম ওর গলায়। এই পোশাকটা আমার ভেতর সত্যিকারের পিশাচের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি, শীলা।

আমি জানি। চাঁদের আলোতে চিকচিক করছে মেয়েটার চোখ।

আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। এই পোশাকে চুমু খাব তোমাকে। আমি প্রমাণ করতে চাই, ওই জিনিসের চেয়ে আমার ভালোবাসার শক্তি বেশি। যদি দুর্বল হয়ে পড়ি, ব্যর্থ হই, কথা দাও-দ্রুত পালিয়ে যাবে তুমি। আমাকে ভুল বুঝো না, লক্ষ্মীটি! ওই অশুভ শক্তির সাথে প্রাণপণ লড়ব আমি। আমার ভালোবাসা তোমার জন্যে নিখাদ এবং নিরাপদ হোক-এটাই তো আমি চাই। কী, ভয় পেলে?

না। শীলা এখনও তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সে যেমন তাকিয়ে আছে মেয়েটার গলার দিকে। বেচারী যদি তার মনের খবর জানত!

তুমি আবার ভেবে বোসো না, মাথাটা আমার বিগড়ে গেছে, বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল হেনডারসন। ওই দোকানে-এক বিরক্তিকর বেঁটে বুড়ো এই আলখেল্লাটা আমাকে দিয়ে বলল, এটা নাকি সত্যিকারের ভ্যাম্পায়ারের পোশাক। ভেবেছিলাম বুড়ো তামাশা করেছে। কিন্তু এই পোশাকে আয়নার সামনে দাঁড়ালে কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না এবং এটার প্রভাবেই লিস্ট্রোমের গলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এমনকী তোমার প্রতিও। কাজেই আমাকে পরীক্ষাটা করতেই হবে।

শীলা তৈরি। চেহারায় চাপা কৌতুক। হেনডারসন তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল বিপরীত দুই অনুভূতির। কমলা চাঁদের ভৌতিক আলোতে মুহূর্তকাল মাত্র স্থির দেখা গেল তাকে। পরক্ষণে তার চোখে মুখে ফুটে উঠল কঠোর চেষ্টার চিহ্ন।

এবং মেয়েটা তাকে প্রলুব্ধ করল। তার লাল টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিল সাদা দাঁত। কালো আলখেল্লার ভেতর থেকে ফর্সা দুটি হাত এসে আস্তে করে পেঁচিয়ে ধরল হেনডারসনের গলা। মেয়েটা এবার মুখপিটে হেসে আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠল, আমি আগে থেকেই জানি, আমারটার মত তোমার আলখেল্লাটাও আসল। তুমি যেখান থেকে এনেছ, আমারটাও একই জায়গার। আয়নায় শুধু তোমার না, আমারও কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না। বোকা, খেয়াল করোনি।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে বরফের মত জমে গেল হেনডারসন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজোড়া চতুর ঠোঁট তার গলা স্পর্শ করল। কুট করে বিধে গেল সুতীক্ষ দাঁত। প্রথমে সূক্ষ্ম একটা বেদনা, তারপর আশ্চর্য সুখকর অনুভূতি। একটা সর্বগ্রাসী অন্ধকার ক্রমশ গিলে খেতে লাগল হেনডারসনকে।

মধ্যরাতের খাবার

ক্রি রি রিং। টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠল নিতু। একা বাড়িতে ও। একটা ভূতের গল্প পড়ছিল। বাবা মা সিনেমা দেখতে গেছেন। রাত বারোটার আগে ফিরবেন না। ফোন বেজেই চলেছে। ধরছে না নিতু। জানে বাবা মার ফোন নয়। প্রয়োজন হলে নিতুর মোবাইলে তার ফোন করতেন। আজেবাজে কারও ফোন নয়তো? ইদানীং একটা ছেলে খুব জ্বালাচ্ছে পঞ্চদশী নিতুকে। যখন তখন মোবাইলে ফোন করে বলে বেশিরভাগ সময় সেল ফোন বন্ধ রাখে নিতু। তারপক্ষে নিতুদের বাড়ির নাম্বার জোগাড় করা কঠিন কিছু নয়। ধরবে না ধরবে না করেও রিসিভার তুলে নিল ও। ঝুন ঝুন শব্দটা চাপ সৃষ্টি করছে নার্ভে।

হ্যালো?

এক মহিলা কণ্ঠ। চিনতে পারল না নিতু। খুব দ্রুত কথা বলছেন। বললেন এ মুহূর্তে তার একজন বেবী-সিটার খুব দরকার। খুব জরূরী প্রয়োজনে এখুনি বাইরে যেতে হচ্ছে তাকে। নিতু যদি ঘণ্টা তিনেকের জন্য তার সাত মাসের বাচ্চাটাকে একটু দেখে রাখে খুবই কৃতজ্ঞবোধ করবেন তিনি।

জবাব দিতে ইতস্তত করল নিতু। স্কুলে গরমের ছুটিতে এবারই প্রথম ও বাইরে যায়নি। সময় কাটাতে প্রতিবেশী এক আন্টির ডে কেয়ার সেন্টারে বেবী সিটিং করছে। সন্দেহ নেই মহিলা ওখান থেকে জোগাড় করেছে নিতুর নাম্বার। কিন্তু সে তো দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টার জন্য বেবী সিটিং করে। এখন বাজে রাত সাড়ে আটটা। এত রাতে যাওয়া কি ঠিক হবে?

নিতুর কণ্ঠে দ্বিধা লক্ষ করে মহিলা চট করে এমন একটা পারিশ্রমিকের প্রস্তাব দিলেন, যে কেয়ার সেন্টারের প্রায় আধা মাসের বেতনের সমান। এবার আর দ্বিধা করল না নিতু। তাছাড়া রাতে কখনও বেবী সিটিং করেনি ও। এর মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধও আছে। মহিলা নিতু রাজি হয়েছে জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন পনেরো মিনিটের মধ্যে নিতুদের বাসায় আসছেন ওকে তুলে নিতে। বাড়ির ঠিকানা তার জানাই আছে। ডে কেয়ার সেন্টারে নিতুর ফোন নাম্বারের সঙ্গে বাড়ির ঠিকানাও লেখা ছিল।

বাবাকে ফোন করল নিতু। মোবাইল অফ। মনে পড়ল সিনেমা হল-এ ছবি চলাকালীন মোবাইল বন্ধ রাখতে হয়। বাবা মা মেট্রো সিনেমা হল-এ হরর ছবি ভ্যান হেলসিং দেখতে গেছেন। ছবিটি নাকি রমরমা চলছে। সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না নিতুর। সে কার্টুন ছবি দেখে আর বই পড়ে। বইয়ের মধ্যে নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছে নিতু। বেবী সিটারের কাজটাও উপভোগ করে সে। নাদুসনুদুস গুটু গুটু বাচ্চাগুলোর সঙ্গে খেলা করে ভালোই কেটে যায় সময়।

কাঁটায় কাঁটায় পোনে নটায় নিতুদের বাড়িতে হাজির হয়ে গেলেন মহিলা। নিজের পরিচয় দিলেন মিসেস বারলফ বলে। কৈনসিংটন স্ট্রীটে থাকেন। হড়বড় করে বললেন হঠাৎ একটি জরুরী বিজনেস ডিনারে যেতে হচ্ছে তাকে। তার স্বামী আগেই চলে গেছেন ওখানে। ফোন করে মিসেস বারলফকে এখুনি যেতে বলেছেন। না গেলেই নয়। এতটুকু বাচ্চাকে ডিনারে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই উপায় না দেখে নিতুকে ফোন করেছেন। নিতুর নাম শুনেছেন মিসেস ক্রিস্টির কাছে। নিতুর মনে পড়ল একটি সুপার মার্কেটে কর্মরত মিসেস ক্রিস্টি তার দুবছরের মেয়েটিকে সকালবেলা নিতুদের ডে কেয়ার সেন্টারে দিয়ে যান। কাজ শেষে নিয়ে যান।

কালো একটা গাড়িতে চড়ে এসেছেন মিসেস বারলফ। গাড়ি চলতে শুরু করার পর নিতুর মনে পড়ল মহিলার তড়বড়ানির চোটে সে মহিলার ফোন নাম্বার কিংবা বাড়ির ঠিকানা কোনও কিছুই বাসায় রেখে আসেনি। এমনকী তাড়াহুড়োয় মোবাইল ফোনটাও আনা হয়নি। মিসেস বারলফ আশ্বস্ত করলেন তাকে। বললের নিতুর বাবা মা বাসায় ফেরার আগেই তাকে নিজে বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। ডিনার শেষ হওয়া মাত্র নিজের বাসায় চলে আসবেন মিসেস বারলফ।

অ্যাডভেঞ্চারের লোভে বেবী সিটিংয়ের প্রস্তাবে তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হয়ে গেলেও এখন কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে নিতুর। বারবার মনে হচ্ছে কাজটা বোধহয় ঠিক করেনিও।

বৃষ্টি পড়ছে। শীতল হাওয়া আসছে খোলা জানালা দিয়ে। ঘুম ঘুম ভাব এসে গেল নিতুর। চটকা ভেঙে গেল মহিলার খসখসে কণ্ঠস্বরে।

আমার বাচ্চাটাকে তোমার ভালোই লাগবে, বললেন মিসেস বারলফ। মাত্র সাত মাস বয়স ওর। কিন্তু এখনই মাথায় ক্ষুরধার বুদ্ধি।

কী নাম ওর? জিজ্ঞেস করল নিতু। আপনার বাচ্চা কি জেগে আছে এখনও।?

না। না। নিকোলাস ঘুমিয়ে পড়েছে আরও ঘণ্টাখানেক আগে। হাসলেন মিসেস বারলফ। মহিলার ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। ভ্যাম্পায়ারের মত লাগছে।

নিতু জানল মহিলার বাচ্চা রাত বারোটায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তখন তাকে দুধ খাওয়াতে হয়।

আপনার ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা বাজবে নাকি? শঙ্কিত হলো নিতু।

আমি বারোটার আগেই ফিরে আসার চেষ্টা করব।, বললেন মিসেস বারলফ। পার্টির ব্যাপার। বোঝোই তো। তবে ভয় নেই। আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব তোমাকে বাসায়।

অন্ধকার রাত। বৃষ্টির কারণে রাস্তায় নোক চলাচল নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে একটা দুটো গাড়ি স্যাঁৎ করে ওদের গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে মুখে হেডলাইটের জোরালো আলো ফেলে।

কনসিংটন স্ট্রীটে ঢুকল কালো গাড়ি। মহিলা ভালোই ড্রাইভ করেন। মেইন রোড ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে বামে মোড় নিলেন তিনি। ঢুকে পড়লেন লম্বা, আঁকাবাকা একটা গলিতে। নিতু জায়গাটা চেনার চেষ্টা করল। ইলেকট্রিসিটি নেই। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কিছু। হঠাৎ আরেকটা মোড় ঘুরলেন মিসেস বারলফ। প্রকাণ্ড, পুরানো একটা বাড়ির সামনে ব্রেক কষলেন। প্রকৃতি ফর্সা করে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ। সোনালি আলোতে বাড়িটির পেছনে একটা মাঠ দেখতে পেল নিতু। তার পরে জঙ্গল। জঙ্গল! নিউইয়র্ক শহরে জঙ্গল!! এ কোথায় এসেছে নিতু। ওর গা ছমছম করে উঠল। আশপাশে কোথাও বাতি না জ্বললেও দোতলা বিশাল বাড়িটিতে আলো দেখতে পেল। নিশ্চয় জেনারেটর চলছে। বাড়ির সামনে পুরানো আমলের দুটো গ্যাস ল্যাম্প জ্বলছে। মাটিতে অদ্ভুত ছায়া ফেলছে।

বাড়িটি ধূসর রঙ করা। জানালায় হলুদ রঙ। ছাদটা ঢালু। পুরো বাড়িটিতে কেমন ভীতিকর একটা ব্যাপার আছে। নিতুর পেটের ভেতরটা শিরশির করছে। আবারও মনে হলো ভুল করে ফেলেছে ও। এখানে আসা উচিত হয়নি।

নিতুর দিকের দরজা খুলে গেল। মিসেস বারলফ দাঁড়িয়ে আছেন পাশে, চেহারায় অধৈর্য ভাব।

নেমে এসো, বললেন তিনি। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার স্বামী রাগ করবেন।

মহিলার কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট। আমি নামতে চাই না, কথাটা বলার সাহস হলো না নিতুর। দরজা খুলে নেমে পড়ল ও। মহিলার পেছনে পেছনে এগোল সদর দরজার দিকে। ভারী সেগুন কাঠের দরজা। বড়, কালো একটা চাবি বের করলেন তিনি, তালায় ঢুকিয়ে মোচর দিলেন। ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা।

একটা সরু হলঘরে ঢুকল নিতু। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে মিটমিট করে জ্বলছে মোম। কালো, আর লাল ব্রোকেড পেপারে মোড়া দেয়ালে ভৌতিক ছায়া ফেলেছে। মাথায় উপর একটা ঝাড়বাতি জ্বেলে দিলেন মিসেস বারলফ। নিতুর শুকনো চেহারা লক্ষ করলেন।

তোমাকে কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে, হাসলেন তিনি। এখানে ভয়ের কিছু নেই। নিকোলাসের ঘর দোতলায়। রান্নাঘরটা বাড়ির পিছন দিকে। লাইব্রেরি আছে। সময় কাটাতে বই পড়তে পারো। তুমি বসো। আমি নিকোলাসকে একটু দেখে আসি।

মহিলা দোতলায় উঠে গেলেন। একটু পরে নেমে এলেন। নিকোলাস ঘুমাচ্ছে। জানালেন তিনি। আমার ফিরতে যদি দেরি হয়ে যায় ওকে কিন্তু খেতে দিতে ভুল কোরো না। আর হ্যাঁ, একটা কথা ভুলেও কিন্তু ওর ঘরের জানালার পর্দা খুলবে না।

তড়িঘড়ি চলে গেলেন মিসেস বারলফ, নিতুকে গুড় বাই বলারও সুযোগ দিলেন না। মোটর স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনল নিতু। গর্জন তুলে চলে গেল কালো গাড়ি। নিতু হঠাৎ উপলব্ধি করল এই অদ্ভুত বাড়িতে সে একা। সামনের দরজায় দ্রুত গেল ও। লাগিয়ে দিল ছিটকিনি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল নিতু। বাচ্চার ঘরে যাবে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, ধুকপুক শুরু হয়ে গেল বুকে। সামনের হলঘরটা ছায়াময়, অন্ধকার। পুরো বাড়িটাকেই ওর হরর সিনেমার ভৌতিক বাড়ির মত মনে হচ্ছে।

হলঘরের শেষ মাথায় চলে এল নিতু। একটা দরজা দেখতে পেল। ভেজানো। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল। উঁকি দিল।

লাল ডিম বাতি জ্বলছে ঘরে। লম্বা, কাঠের একটা দোলনা দেখতে পেল নিতু। নিঃশব্দে ওদিকে হেঁটে গেল ও। ঝুঁকল। ভারি সুন্দর একটি বাচ্চা শুয়ে আছে। দোলনায়। মুখখানা নিতুর দিকে ফেরানো। একমাথা ঘন কালো চুল। নিতুর আগমনে টের পেয়েই কিনা কে জানে, চোখ মেলে চাইল নিকোলাস। ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

সম্মোহিতের মত বাচ্চাটার দিকে চেয়ে রইল নিতু। চোখ বুজল নিকোলাস। ঘুমিয়ে পড়ল আবার। মিষ্টি, নিষ্পাপ মুখে স্মিত হাসি। মিসেস বারলফের শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটি নিতুর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিলেও বাচ্চাটাকে তার খুবই ভালো লেগেছে।

লাইব্রেরি ঘরটা কোন দিকে দেখিয়ে দিয়েছেন মিসেস বারলফ। ওই ঘরে ঢুকল নিতু। ঘরটা কালো কাঠের প্যানেলিং দিয়ে তৈরি। বড় বড় পিঠ উঁচু চেয়ার আর একজোড়া কালো চামড়ার কাউচ চোখে পড়ল নিতুর। চেয়ারের পাশে একটা বাতি। বাতি জ্বালিয়ে চেয়ারে বসল নিতু। বাতির আলোয় ঘরের অন্ধকার দূর হলো সামান্যই। তবে বই পড়া যাবে।

লাইব্রেরি ঘরে কয়েকটা কালো কাঠের আলমারি। তাতে প্রায় সবই ঢাউস সাইজের ইংরেজি বই। বাতির আলোয় দুএকটা বইয়ের নাম পড়তে পারল নিতু। ব্ল্যাক ম্যাজিক আর উইচক্রাফটের উপর লেখা। সঙ্গে একটা হরর বই তো আছেই। তাই ওদিকে আর নজর দিল না নীতু। নিজের আনা ভৌতিক গল্প সংকলনে মনোনিবেশ করল।

কড়-কড়-কড়াৎ! শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। বুকের রক্ত ছলকে উঠল নিতুর। পরমুহূর্তে বিদ্যুতের আলো ঝলসে দিল ঘর। চেয়ার ছেড়ে উঠল ও। হেঁটে গেল লাল পর্দা ফেলা জানালার ধারে। ভারী পর্দা টেনে সরাল। মাঠের ধারের জঙ্গলে বাহু ছড়িয়ে নাচছে গাছের ডাল। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে আরও। হঠাৎ কারও সঙ্গে কথা বলার খুব ইচ্ছে

জাগল নিতুর-বাবা, মা, বন্ধু, কিংবা অন্য কেউ। লাইব্রেরি ঘরে টেলিফোন খুঁজল নিতু। নেই। হলঘরেও পেল না।

অকস্মাৎ আতংক ভর করল নিতুর মনে। কুডাক ডাকছে মন। এক ছুটে বসার ঘরে ঢুকল। অন্ধকার। দেয়াল হাতড়াল বাতির সুইচের জন্য। হঠাৎ কীসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল ও। নরম কী একটা ছুটে পালিয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল নিতু। দৌড়ে চলে এল লাইব্রেরি ঘরে। লাল চেয়ারটাতে বসে পড়ল। পা মুড়ে নিল। হাত দিয়ে ঢাকল মুখ। তারপর ফোঁপাতে শুরু করল।

.

তীব্র কান্নার আওয়াজে জেগে গেল নিতু। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। ভীত চোখে চাইল চারপাশে। এক মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারল না কোথায় আছে। তারপর মনে পড়ে গেল সব। দোতলা থেকে ভেসে আসছে টা টা চিৎকার। লাইব্রেরি ঘরের গ্রাণ্ডফাদার কুক গম্ভীর ঢং ঢং সুরে জানান দিল বারোটা বাজে। এখন মাঝ রাত। খিদে পেয়েছে নিকোলাসের।

নিতুর অবাক লাগল ভেবে ঠিক বারোটার সময়ই কি খিদে পেয়ে যায় বাচ্চার? আর এভাবে তারস্বরে কাঁদতে থাকে? মিসেস বারলফ তো বললেন বারোটার আগেই ফিরবেন। কই এলেন না তো এখনও!

বাচ্চার কান্না তীব্রতর হলো। কানে বাড়ি খাচ্ছে দ্রিম দ্রিম। লাফ মেরে উঠে পড়ল নিতু, এক ছুটে চলে এল রান্নাঘরে। বাচ্চার কান্না প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সারা বাড়িতে।

সুইচ টিপে বাতি জ্বালল নিতু। ওর সাড়া পেয়ে একটা ইঁদুর ফ্রিজের নিচে লুকিয়ে পড়ল। মাগো, কত্তবড় ইঁদুর! গায়ে কাঁটা দিল নিতুর। একটানে ফ্রিজের দরজা খুলল। ওপরের শেলফে একটা বোতল বোঝাই কালো রঙের জুস। দুধের বোতল খুলল নিতু। নেই। শেষে জুসের বোতল নিয়েই ছুটল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বাইছে নিতু, কলজে যেন গলায় এসে ঠেকেছে।

নিকোলাসের ঘরে ঢুকল নিতু। দোলনা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা। মুখ হাঁ করে কাঁদছে। নিতুকে দেখে থেমে গেল কান্না। হাত বাড়াল বোতলের দিকে। বোতলটা ওর হাতে দিল নিতু। দেখল বোতল মুখে পুরে চুক চুক করে জুস খাচ্ছে নিকোলাস। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নিতু। যাক, বাচ্চা ঠিকই আছে। স্রেফ খিদেয় কান্নাকাটি করছিল। ঘরে জিরো ওয়াটের লাল রঙের ডিম বাতি ছাড়া কিছুই জ্বলছে না। নিতু সুইচ খুঁজল অন্য বাতিগুলো জ্বেলে দেয়ার জন্য। আশ্চর্য! ডিম বাতি আর এয়ার কুলারের সুইচ ছাড়া আর কোনও সুইচ নেই ঘরে। এয়ারকুলার বন্ধ। তাই ভাপসা গরম লাগছে। এসি ছাড়ল নিতু। চলল না এয়ার কুলার। নষ্ট নাকি? নিতু জানালার দিকে এগিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল মিসেস বারলফের সতর্কবাণী। তিনি জানালা খুলতে নিষেধ করেছেন। হয়তো বিদ্যুতের আলোয়

ভয় পেয়ে জেগে যেতে পারে নিকোলাস, এ আশঙ্কায়। এখন তো জেগেই আছে বাচ্চা। জানালার পর্দা টেনে সরাল নিতু।

থেমে গেছে বৃষ্টি। আকাশের কালো মেঘ কেটে ভেসে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। রূপোলি আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল নিকোলাসের দোলনা। সে মুখে বোতল রেখে চোখ বড়বড় করে তাকাল চাঁদের দিকে।

জানালা খুলতে যাচ্ছে নিতু, থমকে গেল অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে। বাচ্চার মাথার পেছনের জানালায় থ্যাচ করে একটা শব্দ হয়েছে। এগিয়ে গেল নিতু। কাঁচের গায়ে সেঁটে আছে একটা বাদুড়, তাকিয়ে রয়েছে বাচ্চার দিকে। ঘেন্নায় মুখ বাঁকাল নিতু, পিছিয়ে গেল এক কদম। আরেকটা বাদুড় এসে নামল জানালায়। নিকোলাস হাঁ করে তাকিয়ে আছে বিকট প্রাণীগুলোর দিকে। হঠাৎ হাত থেকে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে মেঝেতে। ঝুঁকে গেল জানালার দিকে। মেঝে থেকে বোতলটা তুলে নিল নিতু। ঘন কয়েক ফোঁটা রস পড়েছে মেঝেতে। কালচে রক্তের মত দেখাচ্ছে। গা টা কেমন রি রি করে উঠল।

ঠিক তখন নিতুর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল নিকোলাস, লম্বা, একটানা সুরে কাঁদতে লাগল। উ্যা আম্ম-টা আ আ! হাত বাড়িয়ে দিল। কোলে নিতে বলছে। নিকোলাসের কান্নাটা ঠিক যেন মানুষের বাচ্চার মত নয়, প্রলম্বিত ভৌতিক একটা সুর। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল নিতুর। ওকে কোলে নেবে কি নেবে না দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে, চিৎকারের

মাত্রা বেড়েই চলল বাচ্চার। শেষে বাধ্য হয়েই ওকে কোলে নিল নিতু। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কান্না। নিতুর ঘাড় জড়িয়ে ধরল নিকোলাস।

নিতুর পেছনে আবার থ্যাচ করে শব্দ হলো। বুঝতে পারল আরেকটা বাদুড় এসে বসেছে জানালায়। ওদের দিকে তাকিয়ে আছে নিকোলাস, চাঁদের আলোয় চকচকে করছে চোখ। ওকে কাঁধে তুলে নিল নিতু। আদর করে চাপড় দিতে লাগল পিঠে। ওর মাথাটা ঘাড়ের পাশে এলিয়ে দিল। ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। নিতু টের পেল নিকোলাসের শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত হিস শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল নিতু, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। চারটে ছোট দাঁত কামড়ে ধরল নিতুর ঘাড়, এক টানে ছিঁড়ে ফেলল জুগুলার ভেইন।

রাত যখন বারোটা

ওরা চার বন্ধু। শুভ, রুবেন, দীপ আর মন্টু। বেড়াতে এসেছে মন্টুদের গ্রামের বাড়িতে। মন্টুদের বাড়িটা বিল। গ্রামের এক প্রান্তে। ওদের বাড়ির পরে খোলা খাস জমি। তারপর কবরস্থান। মন্টুদের গ্রামটাকে অজপাড়াগাঁই বলা যায়। এখানো বিদ্যুৎ আসেনি। রাত নয়টার মধ্যে সারা গা ঘুমে ঢলে পড়ে। শুভ, রুবেন এবং দীপ শহরের ছেলে। রাত বারোটা/একটার আগে বিছানায় যেতে মন চায় না। ওদের। গ্রামটা খুব নিস্তব্ধ বলে গা ছম ছম করতে থাকে। এই মুহূর্তে চার বন্ধু। মিলেছে চিলেকোঠার ঘরে। হারিকেন জ্বলছে। ফিসফাস কথা চলছে।

শুভ চিলোকোঠার ছোট জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরেটা একবার দেখল। ওই দ্যাখ, পুরনো গোরস্তানটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মন্টু। চাঁদের আলোয় কেমন ভৌতিক লাগছে।

শুভর দেখাদেখি মন্টু, দীপ আর রুবেনও উঁকি দিল জানালায়।

পাথরের সমাধিগুলো লক্ষ্য করেছিস? বলল দীপ। চাঁদের আলোয় ধবধব করছে। কংকালের মত।

দাদু ওই গোরস্তান নিয়ে অনেক রোমহর্ষক গল্প বলেছে আমাকে, জানায়। মন্টু। দাদু আজতক আমাকে ওখানে যেতে দেয়নি।

শুভ মন্টুর দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল। গোরস্তানকে এত ভয় কিসের? মাটির নিচে কতগুলো কংকাল বৈলতা অন্যকিছু নেই ওখানে। তোর কি ধারণা গোরস্তানে গেলে কংকালগুলো কবর থেকে উঠে এসে তোর ওপর হামলে পড়বে?

সবাই এ কথায় হেসে উঠল। চটে গেল মন্টু। ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে বলল, তোর যদি এতই সাহস তা হলে যা না একবার গোরস্তানে। রাত দুপুরে ঘুরে আয়। দেখব হিম্মত।

সবাই ঘুরে তাকাল শুভর দিকে। হারিকেনের আলোটা একটু উস্কে দিল শুভ। ছায়াময় অন্ধকারে ওর চোখজোড়া চকচক করছে। অদ্ভুত হাসি ফুটল ঠোঁটে। বলল, গোরস্তানে যাওয়া আমার জন্যে কোন ব্যাপারই না। কখন যেতে হবে বল।

পারলে আজ রাতেই যা। রাত ঠিক বারোটায়, রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বসে মন্টু।

দরকার নেই বাপু রাত বিরেতে গোরস্তানে যাবার, ভয় পেয়ে গেছে রুবেন। ও একটু ভীতু প্রকৃতির। শেষে দাদু জানলে কেলেংকারী হবে।

দাদুকে তোরা না জানালে উনি জানবেন কি করে? বলল শুভ।

তবে তুই যে সত্যি গোরস্তানে গিয়েছিস আমরা জানব কি করে? বলল মন্টু। আমরা প্রমাণ চাই।

কি প্রমাণ চাস? জিজ্ঞেস করল শুভ। একটা আস্ত কংকাল নিয়ে আসব?

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, এতক্ষণে কথা বলল স্বল্পভাষী দীপ। গোরস্তানের মাঝখানে একটা বার্চ গাছ আছে। দেখতে পাচ্ছিস সবাই? এ গ্রামের মধ্যে ওটাই একমাত্র বার্চ গাছ। শুভ যদি ওই গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে আসতে পারে তাহলেই বুঝব ও গোরস্তানে গিয়েছিল।

বেশ তাই হবে, বলল শুভ।

তাহলে আজ রাত বারোটায়? বলল মন্টু।

রাত বারোটায়, মাথা ঝাঁকাল শুভ।

যাসনে, কাঁদো কাঁদো গলায় রুবেন বলল। দরকার কি বাপু এত রাতে গোরস্তানে যাবার?

চিন্তা করিস না, বলল শুভ। তোরা এখানেই থাকবি। আমি রাত দুপুরে যে গোরস্তানে যেতে ভয় পাই না তা প্রমাণ করে ছাড়ব।

.

রাত পৌনে বারোটার সময় জ্যাকেট গায়ে গলিয়ে মন্টুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল শুভ। অক্টোবরের শেষ। ঢাকায় এখনো শীত পড়েনি। কিন্তু এখানে হিম বাতাসে গায়ে কাঁপুনি উঠে গেল শুভর। গোরস্তানে যাবার একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, গির্জার পাশ দিয়ে। মন্টুদের গ্রামে খ্রীস্টানদের সংখ্যাই বেশি। আর গির্জাটা প্রায় দুশো বছরের পুরানো। ...গির্জার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শুভ, হঠাৎ টাওয়ারের ঘড়িটা গম্ভীর আওয়াজে বাজতে শুরু করল। রাতের নিস্তব্ধতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল ঘণ্টা ধ্বনির শব্দে। এক... দুই... তিন... একটানা বেজে চলল ঘণ্টা। ঢং ঢং ঢং। শুভ গুণল নয়... দশ... এগারো... বারো। থেমে গেল ঘণ্টা ধ্বনি। শুভর সমস্ত শরীর কেন জানি হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে উঠল। ঘণ্টাধ্বনি ওর স্নায়ুর ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে এখন মাঝরাত, ব্যাপারটা উপলব্ধি করার পর একটু একটু ভয় করছে ওর।

গির্জার পাথুরে দেয়ালের পাশ দিয়ে হন হন করে এগোল শুভ। দেয়ালের শেষ মাথায় লোহার ছোট একটা বেড়া, খ্রীষ্টানদের গোরস্তানটাকে ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে। গেটের দিকে এগোচ্ছে শুভ, খসখস শব্দ হলো পেছনে। যেন কেউ বা কিছু দেয়ালে গা

ঘষে ঘষে আসছে। এক মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়াল শুভ, দমাদম হাতুড়ি পিটছে বুকে। হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে চলে এসেছে গলার কাছে। মুখ তুলে চাইল ও। দূরে, কালো আকাশের পটভূমিকায় দেখা গেল মন্টুদের প্রকাণ্ড বাড়িটা। মিটমিট আলো জ্বলছে চিলেকোঠার ঘরে। আবছা কয়েকটা ছায়া দেখা যাচ্ছে না জানালার ধারে? কে জানে মন্টুরা হয়তো দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। দেখার চেষ্টা করছে শুভ সত্যি গোরস্তানে যাচ্ছে কিনা। নাহ্, থেমে দাঁড়ালে চলবে না, সিদ্ধান্ত নিল শুভ, এগোতে হবে।

লোহার বেড়ার গেট বন্ধ। শুভও তাই ভেবেছিল। বন্ধ থাকবে গেট। গোরস্তানের গেট সন্ধ্যার পরপর বন্ধ করে দেয়া হয়। বেড়ার ঠাণ্ডা, লোহার গরাদে হাত রাখল শুভ। ভাবছে কি করা যায়। হঠাৎ কয়েক কদম পিছিয়ে এল ও। তারপর দৌড় দিল। একলাফে বেড়ার ওপাশে। গোরস্তানের ভেজা, নরম ঘাসে ল্যাণ্ড করল ও।

মিনিট খানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শুভ। আশেপাশের পরিস্থিতি বুঝে নেয়ার। চেষ্টা করছে। হঠাৎ সবকিছু ওর কাছে কেমন অন্যরকম মনে হতে লাগল। গোরস্তানের বাইরেটা নিজাব, প্রাণহীন লাগছে। কিন্তু বেড়ার ভেতরে-অন্যরকম। চাঁদের আলোয় সমাধি স্তম্ভগুলো বিশাল দেখাচ্ছে। কোন কোনটি ওর চেয়েও লম্বা। যেন ঝুঁকে আছে ওর দিকে, ওগুলো ঠাণ্ডা, সাদা মার্বেল পাথর চাঁদের আলোয় চক চক করছে।

দুপাশে কবর, মাঝখানে রাস্তা।

রাস্তা বলতে ঘাসে ছাওয়া, এবড়ো খেবড়ো আল। হাঁটছে শুভ। হঠাৎ ছোট একটা পাথরে হোঁচট খেল। দাঁড়িয়ে পড়ল। খসখস শব্দ হলো পেছনে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ও। কিছু নেই। একটা বড় সমাধি স্তম্ভ, তাতে পাথরের মুখ খোদাই করা, যেন তাকিয়ে আছে শুভর দিকে। ঘাড়ের পেছনের সমস্ত চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল, গায়ে কাঁপুনি উঠে গেল শুভর। এবার শীতে নয়, ভয়ে।

ছুটল শুভ। কবরগুলোর মাঝ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। লক্ষ্য গোরস্তানের মাঝখানের বার্চ গাছ। নিজেকে বোঝাতে চাইছে আসলে খামোকা ভয় পাচ্ছে ও। পেছনে কিছুই নেই। কিন্তু প্রতিটি পা ফেলার সময় খসখস শব্দটা হয়েই চলেছে। অনেক কষ্টে আবার ফিরে তাকাল শুভ। পাথুরে কবর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। মৃতদের পাহারা দিচ্ছে নীরবে।

অনেকটা ছোটার পর বার্চ গাছটাকে দেখতে পেল শুভ। চাঁদের আলোয় ওটার সাদা ডালপালাগুলো যেন জ্বলছে। আর কয়েক পা এগুলেই গাছটাকে ছুঁতে পারবে সে, ভাবল শুভ, তারপর একটা ডাল ভেঙে নিয়ে সোজা বাড়ি।

হঠাৎ নিচু, গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল বাতাসে, আঁতকে উঠল শুভ। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল হিম স্রোত। ওটা কিছু নয়, নিজেকে সান্ত্বনা দিল শুভ, স্রেফ প্যাচার ডাক। মুখ তুলে চাইল ও। মাথার ওপর একটা গাছের মগডালে প্যাচাটাকে খুঁজল। কিন্তু ওখানে কোন প্যাচা নেই। গাছটার মাথার ওপর দিয়ে কালো এক টুকরো মেঘ ভেসে যাচ্ছে।

আবার দৌড় শুরু করল শুভ। বার্চ গাছের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, এমন সময় ছোট একটা সমাধি স্তম্ভে পা ঠেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ও। নাকে বোটকা একটা গন্ধ ঝাঁপটা মারল। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল শুভ। চাঁদ আবার কালো মেঘের আড়ালে চলে গেছে। আরো অন্ধকার এবং ভৌতিক লাগল গোরস্তান। সামনে কিছু দেখাই যায় না।

সামনে হাত বাড়িয়ে, অন্ধের মত হোঁচট খেতে খেতে এগোল শুভ। এদিকটাতে অন্ধকার। কিছু ঠাহর করা মুশকিল। হঠাৎ ডান হাতে শক্ত, ঠাণ্ডা কি যেন ঠেকল। বাম হাতটাও বাড়িয়ে দিল শুভ। দুহাতে ধরল এবার ঠাণ্ডা, শক্ত জিনিসটাকে। বার্চের ডাল হবে হয়তো। মনে মনে বলল শুভ। তারপর হ্যাঁচকা টান দিল। বিকট শব্দে ভেঙে জিনিসটা চলে এল শুভর হাতে। হঠাৎ কেন জানি খুব ভয় লেগে উঠল শুভর। শক্ত ডালটা বগলে চেপে ঘুরে দাঁড়াল ও। ছুটতে শুরু করল।

কোনদিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না শুভ। ও এখন মনেপ্রাণে গোরস্তান থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। সেই চাপা গোঙানির আওয়াজ ক্রমে বেড়ে চলেছে, সেই সাথে খসখসে শব্দটাও। ওটা যেন পিছু নিয়েছে ওর। অশুভ আশঙ্কায় বুক ধড়ফড় করে শুভর। অন্ধের মত ছুটছে ও। বার দুই ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। কিন্তু বগলের নিচে চেপে রাখা বার্চের ডাল ছাড়ল না কিছুতেই। বন্ধুদেরকে দেখাতে হবে সে চ্যালেঞ্জ জিতেছে।

হঠাত্র গির্জার প্রকাণ্ড কাঠামোটা চোখের সামনে ফুটে উঠল। ওই তো লোহার বেড়া দেখা যাচ্ছে। বেড়া পার হতে পারলে আর কে পায় শুভকে। পিছিয়ে আসতে শুরু করল ও, এক দৌড়ে বেড়া পার হবে।

হঠাৎ কে যেন পেছনে থেকে খামচে ধরল জ্যাকেট। চিৎকার করে উঠল শুভ। জ্যাকেট ধরে ঝাড়া দিল। তারপর তাড়া খাওয়া খরগোশের মত ছুটল বেড়া লক্ষ্য। করে। এক লাফে বেড়ার ওপাশে।

বাড়ি না পৌঁছা পর্যন্ত দৌড় থামল না শুভর। এক ধাক্কায় দরজা খুলল ও, ছুটল চিলেকোঠার ঘরের দিকে। বার্চের ডালটা যথারীতি চেপে ধরে আছে বগলের নিচে।

বন্ধুরা অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে চিলেকোঠার ঘরে। আমি পেরেছি, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শুভ। এই দ্যাখ তোদের বাজির জিনিস নিয়ে এসেছি। বার্চের ডালটা মাথার ওপর উঁচু করে ধরল ও।

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সবাই। মন্টু, রুবেন বা দীপ কেউ কোন কথা বলছে না। ভয়ে রক্ত সরে গেছে সবার মুখ থেকে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে শুভর মাথার দিকে। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে শুভও তাকাল সেদিকে। এবং জমে গেল ভয়ে।

শুভ দেখল সে বার্চের ডাল মনে করে যে জিনিসিটা নিয়ে এসেছে সেটা ডাল নয়... সে উঁচু করে ধরে আছে কংকালের একটা হাত... শুকনো, খটখটে হাড়ের আঙুলগুলো শুভর মাথার ওপর মৃদু হাওয়ায় দুলছে, যেন ওকে খামচে দেবে।